যুদ্ধ ও ভালবাসা

রাজিয়া মজিদ

যুদ্ধ ও ভালবাসা

রাজিয়া মজিদ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ৮৩৯৫৪০ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

www.pathagar.com

যুদ্ধ ও ভালবাসা
রাজিয়া মজিদ

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৪১৭৫৮, ৮৩৯৫৪০ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৪০২, শাওয়াল ১৪১৬, মার্চ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ

মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রণ

প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

দামঃ

১৫০.০০

Juddha o Valobasa (War and love)
by: Razia Mojid
Published by:
Asad Bin Hafiz
Preeti Prokashon
435/Ka, Bara MoghBazar, Dhaka-1217
Phone: 841758, 839540 Fax: 880-2-839540
Published on: March 1996
Price: Tk 150.00

www.pathagar.com

যুদ্ধ ও ভালবাসা

রাজিয়া মজিদ

www.pathagar.com

আমাদের আরো ক'টি উপন্যাস

তিতুর লেঠেল/ আতা সরকার

আপন লড়াই/ আতা সরকার

সীমান্ত ঈগল/ নসীম হিজাযী

হেজাযের কাফেলা/ নসীম হিজাযী

আঁধার রাতের মুসাফির/নসীম হিজাযী

কায়সার ও কিসরা/ নসীম হিজাযী

শেষ বিকালের কান্না/ নসীম হিজাযী

ভেঙে গেল তলোয়ার/ নসীম হিজাযী

মরু মুষিকের উপত্যকা/ আল মাহমুদ

দি সোর্ড অব টিপু সুলতান/ভগওয়ান এস গিদওয়ানি

www.pathagar.com

এ উপন্যাস যাদের হাতে দিলাম

বড়বোন লতিফা খাতুন
যার স্নেহ চিরদিন পেয়ে এসেছি

সালেহা খাতুন সিদ্দিকী
যে সুসময়ে অসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়

সেলিমা রহমান
যাঁর মনের বলিষ্ঠতা আমাকে সাহস যোগায়

মনিরা কাসেম
যাঁর ধীরস্থির চিন্তা আমাকে স্বস্তি ও শান্তি দেয়

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে
স্বাধীনতার সুবর্ণ প্রকাশনা

www.pathagar.com

পঁচিশে মার্চের রাত। অন্য দশটা রাতের মতই সাধারণ। কিছু একটা ঘটার আগে অনেকেই আধিভৌতিক স্বপ্ন দেখেন। ডান চোখের নিচের পাতা লাফায়। উত্তমের অধম অমঙ্গলের চিহ্ন। অনেকের মনে কোন কারণ ছাড়াই অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে। বৃদ্ধরা বলাবলি করছিলেন, কিছুদিন থেকে রাত্রে তারা কি সব দুঃস্বপ্ন দেখেন। অনুমান করেন, খারাপ কিছু ঘটবে।

দিনের বেলায় রোহানা চৌধুরীর এসব কিছুই মনে হয়নি। পূব পশ্চিমের নেতারা মিলে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা করছে। ঘন ঘন বৈঠক বসছে। ছয়দফা নিয়ে মতানৈক্য চলছে। তাতে দেশের সাধারণ মানুষদের বিচলিত হবার কারণ নেই। ছেলেমেয়েরা ইউনিফরম পরে স্কুল কলেজে যাচ্ছে। হাটবাজার সরগরম। মাছের দাম নিয়ে দর কষাকষি বা সবজির দাম নিয়ে অত চৈ চৈ নেই। রাস্তার চৌমাথায় মাস্তানদের গুল্‌তানি। পথচারীরা সেদিকে একবার তাকিয়েই পদক্ষেপ দ্রুত করে। গুলিস্তানের যানজটের দিকে অফিস মুখো কর্মচারীরা বিব্রত চোখে তাকায়। তারপর অজস্র মানুষ বিশৃংখল রিক্সা, বাস, বেবী ট্যাক্সির ফাঁক দিয়ে দেহ গলিয়ে কোনমতে বের হয়ে যায়। কোর্ট-কাচারি সব এদিকেই, পুরনো ঢাকায়। দেরি করার উপায় নেই। সুবেশী তরুণীদের ভিড় বায়তুল মোকাররমের শপিং সেন্টারে। আমিন জুয়েলারিতে ভিড় লেগেই থাকে। শো কেসে বিভিন্ন ডিজাইনের গহনা ঝক্‌মক্‌ করে। খুশির আলো ছড়ায় তরুণী বধূদের চোখে। বয়স্ক গৃহিনীরা এদিকে ফলের দোকানীদের সঙ্গে দর কষাকষি নিয়ে ব্যস্ত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা চেমনের আঙ্গুরের দিকে তাদের লোভনীয় দৃষ্টি। রসে টস্‌টসে এসব মিষ্টি আঙ্গুর। ভিটামিন সি বেশি বলে অনেকের নজর আবার মাল্‌টার দিকে। আনারের দিকে তাকালে তো চোখই ফেরানো যায় না। লাল টুকটুকে দানা। যেন চূনী পাথরের স্বচ্ছ চোখ। দেখলেই চোখ জুড়ায়, খেতে কত স্বাদ। এসব ফল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা। পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ফল সাগর কলা, পাঁকা পেঁপে, আনারস, বাতাবিলেবু, কদবেল কত কি। স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে কোনটা কম নয়। দেশ তো একটাই, যে অঞ্চল থেকে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

এদিকে জি.পি.ওতে লোকের অসম্ভব ভিড়। লাইফ ইনসিওরেন্স অফিস, বৈদেশিক বিভাগ, আরো কত রকম বিভাগের জগাখিচুড়ি, পোস্টাল বিভাগ, চিঠি পোস্ট, মনি অর্ডার, স্ট্যাম্প বিভাগ। মানুষের ভিড়, ব্যস্ততা, প্রতীক্ষা ইত্যাদির বৈচিত্র্যময় দৃশ্য।

ওদিকে টয়েনবি সার্কুলার রোড ধরে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। বড় বড়

www.pathagar.com

দালান কোঠা, ব্যাংক, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এয়ার ট্রাভেল এজেন্সির নানা সুদৃশ্য অফিস। শেষ মাথায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান– পাকিস্তানের কারেন্সি, আর্থিক লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের জন্মস্থান।

দিনের বেলার এইসব চলমান দৃশ্য দেখে কেউ ভাববে না আজ রাতে ভয়ংকর কিছু ঘটবে। জীবন স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। গরীব, ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সবার জীবন-ধারা একত্রে মিলেমিশে কেমন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, যার থেকে মূল প্রবাহ বিচ্ছিন্ন করার উপায় নেই। স্বকীয়তা প্রত্যেকের আছে, অথচ একটা ফুলের মালার মত একত্রে গ্রথিত হয়ে শোভা ছড়িয়ে দিচ্ছে গণ-জীবনের ঐশ্বর্য প্রবাহের গভীরতায়।

সন্ধ্যা রাতে প্রশান্তি ছিল। আকাশ ঝক্‌ঝকে নীল। বুকে ভাসমান হাল্কা সাদা মেঘ। নীল চাঁদোয়ার মত হ্রদের বুকে চাঁদ ভাসছিল। কখনো মেঘের আড়ালে গিয়ে মুখ লুকোচ্ছিল লুকোচুরি খেলার মত। লক্ষ জরির বুটির মত অজস্র তারার আবির্ভাব আকাশে। ওদের মেলায় চাঁদটাকে মনে হচ্ছিল মুরুব্বি বুড়ির মত। ছেলেবেলা থেকে সবাই শোনে, চাঁদে এক বুড়ি চরকায় সূতো কাটে। আর আল্‌সে ছেলের বৌ-গুলোকে অভিসম্পাত দেয় তাদের কুড়েমী স্বভাবের জন্য।

আকাশের নিচে বসে থাকা ঢাকা নগরীর সৌন্দর্যও কম নয়। সারা নগরীতে নিয়নের আলো জ্বলছে। ওদিকে ডি.আই.টি বিল্ডিংয়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। এদিকে সেকেন্ড ক্যাপিটালের অসমাপ্ত পার্লামেন্ট ভবন। ধারে কাছে সেক্রেটারিয়েট হোস্টেল। লেকের পানির তলদেশ থেকে জেগে উঠেছে বাড়িগুলো। গভীর নীল পানি ওদের দেহ ছুঁয়ে দিচ্ছে আল্‌তো আদরে।

ক্রিসেন্ট লেক। সুন্দর নাম। মনোরম দৃশ্য। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙ্গছে লেকের বুকে বাতাসের মৃদু দোলায়। রঙ্গিন মাছের খেলা রাতের ধূসর ছায়ায় দেখা যাচ্ছে না। পার্লামেন্ট ভবন এবং লেকের দু'পাশে গাছের সারি। নানা জাতের গাছ, সুদৃশ্য ঝোপ। লতা-গুল্মের সারি। বটল ব্রাশ গাছই বেশি। গাছগুলো এখনো বাড়ন্ত হয়নি। কোন কোন গাছের মাথায় আলো পড়েছে। চিক্‌চিক করছে পাতা। মনে হচ্ছে জোৎস্নায় গা ধুয়ে জরির ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে অপেক্ষা করছে কোন পথিক প্রিয়তমের জন্য। যে গাছগুলোয় আলো পড়ে নি, সেগুলোও গায়ে লেপ্‌টানো কালি নিয়ে ধূসর ছবি হয়ে লেকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এদের রহস্যময়তা আলোস্নাত গাছগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

রাত এগিয়ে চলেছে, ঘড়ির কাঁটায় ঘূর্ণায়মান বেগ। তেমন একটা শীত নেই। কিন্তু বাতাসে ঠান্ডার আমেজ। এত রাতেও বেশ কিছু রিক্সা রাস্তায় চলছে টুং টাং আওয়াজ তুলে। সবগুলোতেই আরোহী আছে এমন নয়। খালি রিক্সা নিয়ে রিক্সাওয়ালারা চলেছে ঘরমুখো। রিক্সাভাড়া চার আনা, আট আনা, যা জমেছে তা দিয়ে আহারের যোগাড় সম্ভব। বৌ-ছেলে-মেয়েরা পথ চেয়ে আছে গৃহকর্তার ঘরে ফেরার

www.pathagar.com

তৃষ্ণার্ত আকুলতা নিয়ে। রিক্সার সীটের নিচে চাল, ডাল এবং সব্জির পুটলি। দু' আনার মাছ কিনলেই যথেষ্ট। তাও কেনার সময় হয় না। এই পুটলিগুলো এখন বৌয়ের হাতে তুলে দিলেই যথেষ্ট। ঝুপড়ি ঘরে প্রাণ চাঞ্চল্য জেগে উঠবে। বাচ্চাগুলো আধো ঘুমে আধো জাগরণে মোটা এবং লাল আউষ চালের ভাতের মিষ্টি গন্ধে আমোদিত হয়ে ঢুলতে থাকবে। মুখে থাকবে বুড়ো দাদা দাদীর মুখে শোনা কবেকার সেই ছড়া .....

আমন ধানের চিড়া, আউষ ধানের ভাত,
নতুন বৌয়ের মুখে আনে নোনা পানির স্বাদ।

এদিকে মীরপুরে, রামপুরায় স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার জন্য বিরাট এরিয়া জুড়ে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। পার্লামেন্ট হাউজ, বেতার ভবন, আর্কাইভ এন্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল বয়েজ এন্ড গার্লস হাই স্কুল, সোহরাওয়ার্দি হৃদরোগ হাসপাতাল, আরো কত কি। এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলো দামী সিরামিক ইটের গাঁথুনি বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে আলাদীনের প্রদীপের ঘর্ষণে ঐশ্বর্য মন্ডিত হয়ে। সব কিছু সুন্দর, স্বচ্ছ, নির্মল। লাল ইটের হাসি ছড়িয়ে ভুবন ভুলানো মনোহারিত্ব নিয়ে প্রাণময় হয়ে উঠ্ছে দিনে দিনে। কি অনুপম সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে নগরবাসীদের মনে। ওদিকে আবার নব্য ধনীদের আরাম আয়েশের জন্য ডি. আই. টির তত্ত্বাবধানে গুলশান বনানীতে আবাসিক এলাকায় গৃহ নির্মাণের জন্য প্লট বরাদ্দ চলছে। মেল ট্রেনগুলো যেমন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুস্ হুস্ শব্দে দ্রুত এগিয়ে চলে তেমনি এই অভিজাত এলাকাগুলোতে বাড়িঘর, দোকানপাট রাতারাতি গজিয়ে উঠছে। দ্রুত নির্মাণ কাজের দক্ষ কুশলতায় ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা চলছে কার বাসগৃহ কত দামী হয়ে উঠবে স্থাপত্যের সূক্ষ্ম কারুকার্যে। ঈর্ষণীয় হয়ে উঠবে অন্যের চোখে। নব্য এবং উঠতি ধনীদের এখানে প্রাধান্য বেশি। এদের মধ্যে আছে অসাধু ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি, সিনেমা তারকা এবং রাজনীতিকগণ। সারা রাজধানী নগরীতে এই উন্নয়ন কর্মকান্ডে জীবনের এক নবজাগরণ। পাগলা থেকে ইট, মীরপুর ব্রীজের কাছ থেকে মোটা দানার চক্চকে বালি, এয়ারপোর্ট রোড থেকে মোজাইক দানা, গ্রীনরোড থেকে গ্লেজড্ টাইল বহনকারী ট্রাক এবং ঠেলাগাড়ির জ্যাম সহ্য করতে হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অফিসমুখো কর্মচারীরা সাবধানে রাস্তা পারাপার হচ্ছে। এই অসুবিধের মধ্যেও তাদের মনে আনন্দ এবং কৌতূহল, বাঃ কি চমৎকার ঐ বিল্ডিংয়ের নক্সাটা। বাব্বা! দশতলা বিল্ডিং, লিফ্‌ট থাকবে তো ইত্যাদি।

এই সব জাঁক্জমক এবং শোরগোলের মধ্যে ঈগলের অশুভ ডানার মত কালো ছায়া আজ রাতেই রাজধানীর উপর বিস্তার লাভ করবে এমন কথা রোহানা চৌধুরী ভাবেনি। সন্ধ্যা রাতে সবার মনে অস্বস্তিকর এক শিরশিরে অনুভূতি, পূব-পশ্চিমের নেতাদের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। এখন অচলাবস্থা। সুন্দরী নগরী ঢাকা মুখ ম্লান করে বসে আছে ভীতিপ্রদ একটা সময়ের জন্য, যে সময়টা সবার অজানা, অচেনা,

www.pathagar.com

অপরিজ্ঞাত।

রাত গভীর। রোহানা চৌধুরী লিখে চলেছে। তার লেখার বিষয়বস্তু সব সময় আলাদা। এতে নর-নারীর প্রেম ভালবাসা যেমন আবেগ আপ্লুত হয়ে সৌন্দর্যদীপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতির চাপে পড়ে সংগ্রাম-মুখর হয়ে বেদনায় বিদ্ধ হয়। সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় তখনো দেখা দেয়নি। কিন্তু সামাজিক সমস্যাগুলো অন্তহীন প্রবাহের মত সেদিনও ছিল, আজো আছে।

একদল মানুষ আবহমানকাল থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে, শোষিত হচ্ছে সুবিধেবাদীদের হাতে। কখনো তারা মূক হয়ে ভাগ্যকে মেনে নেয়। কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, তাদের মানস সত্ত্বা বলিষ্ঠ চেতনায় বর্শা ফলকের মত তীব্রতা এবং তীক্ষ্নতায় চিৎকার করে উঠে জানিয়ে দেয়, আমি আছি, আমি থাকব। আমার অবিনাশী অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ থাকলে জেনে রাখ, মৃত্যু অথবা শান্তি দু'টোর একটা বেছে নিতে হবে। এ দেশের মাটির গভীরে আমার জীবনের শেকড় গ্রথিত। এ দেশের আলো বাতাসে আমার দেহ বর্ধিত। আর আমার মন? মানবতার রসে সিক্ত, ঐশ্বরিক আলোয় প্রজ্জ্বলিত, জীবন রশ্মির তেজস্ক্রিয়ার অন্তহীন এক স্ফুলিঙ্গ। আমি যখন ভালবাসি, প্রজাপতির পাখার মত রঙ্গিন এবং কোমল হয়ে যাই। যখন শত্রুকে আঘাত করি তখন বিদ্যুতের কষাঘাতের মত মর্মভেদী হই। আমি নিজে কাঁদি, অপরকে কাঁদাই। জীবনের নিভৃত ক্রন্দনে আমি রক্ত ঝরাই আমার প্রিয়তমের হৃদয়ের তন্ত্রীতে। অতএব রাগ ও বিরাগ, প্রেম ও ঘৃণা, সংগ্রাম ও শান্তি, এসবের সমন্বয়ে আমি এমন এক মানুষ, যার সৃষ্টি বিধাতার নির্মাণ কৌশলের এক অনন্য স্বাক্ষর, এক অনুপম সমন্বিত প্রতিভার প্রভায় উদ্ভাসিত।

রোহানা চৌধুরী তার উপন্যাসে এমন দুটি চরিত্র সৃষ্টি করছিল, প্রেমের ডিঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে যারা জীবনের স্বপ্ন দেখে। এ জীবন শুধু সংসারের চাল ডালের হিসাবের খাতায় সীমাবদ্ধ নয়, এ জীবন রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত চেতনায় সজ্জিত এক পরিচ্ছেদ। এ দেশটার দু'টো অঙ্গ। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। একটা হৃদপিন্ডের দুটো ভাল্‌ব। একটা মানব দেহের দু'টো চোখ। একজন মানুষের প্রসারিত দু'টো বলিষ্ঠ হাত। ধর্মীয় চেতনা এবং সংস্কৃতির মিশেল উপাদানে উজ্জীবিত একজন মানব যেন বহন করে চলেছে ইতিহাসের এক ঐতিহ্যময় উৎস। এখানে শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ, ভাত, মাছ, রুটি চানা ইত্যাদি দিয়ে যেন মেলার স্টল সাজানো হয়েছে, ক্রেতার মনোরঞ্জন এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। বেছে নাও যে কোন আইটেম। অথবা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ কর একত্রে।

রোহানা চৌধুরীর গল্পের নায়ক-নায়িকা যখন ভালবাসার আবেগে আপ্লুত হয়ে দেশের দুই খন্ডের সমস্যা ভুলে যাচ্ছিল, বাইরে তখন শেষ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। প্রথমে মৃদু, তারপর তীব্র থেকে তীব্রতর। রাতের স্তব্ধ

www.pathagar.com

এবং শান্ত প্রহরগুলো একের পর এক চিরে ফালাফালা হতে লাগল। মনে হলো, বাতাস কেটে অগ্রসর হচ্ছে একদল হিংস্র রাক্ষস, হাউ মাও খাও শব্দ মুখে তুলে, জিহবায় লালা গড়িয়ে তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত থাবাগুলো সামনে প্রসারিত করে আসছে তো আসছেই। মনে হচ্ছে, অনেকগুলো অশরীরি আত্মা কালো লোমশ দেহ নিয়ে রাতের বুকে অন্ধকার ছড়াতে ছড়াতে হুস্ হুস্ করে নেমে আস্‌ছে জমিনে। কখনো মনে হচ্ছে, তেজী ঘাড় বাঁকানো জেদী অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের দ্রুম দ্রুম শব্দ রাজধানী ঢাকার বুককে সচকিত করে তুলছে দর্পিত অহংকারে। প্রথমে বিরতিহীন তারপর থেমে থেমে শব্দ, অবশেষে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের ভয়ংকর আর্তি। শব্দগুলো একবার ডুবতে লাগল, আবার ভাসতে লাগল।

ঘরের মধ্যে বসে প্রথমে রোহানা চৌধুরী কিছু বুঝতে পারল না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। প্রসারিত রাতের গভীর স্তব্ধতায় শব্দগুলো ঢেউয়ের মত উচ্চকিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে জ্ঞানশূন্য হয়ে। শব্দগুলো ধরে রাখা যাচ্ছে না কোন বিশেষ মাত্রায়। এগুলো যতিহীন, মাত্রাহীন হয়ে চিহ্নিত পদ-রেখা ছেড়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। রোহানা চৌধুরী কলম রেখে দিল। এমন সময় সাবিহা চৌধুরীর প্রবেশ। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা, রোহানা জানালা বন্ধ করে দাও। টেবিল থেকে সরে এসো।

–কেন মা?

–গুলীর শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?

–পাচ্ছি।

–পূব-পশ্চিমের আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। কিছু একটা অঘটন ঘটছে।

দুর্বোধ্য দৃষ্টি রোহানার চোখে, আলোচনা ভেঙ্গে গেলে আলোচনা সভা আবার বসতে পারে। গুলী কেন?

–তাতো জানি না মা।

রোহানা অন্যমনস্ক, চিন্তিত। ওমরকে সে ভালবাসে। সে পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে। রোহানা পূর্ব পাকিস্তানের মেয়ে, বাঙ্গালী। একটু আগেও সে স্বপ্ন দেখছিল জীবনের, যে জীবন পূর্ব পশ্চিম মিলিয়ে সমন্বিত সত্তার শুভ মিলনের বিস্ময়কর লগ্ন। চিন্তায়, স্বপ্নে, কল্পনায় বাস্তবে যা ইউনিটি ইন ডায়ভার্সিটি।

রোহানা একদিন বলেছিল, দু'অঞ্চলের ডিসপ্যারিটি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দূর করা ভাল।

ওমরের উত্তর, অবশ্যই, ইতিহাসের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। ভয়ংকর পরিণাম হবে। রোহানা, কিছু ভাঙলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে। কিছু গড়তে চেষ্টা করলে নিজেদের সৃজনশীল শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা হয়। হিংসা হচ্ছে আগুন, সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। মৈত্রী এবং ভালবাসা হচ্ছে সেতু যা বন্ধনকে দৃঢ় করে।

www.pathagar.com

রোহানা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

রোহানা চৌধুরী যখন ভাংগা ভাংগা উর্দুতে ওমরকে তার হৃদয়ের ভালবাসা এবং আবেগের কথা শোনায়, হ্যায় এর জায়গায় হে, হোর জায়গায় হোতি হ্যায় বলে, ওমরের ঠোঁটে তখন মৃদু হাসির রেশ। ওমর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, তোমার মুখে উর্দু ভাষা বেশ মিষ্টি শোনায়।

রোহানা চোখে উজ্জল আলো ছড়িয়ে বলে, তোমার মুখে আধো আধো বাংলা কচি শিশুর মুখের জবানের মত পবিত্র এবং সরল।

ওমর হাসে। বলে, আসলে আমাদের ভালবাসাই সবকিছুকে সহজ, সরল, সুন্দর করে তোলে।

–প্রেম আমাদের সহনশীলতাকে মর্যাদা দিয়েছে ওমর, রোহানার উত্তর।

দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় যুগ যুগ ধরে তারা একে অন্যকে ভালবাসে, সেই আদম এবং বিবি হাওয়ার মত। আবহমান কাল থেকেই এই ভালবাসা বাতাসে সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে মরুভূমির শুভ্র বালুকণার উপর দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে অগ্রসর হচ্ছে; পাহাড়ের ধূসর চূড়া ডিঙ্গিয়ে অপ্রতিহত গতিতে ধাবমান হচ্ছে নিম্নমুখী হয়ে, সমুদ্র পেরুচ্ছে ঢেউয়ের বুকে শুভ্র ফেনার সৃষ্টি করে, কোন বাধা বিপত্তি মানছেনা।

এই ভালবাসা আদি এবং অকৃত্রিম রূপ ধরে জমিনে সিঞ্চন করছে বারিধারা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করছে, ফসলের সবুজ সমারোহে ভরে তুলছে মাঠ ঘাট প্রান্তর। স্নিগ্ধ করে তুলছে মানুষের মন এবং মেজাজ।

ওমর বাট এবং রোহানা চৌধুরীর সেই ভালবাসা কি আজ বিঘ্নিত হবে পূর্ব পশ্চিমের আলোচনার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ার গোলাগুলীর মাঝে?

রোহানা ছুটে দরজার দিকে গেল। মা পিছন থেকে তাকে জাপ্‌টে ধরলেন, কোথায় যাচ্ছিস রোহানা?

–মা, ওমরের বিপদ। ও সলিমুল্লাহ্‌ হলে, গুলীর শব্দ ওদিক থেকেই আস্‌ছে।

–তুই কি করবি?

–ওখান থেকে ওকে নিয়ে আসব।

–তোর জীবন কি নিরাপদ থাকবে?

–মা, ওমরের বিপদ অর্থ আমার বিপদ। আর নিরাপত্তার প্রশ্ন তুললে সেটাও কোন পৃথক ব্যাপার নয়।

–আমার মন বলছে, সাবিহা চৌধুরী বললেন, ওর কোন বিপদ হবে না। ওকে পাকিস্তানী সৈন্যরা কিছুই বলবে না।

–তুমি এত নিশ্চিত কেন?

–ওতো পশ্চিম পাকিস্তানী। ওর চেহারা, কথাবার্তা, আচরণ সবই তো ঐ দেশের।

রোহানা বিস্ময় নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল, কিন্তু

www.pathagar.com

ওর ভালবাসা তো ঐ দেশের নয়। মা, ভালবাসা কোন দেশাচার নয়। কেন তুমি ভালবাসায় বিভেদের কথা তুলছ? কেন আমার উপলব্ধির মধ্যে বিভিন্নতা আনতে চেষ্টা করছ?

সাবিহা চৌধুরী মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। রোহানা চৌধুরী বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ কিরর কিরর কিরর, একটানা ও বিরতিহীন। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে। সিরসির করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তা জনশূন্য। হঠাৎ দু'একটা প্রাইভেট কার স্পীডোমিটারে ঘন্টায় আশী মাইল স্পীড তুলে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছে। রিক্সা নেই। শুধু বড় বড় মিলিটারি ভ্যান, জীপ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে বাতাসের বেগে অগ্রসর হচ্ছে নীল ক্ষেতের দিকে। ওদিক থেকেই ভেসে আসছে গুলীর শব্দ।

রিক্সা অথবা বেবী ট্যাক্সির জন্য রোহানা চৌধুরীর প্রত্যাশা। অথচ এখন তা আলাদিনের প্রদীপ পাওয়ার মত বিস্ময়কর।

হঠাৎ চোখ পড়ল রোহানার, একটা বেবী ট্যাক্সি তীব্র বেগে নীলক্ষেতের দিক থেকে ছুটে এসে চলে যাচ্ছে মীরপুরের দিকে। হাত ওঠালে থামবে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওটার গতি রোধ করল রোহানা।

বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার নেমে এল, করছেন কি? পথ ছাড়ুন।

–না।

–পাগলামি ছাড়ুন। আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন?

–আরে না। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে যেতে হবে।

–আমি তো ওদিক থেকেই প্রাণভয়ে পালিয়ে এলাম।

–আবার যেতে হবে।

–ওদিকে গোলাগুলী হচ্ছে।

–সে জন্যই যেতে চাচ্ছি, আমার এক আত্মীয়কে উদ্ধার করতে হবে।

ড্রাইভারের কণ্ঠে ব্যঙ্গ, আপনার আত্মীয় ছাত্র হলে এতক্ষণে উদ্ধার হয়েই গেছে।

–ঠাট্টা রাখুন। কত চান, একশো, দুশো, তিনশো?

–সত্যি সত্যি দেবেন নাকি এত টাকা? তাহলে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

বেবী ট্যাক্সিতে উঠে বসল রোহানা।

সংশয় যায় না ড্রাইভারের, মিলিটারিরা ধরে ফেললে?

–নিজেকে এবং আপনাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমার।

–বেশ।

বেবী ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

ইউনিভার্সিটির মেয়েদের হল চামেলী হাউজের কাছে আসতেই এক স্কোয়াড্রন

www.pathagar.com

মিলিটারির ঝাঁক ঘিরে ধরল বেবী ট্যাক্সি। ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, এই আওরত কিধার যা না?

রোহানা চৌধুরী হতচকিত, এই ধরনের ভাষা ওদের মুখে এই প্রথম শুনল। অনেক বছর সে পশ্চিম পাকিস্তানে কাটিয়েছে। সাধারণ লোক থেকে আর্মির লোক পর্যন্ত তাকে সম্বোধন করেছে মাইজি অথবা বহিন বলে।

নেমে এল রোহানা চৌধুরী, কণ্ঠে উত্তেজনা, আদবসে বাতচিত করনা।

–তুমলোগ হুঁশিয়ারী সে কিউ নেহি কাম করনী?

একজন অফিসার পদমর্যাদার লোক এগিয়ে এল, মনে হলো ক্যাপটেন, হোয়াট ইজ রং হেয়ার?

রোহানা শান্ত কণ্ঠে খুলে বলল এদিকে আসার উদ্দেশ্য।

–ডোন্ট ওরি লেডি, সলিমুল্লাহ হল ইজ সেফ। আপ ঘরমে ওয়াপাস যাইয়ে।

ইতস্ততঃ করতে লাগল রোহানা, ওমরের খোঁজ না নিয়ে ফেরার ইচ্ছে নেই তার।

–লেডি, উই আর নাউ ইন অপারেশন। প্লীজ ডোন্ট ক্রিয়েট ট্যাবল্স। মোরোভার, আপ্ ক্রস ফায়ারিং মে গির যায়েঙ্গে।

–বিলিভ মী ক্যাপটেন, আই এ্যাম টু মাচ ওরিড্ এবাউট হিজ সেফ্টি।

–উস্কা নাম কিয়া হ্যায়?

–ওমর্ বাট।

–ওয়েস্ট পাকিস্তানী?

–ইয়েস, রোহানার উত্তর।

–ইনটারেষ্টিং। ইজ হী এ স্টুডেন্ট?

–লাইক দ্যাট। হী ইজ এ জার্নালিস্ট।

–ও কে, আই এ্যাম টেকিং নোট এবাউট হীম। আই এ্যাশিওর ইউ, নো হার্ম উইল বী ডান টু হীম। প্লীজ গো ব্যাক হোম। বলেই ড্রাইভারকে তাড়া দিল ক্যাপটেন, এ্যাই উল্লুক, জলদি করনা, লেডিকো ঘরমে পৌছ দে না।

যন্ত্র চালিতের মত রোহানা বেবী ট্যাক্সিতে উঠে বসল। সামনে এগোবার পথ নেই। ডজন ডজন মিলিটারি জীপ, ভ্যান, পিক আপ, দুটো ট্যাংকও চোখে পড়ল। সামনে কামান ফিট করা। ওগুলো থেকে অগ্নিবর্ষণ হয়েছে একটু আগেই। রাইফেলের গুলীর আওয়াজ হচ্ছে থেমে থেমে। ড্রাইভারের কাছে শুনল, পাল্টা গুলীও হয়েছে জগন্নাথ হলের ভেতর থেকে। তবে প্রতিরোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

রোহানা যখন বাসায় ফিরে এল তখন ভোর হয় হয়। সুবেহ্ সাদেকের ধুসর আলো পূর্বাকাশে দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে ফজরের নামাজের আযান পড়ে। আযানের সুললিত সুর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই সুরে যেমন আধ্যাত্মিক আবেদনের নিবিড় আবেগ, তেমনি কর্ম জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুমহান আমন্ত্রণ। আযানের সুর ভোরের

www.pathagar.com

বাতাসে কেঁপে কেঁপে এমন এক ছন্দ তোলে যা শুধু ঐশ্বরিক আলোয় নিমগ্ন এক চেতনা নয়, জাগতিক আনন্দের নির্মল উৎস সন্ধানের এক সুষমাময় ইঙ্গিত। দেহকে যেমন দেয় পবিত্র শিহরণ, মনকে দেয় সুবিমল মগ্নতা।

অথচ আজ ভোরে মসজিদ থেকে আযানের সুর ভেসে আসছে না। জানালা দিয়ে তাকালেই মসজিদের চূড়া চোখে পড়ে। মিনার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের নিশ্চল মাস্তুলের মত। একটু পরে ওখানে হয়তো কাক এসে বসবে। মোয়াজ্জিন মসজিদ সংলগ্ন কোঠায় নেই। গুলীর শব্দে হয়তো কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। এমনটি প্রায় চব্বিশ বছরের স্বাধীন দেশের জীবন প্রবাহে কখনো ঘটেনি। আবর্জনা তুলে নেয়ার গাড়িগুলোও রাস্তায় বের হয়নি। প্রাচীন ঢাকা সবেমাত্র রাজধানীর মর্যাদা পেয়ে রূপ এবং রং বদলাচ্ছে। জৌলুসের ছোপ্ লাগি লাগি করছে দেহে। যেন রূপসী নারী নিজের দেহকে ঘষে মেজে চকচকে করে তুলছে। প্রসাধনের প্রলেপ এখনো মুখে পড়েনি। সজ্জার উপকরণ নিয়ে বসে আছে উৎসুক মুখে। এরই মধ্যে তার সামনে ভীতির সঞ্চারণ। মা সাবিহা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি রোহানা।। ওর মাথায় আল্‌তো করে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, ওমরের দেখা পেয়েছিস?

চমকে উঠল রোহানা। স্থির কণ্ঠে জবাব দিল, না।

–এত কি ভাবছিস?

কেঁপে উঠল রোহানার গলা, একি হলো মা? এক দেশ, এক আত্মা। তাহলে এই আক্রমণ কেন? আমি ও ওমর তাহলে কি এতকাল ভুল হিসাব করেছি?

–এত অস্থির হোস নে রোহানা, ভাইয়ে ভাইয়েও তো ভুল বোঝাবুঝি হয়।

–ভুল বোঝাবুঝি আর হানাহানি এক কথা নয় মা।

–মারাত্মক কিছু নাও ঘটতে পারে।

–কামানের গোলা কি তাহলে খড়ের গাদার উপর পড়েছে। মা ভুলে যেয়ো না, আমি ইতিহাসের ছাত্রী। একদল কিছু উস্কে দিলে অন্যদল প্রতিরোধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই সুযোগে আবির্ভাব হবে তৃতীয় দলের। সেই দল বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, উঁমিচাদ, জগৎশেঠ, রায় বল্লভের দল। এরা ইংরেজ বেনিয়াদের ডেকে এনেছিল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। আমাদের দেশের নব্য মীরজাফর এবং উমিচাঁদরাও এমনি এক চতুর্থ দলকে ডেকে নিয়ে আসবে নিজেদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু শেষোক্ত দল কত শক্তিশালী তা কেউই জানে না। এরাই বানরের পিঠে ভাগ করবে এবং সর্বেসর্বা হয়ে বসবে এ দেশের মাথায়। অন্য দেশের গদা ঘোরানো কেমন লাগবে মা?

–এসব তুই কি বলছিস রোহানা? তৃতীয় দল এদেশে আছে এবং অন্য দেশের লোককে ডেকে আনবে তাই বা ভাবছিস কেন?

– মা, আমাদের দেশের ইতিহাসটাই এমন। নবাব সিরাজোদ্দৌলার রাজকোষের

www.pathagar.com

মোটা টাকার বেতন নিত যারা, দেশের প্রশাসনিক অঙ্গনে নবাব যাদের বিশ্বাস করে উচ্চ পদগুলোতে বসিয়েছিলেন, তারাই তো নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। যাঁর নেমক খেল তাঁর সঙ্গেই নেমকহারামি করল। এই নেমকহারামি, এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের চেতনার সঙ্গে, তাদের ধর্ম, ঐক্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে ছলনার মুখোশ পরে দিনরাত খেলা করছে। এর নিগূঢ় তথ্য হলো, এই সুজলা সুফলা ঐশ্বর্যময়ী বাংলাদেশের অফুরন্ত সম্পদ, এর সুষমাময় সৌন্দর্যের হৃদয় হরণকারী বাসোপযোগী সমতল ভূমি, এর নদী নালা, হাওড় বিলের অন্তঃসলিল প্রবাহের মন মাতানো গানের ঝংকার, এর খনিজ সম্পদের বিপুল সম্ভার, এই সবকিছু বিদেশীদের লোভাতুর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। তাই এই শস্য শ্যামলা দেশটিকে পদানত করার জন্য এরা বেছে নেয় এ দেশের নিকৃষ্ট সন্তানদের। তারপর কীটের মত প্রবেশ করে দেহের অভ্যন্তরে। কুরে কুরে খায় এ দেশের অস্থি, মাংস, মজ্জা। সুযোগ বুঝে এক সময় হানে চরম আঘাত। যুগে যুগে এ দেশের উপর এমনি করেই নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। এসেছে বর্গীদের হামলা, এসেছে ইংরেজদের আগ্রাসী থাবা, এসেছে হিন্দু বেনিয়া এবং নব্য জমিদারদের নীরিহ মানুষের উপর শোষণ এবং অত্যাচারের যাতাকল। মা আমি আকাশে-বাতাসে এমন এক সুদূর প্রসারী পরিণামের আভাস পাচ্ছি।

–তুই বেশি দুশ্চিন্তা করছিস মা।

–না মা। ইতিহাস বলে, লড়াই করে ইংরেজ ও সিরাজোদ্দৌলা আর ফায়দা লুটে মীরজাফর। পক্ষ ও বিপক্ষের মাঝখানের এই শক্তিই যুদ্ধে আসল ফায়দা লুটে।

–এখানে এতটা না-ও ঘটতে পারে।

অন্যমনস্ক হলো রোহানা। সে যেন কথা বলছে না, তার ভেতরটা কথা বলছে। আমি মনে করি না, দেশের রাজতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অনড় একটা জিনিস। এর পরিবর্তন এবং সংস্কার দরকার। দরকার নতুন ধ্যান ধারণা এবং চেতনার সংযোজন। কিন্তু তা আসতে হবে নিজ দেশের ভূমিজ সংস্কৃতি এবং আদর্শ থেকে। অন্য দেশের ইঙ্গিত অথবা পরামর্শ এখানে অবাঞ্ছিত। আমার দেশের ভাগ্য আমি গড়ব, আমার দেশকে নবতর চেতনায় আমি উজ্জ্বল করে তুলব, আমার দেশের ঐতিহ্যকে আমি সুসজ্জিত করব নতুন ভাবাদর্শে। আর আমার ধর্মকে আমি লালন করব আমার বুকে লুকানো অমূল্য রত্নের মত। এতে অন্যের হাতের নোংরা স্পর্শ লাগবে কেন?

সাবিহা চৌধুরী তাঁর মমতাময় হাতের স্পর্শ লাগালেন মেয়ের মাথায়, সারারাত তো জেগেই কাটালি। এখন একটু ঘুমিয়ে নে।

–ঘুম আমার আসবে না মা।

–না ঘুমুলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

–ঘুমুলেই কি দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় মা?

–জেগে শরীর খারাপ করে কি লাভ?

www.pathagar.com

–কোন লাভ নেই। শুধু মনকে বোঝাতে পারব, কাকের মত চোখ বুঁজে আমি অন্তত সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইনি। তাছাড়া ওমরের কথা ভাব, যতক্ষণ না ওর খবর পাব, স্বস্তি এবং শান্তি কোনটাই ফিরে আসবে না।

–রোহানা, আমি ফিরে এসেছি। তুমি ঘুমুতে যাও।

ছুটে এল রোহানা, ওমরকে জড়িয়ে ধরল। পরমুহূর্তে মার দিকে চোখ পড়ায় ছেড়ে দিল। শুধু দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল, মুহূর্তের পর মুহূর্ত। যেন অনাদিকাল, অনন্তকালের এই চেয়ে থাকা। চোখের তারায় শুধু ভাসতে থাকে অন্তহীন ভালবাসার জিজ্ঞাসা, ওমর তুমি ভাল আছ? তুমি আমার কাছেই আছ তো? তোমার কোন ক্ষতি হয়নি তো ওমর?

রোহানার চোখের ভাষা বোঝে ওমর। রোহানার মাথায় হাত রেখে আলতো ভাবে চুলে আঙ্গুল বুলাতে থাকে। এটাই ওকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা।

–কত লোক মারা গেল ওমর?

এই প্রশ্নটাই এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল ওমর। রোহানার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতায় অনেক ঘটনা ধরা পড়ে, যা অন্যের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। পূর্ব পাকিস্তানের এই মেয়েটির মেধা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিনের পর দিন তাকে টেনে এনেছে ভালবাসার বৃত্তে। মনে হয়েছে, এই মেয়ে শুধু তাকে বশ করতে পারবে তা নয়, সমস্ত বিশ্বকে জয় করতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ শ্যামলিমা জুড়ে আছে ওর দেহে, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোমল স্নিগ্ধতা ঢেলে দিয়েছে ওর চোখে মুখে। ওর লাবণ্য প্রবাহের ঢল নেমেছে ওর চোখের কালো তারায়। পদ্মা মেঘনা এবং যমুনার পানির ঢলের মত প্রেম ও ভালবাসা ওর সত্তাকে বিস্মিত ঔদার্যে মোহনীয় করে তুলেছে। বাঙ্গালী এই মেয়েটির প্রাণ ঐশ্বর্যে যেমন আছে স্বকীয় সত্তা, তেমনি আছে দেশের প্রতি অভূতপূর্ব মমতার স্বাদেশীকতা। বিশ্ব মানবতায় এই মেয়ে যেমন মিশে যেতে পারে, তেমনি উজ্জীবিত হতে পারে নিজের দেশের প্রতি অনাবিল ভালবাসায়। পূর্ব পাকিস্তানের মেয়ে রোহানা চৌধুরী সম্পর্কে মোটামুটি এই ধারণা পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে ওমর বাটের।

–কত লোক মারা গেল? রোহানা তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করল।

–অনেক।

–লাশ কি নিয়ে গেছে সৈন্যরা।

–না, রাস্তায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।

–ওরা কি এভাবে পাবলিকের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে চায়?

–হবে হয়তো।

–বোকা।

–কথাটা ঠিক। ভীতির সঞ্চার করে মানুষের মন থেকে বেদনা মুছে ফেলা যায়না।

–ওতে জেদ বাড়ে।

www.pathagar.com

ওমর কথা বলল না। চুপ করে রইল।

–তোমাকে কেউ কিছু বলেনি?

–জামাই আদর করেছে।

হাসি হাসি মুখ রোহানার, যেমন।

–সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে যখন জগন্নাথ হলে এসে পৌঁছলাম, কিছু ছেলে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল, ধর শালাকে, মার শালাকে। প্রথমে কিল ঘুষি, লাথি, শালা পশ্চিম পাকিস্তানী, গুলী কর ইত্যাদি চিৎকার।

–ওদের দোষ কি? তোমার চুল লাল, চোখ নীল।

হেসে ফেলল ওমর, আমি পশ্চিম পাকিস্তানী, কথাটা মিথ্যা নয়।

–বাঁচলে কি করে?

–একজন ছুটে এল, এই করছিস কি? ওতো সাংবাদিক।

–তাতে কি, শালা পাকিস্তানী, অন্য একজনের উক্তি।

–তারপর?

–বুঝলাম, পূর্ব পাকিস্তানী আর পশ্চিম পাকিস্তানী আর নেই, আছে বাঙ্গালী আর পাকিস্তানী।

–বাঁচলে কি করে?

–ছেলেটি আমাকে আগ্‌লেই রইল, বলল, আপনাকে রোহানা চৌধুরীর সঙ্গে দেখেছি অনেকবার।

–আমার সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

–এ্যাই, একে মারিস না। এ আমাদের বাংলাদেশের জামাই হবে। কথাগুলোর তিক্ততা এবং ব্যঙ্গ আমার কান এড়ায় নি।

–তা হোক, বেঁচে তো গেছ।

–বাংলাদেশের ভাবী জামাই বলে।

–মন খারাপ করো না ওমর। ওই মুহূর্তে বাঁচাটাই বড় কথা ছিল।

–তাই নাকি? হবে হয়তো। আমার কথা শেষ হয়নি রোহানা।

–বল।

–বাইরে বেরিয়ে আসতেই পাকিস্তানী সৈন্যদের কর্ডনে পড়ে গেলাম। ওদের ভাষায় দুষ্কৃতকারী মনে করে রাইফেলের নল বুকে লাগাল এক সৈন্য, তুম কৌন হ্যায়?

–ওমর বাট। জার্নালিস্ট।

–ওয়েস্ট পাকিস্তানী?

অনিচ্ছাসত্ত্বে আমার উত্তর, ইয়েস।

–ইধার কিউ আয়া?

–খবর কালেক্ট করনে কো লিয়ে।

www.pathagar.com

–এ্যাইসা মাত্ করো।

–কিউ নেহি?

–শালা, আপনা আদমী কো সাথ দুশমনি মাত্ করনা।

একটু চেপে হাসল ওমর। রোহানাও হাসল। রোহানা আরো কাছে এগিয়ে এল। ওমরের হাত এখন তার হাতে, চোখে অবিচল দৃষ্টি, ডাকল, ওমর।

–বল।

–এখন থেকে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবেনা। পরিস্থিতি বড় ঘোলাটে।

–কথাটা ভেবে বললে?

–হ্যাঁ।

–আমি আশা করিনি। আমি সাংবাদিক। খবর পরিবেশন করা আমার কাজ। তাই যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা উচিত।

–জীবনের বিনিময়ে?

–দুটো বিশ্বযুদ্ধে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে কত সাংবাদিক মারা গেছে। তাতে কাজ কি বন্ধ ছিল?

রোহানা চুপ, কিন্তু চোখ দুটো পানিতে ভরা।

ওমর সেদিকে তাকাল, প্রচন্ডভাবে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করল ওকে। কিন্তু তা করলে রোহানা আবেগজনিত ভালবাসায় ভেঙ্গে পড়বে। এই মেয়েটি তার কাছে হেরে যাক, সে চায় না। রোহানাকে সে বিস্ময়কর ভাবে শুধু ভালবাসে না, শ্রদ্ধাও করে। মনে হয়, পূর্ব পাকিস্তানের যা কিছু ভাল, সুন্দর, নির্মল এবং পবিত্র তার মানচিত্র রোহানা চৌধুরী।

ওমর বাট এবং রোহানা চৌধুরী দু'জনেই স্তব্ধ। মনে ঝড়। বুঝতে পারছে এটা কোন খন্ড যুদ্ধ না, অঘোষিত পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ।

রোহানা চৌধুরীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ওমরের দিকে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

–কর।

এই যুদ্ধের মধ্যে তৃতীয় কোন পক্ষ আছে?

–এখন নেই, কিন্তু থাকবে না এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। নিজেদের আত্মবিশ্বাস যখন কমে যায়, মানুষ তখন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, সাহায্যের জন্য হাত পাতে, তখন সে পক্ষ সুযোগ নেবেই। ঝাঁপিয়ে পড়বে সহযোগিতার নামে। তারপর লুটপাট, কায়েমী স্বার্থ উদ্ধার। এসব দেশে দেশে হয়ে আসছে, এখানেও হবে।

চিন্তিত দেখাল রোহানাকে।

ওমর বলল, আমি আমার আব্বাজানের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি। তিনি এন.এস. আইয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন। ছাত্র নেতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের আলোচনা হয়েছিল, একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে কেউ মিছিল বের করবে না। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। প্রাদেশিক পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে যে সব সীট খালি ছিল তা বাই ইলেকশন দিয়ে তাড়াতাড়ি পূর্ণ করা হবে। মতৈক্য হলো প্রথমে। তারপর কি হলো জানা নেই। মিছিল হবে, একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা হবে, ঠিক হলো। এটা এদেশের ছাত্র সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্ত। তাঁরা সচেতন, আত্মবিশ্বাসী, দেশপ্রেমিক। তবু সেখানে এক অশুভ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘচল। ভার্সিটির বটতলায় তরুণ এক বক্তা, নাম অবিনাশ দাশগুপ্ত, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল, পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিশ্বাস করো না, ওরা কথা রাখবে না। ছেলে ভুলানো কথা বলেছে ওরা। মোয়া তোমাদের হাতে ওরা তুলে দিবে না। তোমাদের অধিকার তোমাদেরই আদায় করতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমে, প্রয়োজনে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। জীবন বিসর্জন দেশপ্রেমের মহত্তম লক্ষণ, মরেও হবে তোমরা অমর, ইত্যাদি কথা। এসবের প্রয়োজন ছিলনা। এদেশের মানুষ নিজের অধিকার বিষয়ে এমনিতেই সচেতন। মাতৃভাষা তাদের প্রাণ, তাদের ইজ্জত, তাদের জন্মগত অধিকার। মুখের জবান কোন কিছুর বিনিময়েই বিসর্জন দিতে রাজি না। তারা সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, জীবন দিতে প্রস্তুত। অন্যদেশ হলে এমন একটা লোকের আবির্ভাব ঝেঁটিয়ে বিদায় করতো। বলতো, উপদেশ খয়রাত করার তুমি কে হে? কিন্তু বাঙ্গালীরা বড় বেশি উদার, ধৈর্যশীল। পরের দিন, একুশে ফেব্রুয়ারি।

ভাই আর ভাই থাকল না। এক ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব ভেঙ্গে গেল আবেগের তীব্র স্রোতে। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা হলো। রক্তপাত ঘটল। রাজপথ রঞ্জিত হলো। তা থেকে জন্ম নিল ঘৃণা, বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। গুলীর পর দিন থেকে অবিনাশ দাসগুপ্ত উধাও।

দু'জনে চুপ। ভাবনার সমুদ্রে ডুবে গেল উভয়েই। নীরবতা ভাঙ্গল ওমর, রোহানা, ভাষা আন্দোলন বল, স্বাধিকার আন্দোলন বল, সব করার অধিকার এ দেশবাসীর আছে। কিন্তু তৃতীয় কোন দেশ যদি এতে কৌশলে হস্তক্ষেপ করে, বুঝতে হবে, এর পিছনে সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা আছে, যা ভয়ংকর এবং প্রলয়ংকরী।

ওমর তাকাল রোহানার দিকে। ওর চোখ দুটো সবসময় স্বপ্নে ভরা। এ স্বপ্ন জীবনের স্বপ্ন, বিশ্বাসের স্বপ্ন। ওর চোখে এখন বিষাদের মলিন ছায়া। মানুষ যতদিন স্বপ্ন দেখে ততদিন প্রফুল্ল থাকে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সে ডুবতে থাকে নিরাশার সমুদ্রে।

রোহানা চৌধুরী এখন কল্পনা করছে অবিনাশ দাসগুপ্তকে। বটতলায় দাঁড়ানো। ব্যাক ব্রাশ করা চুল উড়ছে বাতাসে। বাঁ হাত পকেটে ঢুকানো। ডান হাতের আঙ্গুল নেড়ে কথা বলছে। চোখ জ্বলছে। সেদিনের ছেলেরা ঐ চোখে দেখেছিল তেজস্বিতা। রোহানা চৌধুরী দেখছে কুটিল ষড়যন্ত্রের মায়াবী দৃশ্য।

পুলিশ অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। অবিনাশ

www.pathagar.com

দাসগুপ্তের আস্ফালনকে ভেবেছিল শূন্যে ঘুষি ছোঁড়ার মত।

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে রোহানা চৌধুরী? সরল নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস? অন্ধ বিশ্বাসের ইতিহাস? পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে– এই বক্তব্যে আবেগ এবং ভালবাসা ছিল, যুক্তি এবং দূরদর্শিতা ছিল না। তা না হলে অবিনাশ দাসগুপ্ত এবং আনন্দ বাবুদের কীর্তিকলাপের উপর দৃষ্টি রাখত সরকার এবং জনগণ। যে আনন্দ বাবু এ দেশের প্রভাবশালী পত্রিকা অফিসে কাজ করে গোপনে সব তথ্য পাচার করত ভিন্ন এক দেশে।

উই পোকাকে দেখলে আমরা টিপে মারি না, বালখিল্য বাৎসল্য জাগে, কি নীরিহ নরম প্রাণী। ওর শক্তি কতটুকু? কিন্তু একটা উই পোকা থেকে লক্ষ লক্ষ উই পোকা জন্ম নেয়। কেটে ছারখার করে সবকিছু। রোহানার হাত আবার ওমর তুলে নিল নিজের হাতে। ওর ধ্যানমগ্নতা ভেঙ্গে ফেলার এই একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে যেমন স্পর্শ করা যায়, তেমনি হাতের স্পর্শ প্রেম এবং ভালবাসার কথা বলে। এই আবেগ এমন যে একটা ঢেউ যেন আরেকটা ঢেউ ছুঁয়ে যায় অন্তহীন নৈকট্য দিয়ে। অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া নিয়ে সংলগ্নতার সৃষ্টি করে। ভেসে চলে অন্তহীন ভালবাসার বেগবান স্রোতে। অন্যমনস্কতা ভাঙ্গছে না রোহানার। এবার ওর ঘন কালো চুলে হাত রাখল ওমর। খুব লম্বা না ওর চুল। ঘন ঘন কাটে। ওমর একদিন বলেছিল, কাট কেন? লম্বা চুল এ দেশের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য।

–তুমি চাইলে রাখব।

–তোমাকে অবশ্য দুটোতেই সুন্দর দেখায়।

–তাহলে খাট চুল ভাল। ঝামেলা কমে। লম্বা চুলের যত্নে অনেক সময় যায়।

–তাহলে বেঁচে যাওয়া সময়টুকু আমার, বলে ওমর।

হেসে ফেলে রোহানা।

চুলে ওমরের স্পর্শে চমক ভাঙ্গে রোহানার, কিছু বলবে?

–বাইরে যাব।

–কোথায়?

–রাজার বাগ পুলিশ লাইনে।

–ওখানে কি?

–আক্রমণ হয়েছে।

–ই. পি. আর ক্যাম্প?

–বাদ গেছে বলে মনে হয় না।

–ফিরবে কখন?

–জানি না, তবে চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ফিরতে।

–তুমি ফিরে এলে দুপুরে একত্রে খাব।

www.pathagar.com

–বেশ।

–একটা কথা। তুমি যখন আমার হাতে হাত রেখেছিলে আমার মনে হয়েছিল, মন গান গায় ভালবাসার, চোখ কথা বলে ভালবাসার, কিন্তু হাতের স্পর্শ ভালবাসার অনুভূতিকে ছড়িয়ে দেয় অনেক বিস্তৃত করে। আমার কি যে ভাল লাগছিল।

–তুমি চুপ করে ছিলে বলে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। হাত সরিয়ে নিয়ে চুলে রেখেছিলাম। এত মন খারাপ করেছ কেন রোহানা?

–আমি অশনি সংকেত টের পাচ্ছি।

–যা ঘটার তাতো ঘটবেই। নিয়ন্ত্রণের ভার তো আমাদের উপরে নেই।

–যন্ত্রণা তাই বেশি ওমর।

–ঘুমুতে চেষ্টা কর।

–তুমি ফিরে এলে ঘুমুবো।

–আমার জন্য এত দুশ্চিন্তা কর কেন?

–তুমি যদি হারিয়ে যাও।

–হারিয়ে গেলে ধরে রাখতে পারবে?

–সে জন্যই তো এত ভয়।

–আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখ।

–ঠিক আছে, তুমি এসো।

–একটা বই পড়ে সময় কাটাও, রিল্যাক্স হবে।

–চেষ্টা করে দেখি।

রোহানা অবেলাতেও বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাত মাথার নিচে। চুল ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। আজ শাড়ি পরেছে। মাঝে মাঝে সালোয়ার কামিজ পরে। জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, আমাকে কোনটাতে বেশি মানায় ওমর?

–দুটোতেই সমান।

–আবার মন যোগানো কথা?

–তাই মনে হয়?

–না। অপ্রস্তুত রোহানা বলে, আচ্ছা ওমর, আমি দেখতে সুন্দরী নই. অথচ তুমি কত সুন্দর। কি করে আমাকে এত ভালবাস?

চুপ করে ছিল ওমর। তারপর তার উত্তর ভেসে এল সৌগন্ধ নিঃশ্বাসের মত, রোহানা, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর আমি আর কাউকে দেখি না। তোমার হৃদয়ে ভালবাসা. তোমার চোখে ভালবাসা, তোমার সারা দেহে ভালবাসার বিচ্ছুরণ। মনে হয়, এই ভালবাসার কণাগুলো ভাসতে ভাসতে আকাশে ছড়িয়ে যায়, আবার তা ফিরে আসে পৃথিবীর আকর্ষণে। পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করে কোমল হয়ে যায়। তাই তো পূর্ব পাকিস্তান এত সুন্দর এবং শ্যামল। তুমি তার মাঝে এত ঐশ্বর্যময়।

www.pathagar.com

ভালবাসার আবেগের সুখে সেদিন কাঁদতে ইচ্ছে করছিল রোহানার। কাঁদেনি। শুধু বলেছিল, ওমর তুমি এত উদার? তোমার হৃদয়ের বিশালতা আমি টের পাই, কিন্তু এই বিস্তৃতিকে আমি হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারব কিনা জানি না।

রোহানা, আমরা আমাদের প্রেমকে সংকীর্ণ মুঠোয় ধরে রাখব না। যত একে ছেড়ে দেব, দেখবে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। সৌরভ ছড়াচ্ছে। রোহানা, ফুলদানির ফুলের চেয়ে গাছের ডালে ফুটে থাকা ফুলের সৌন্দর্য এবং সৌরভ বেশি।

এ নিয়ে আর কোনদিন কথা বলে নি রোহানা। সে জানে, ভালবাসাকে বারবার পরীক্ষা করতে নেই। এর সত্যের জোর এত বেশি যে, পরীক্ষা নীরিক্ষায় দাম কমে যায়। সোনা কষ্টি পাথরে একবার ঘষলেই যথেষ্ট। ভালবাসা মানুষের অস্তিত্বকে এমনিই সোনার মত উজ্জ্বল করে তোলে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। সকাল থেকে কার্ফু ছিল। বিকেলে দু' ঘন্টার বিরতি। কার্ফু অমান্য করতে ওমরকে সে নিষেধ করেছিল। ওমর শোনেনি। ওর কথা, সময়ের চাপে হারিয়ে যায়। যা পাওয়া যায় তা ভাসা ভাসা কথা। অতএব সময়মত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা ভাল। ওমরের আইডেনটিটি কার্ড আছে। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ ওটা মানবে কিনা কে জানে?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাস্তার আলো জ্বলেছে তবু যেন অন্ধকার চিড় খায়নি। ঢাকা নগরী তারার বুটি দেয়া উজ্জ্বল মালায় রোজ সন্ধ্যায় সুসজ্জিত হয়ে উঠে, যদিও নগরী তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। পুরোনো ঢাকা পরিকল্পনাহীন। যেখানে সেখানে বাড়ি, কলকারখানা, মিল। এখানে ওখানে নিচু জমি, ডোবা, নালা, মজা নদী ও পুকুর। ধোলাই খাল, শাহাজাহান পুরের রেল লাইনের পাড়ে কচুরিপানায় ভর্তি খাল মশার জন্মস্থান, ময়লা, আবর্জনা ধারণের আধার। তবু সব মিলিয়ে ঢাকা নগরী সাহিত্যিক রোহানা চৌধুরীর চোখে সুন্দরী। এর চলমান জীবন ধারায় প্রাণপ্রাচুর্য এত বেশি যে সব দৈন্য ঢাকা পড়ে যায়। এই নগরীর মানুষ পুরোনো সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য এমন ভাবে বুকে ধারণ করে আছে যে মায়ের বুকের দুধের মত এর স্বাদ এবং গন্ধ। নতুনকে অবশ্য বর্জন করেনি। নতুন এবং পুরোনো দুইয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে। আনন্দ এবং গর্বে ভরে তুলছে প্রাত্যহিক কর্মকান্ড। শহর বাড়ছে। নিত্য নতুন আর্কিটেকচারের কলাকৌশলে বড় বড় প্রাসাদ উঠছে। রাস্তাঘাটের অনেকগুলোই প্রশস্ত এবং দীর্ঘ। আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলো বসে নেই। কর্মতৎপর। বড় বড় হোটেলে বিদেশীদের আনাগোনা সৃষ্টি করে বিস্ময়কর কৌতূহল।

সারা ঢাকা নগরীতেই এমন এক জীবন স্পন্দন প্রতিনিয়ত প্রবাহিত। অথচ আজই এর ব্যতিক্রম। ঢাকা নগরী আর্জ বিষণ্ন, প্রথম বাসর রাতে স্বামীর অসৌজন্যমূলক আচরণের মত।

www.pathagar.com

রাত এল, অন্ধকারের গভীরতা বাড়ল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল রোহানা। ওমর ফেরেনি। রোহানার বুকে ওমরের জন্য দুশ্চিন্তার গভীর ছায়া। ফলের বাগানের দিকে দৃষ্টি পড়ল রোহানার। গভীর স্তব্ধতা। এখন গাছের দেহ গর্ভবতী মায়ের মত আমের মুকুলে ভরা। সফেদা গাছও ফলবতী। এদের এখন হাসি হাসি মুখ থাকার কথা। অথচ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে দেহে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে না। অন্যান্য রাতে জোনাকী পোকা নরম ডানার আলো ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারার মত মিটমিট করে হাসে। একবার জ্বলে, আবার নেভে। আজ ওদেরও দেখা নেই। সবাই যেন কার্ফু টের পেয়েছে।

রোহানার ঘুম আসছে না। গতকাল থেকে তার পেটে দানা পড়েনি। মার অনুরোধে এক গ্লাস দুধ খেয়েছে। মা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, খালি পেটে চা। সময় সময় মা ছেলেমানুষের মত জেদি হয়ে ওঠেন। মেয়েকে না খাইয়ে নিজে কিছু খাবেন না। রোহানা কিছু বলল না।

গভীর রাতের আরামদায়ক ভাব এ বাড়ি থেকে ওধাও। ঝিম্‌ঝিমে ভাব ছড়িয়ে পড়েছে রোহানার মস্তিষ্কে। ঝিমুনি ভাব আসে, আবার চলে যায়। মনে হয় দরজায় কেউ বুঝি ধাক্কা দিল। কেউ না, বাতাস। অন্ধকারে কান পেতে থাকে রোহানা, বাদুড়ের নড়াচড়া, কাকের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনে। উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে সে। উৎকণ্ঠিত হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার চেপে থাকা দীর্ঘশ্বাসকে আরো ঘনীভূত করে, ক্লান্তিতে ম্রিয়মান হয়। কাঁদতে ইচ্ছা করে। ওমরের কথা মনে করে কাঁদে না। সে বলে, অল্প দুঃখে কেঁদো না রোহানা, কে জানে সামনে আরো কত দুঃখ আছে? পরের দিন সকাল দশটায় ওমর ফিরে এল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখের কোণে নীল চাকা চাকা দাগ, বোঝাই যায় অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে। ঠোঁটে জমাট রক্ত। মায়ের সামনেই রোহানা ওমরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওমর ওকে ধরে ফেলল, সাবিহার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওর কি হয়েছে মা?

–দু'দিন ভাত খায় না। তোমার চিন্তায় মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা এক করেনি।

রোহানাকে বুকে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল ওমর। এত ব্যথার মধ্যেও এই তরুণীটির প্রতি বিপুল ভালবাসা আচ্ছন্ন করে দিল দেহ মন। মনে হলো, পৃথিবীতে ভালবাসার মতো এত দুঃখ নেই, এত সুখও নেই। এ যেন এক অন্তহীন লীলা, আদম এবং হাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত এই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে নরনারীকে একটিমাত্র সুরের ছন্দময় গতিতে।

সাবিহা চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ওমর বলল, মা, খাবার আনুন, আমার খিধে পেয়েছে। সাবিহা দরজার দিকে এগুতেই ওমর বলল, তিন আদমী কো লিয়ে খানা লাগাইয়ে মা জী।

–জরুর বেটা।

www.pathagar.com

রোহানা, উঠে বসল বিছানায়। ওমরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, কৌন আদমী তুমাকো মারা, পাকিস্তানী ফৌজ ইয়া বাঙ্গালী লোগ?

নীল চোখে বেদনার আভাস জাগিয়ে ম্লান হেসে উত্তর দিল ওমর, দুনো পার্টি।

–হায় আল্লাহ্, কসুর কিয়া?

ওমর হাত ধরল রোহানার, নেমে এসো। খেতে খেতে গল্প করব। মা জী আপনিও বসুন।

ঘটনার সারমর্ম বর্ণনা করল ওমর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রান্ত হয়েছিল পঁচিশে মার্চের রাতেই। বাঙ্গালীদের ফায়ার আর্মস সারেন্ডার করতে বলেছিল পাকিস্তানী ফৌজ। ওরা তা করেনি। ফলে রীতিমতো খন্ড যুদ্ধ। অনেক লোক হতাহত হয়। ই.পি.আর ক্যাম্পেও ঠিক একই অবস্থা। সবাই রেগে আছে। ক্যাম্পের ভেতরে যেতে চাইতেই পাকিস্তানী ফৌজ বাধা দিল। জোর করে ঢুকতে চাইলাম। কেউ একজন বন্দুকের বাট মাথায় ঠুকে দিল। আরেকটু জোরে হলেই চিচিং ফাঁক, মগজ বেরিয়ে যেত।

ওমর ইচ্ছে করেই কথাগুলো মজা করে বর্ণনা করল। রোহানা একটু হাসুক। মা মেয়ে কেউই হাসল না।

–আমি তখন নাছোড়বান্দা। পিছনের ওয়াল ডিঙ্গিয়ে ই.পি.আর ক্যাম্পে ঢুকে পড়লাম। রোহানা, আমার নীল চোখ আর বাদামী চুল যা তুমি এত ভালবাস তা আমার দুশমন হয়ে গেল। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক রাইফেলধারী বাঙ্গালী সৈন্য আমার বুকের উপর বুটজুতাসহ পা উঠিয়ে চাপতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে মনে হলো, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমার পাঁজর ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে হৃদপিন্ড থেকে। সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে আইডেনটেটি কার্ড বের করে ওদের চোখের সামনে মেরে ধরলাম। সৈন্যটি তাকিয়েও দেখল না।

এমন সময় এক অফিসার এল। তাকে কার্ড দেখাতেই সৈন্যটিকে পা সরিয়ে নিতে বলল। ইশারা করল উঠে বসতে। কিছুতেই পারছিলাম না। অফিসার তার পা দিয়ে আমাকে উল্টে দিয়ে বলল, শালা ওঠ। আমি জানি, না উঠলে নির্ঘাত মৃত্যু। রাইফেল তাক করাই ছিল আমার দিকে। সমস্ত শক্তি এক করে উঠে দাঁড়ালাম।

জেরা আরম্ভ করল অফিসার, আমি পাকিস্তানী স্পাই কিনা। শেষ পর্যন্ত অফিসারটি বিশ্বাস করল আমার কথা। কিন্তু কলম, ডায়েরি কেড়ে নিয়ে বলল, কিছু লিখতে পারবেন না এই শর্তে শুধু আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।

–কেন লিখব না? আপনারা তো আক্রমণকারী নন। আক্রমণকারী পাকিস্তানী ফৌজ। আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি লিখলে অসুবিধে কি?

–এখন আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। এসব ব্যাপার এখন টপ্ সিক্রেট।

www.pathagar.com

–পৃথিবী তো অত্যাচারের কাহিনী জানল না।

–জানবে, জানবে, আমরাই জানাব। তোমার মতো পাকিস্তানী শুয়োরকে জানাতে হবে না, বলে প্রচন্ড ঘুষি মারল আমার চোয়ালে। আমি ঘুরে পড়ে গেলাম। উঠলাম। আবার ঘুষি। তারপর অজ্ঞান। এই অবস্থাতেই ওরা বোধহয় আমাকে দেয়ালের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাকে দেখতে পেয়ে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে চিকিৎসা করে ছেড়ে দিল।

রোহানা, আমার এই চেহারা একবার আমাকে বিপদে ফেলে, আবার বাঁচায়। আমার পেশা, আন্তরিকতা এবং এ দেশের প্রতি ভালবাসা সব আজ অর্থহীন।

সাবিহা এবং রোহানা দু'জনের কারোর মুখে কথা নেই। রোহানার বুকে বেদনার ঝড়, ভালবাসার ঝড় আর দুঃখের অপরিমেয় কষ্ট। বাঙ্গালী এবং পাকিস্তানী এই মানসিক বিভক্তিটা আজ ওমর আর সে বড় দুঃখের সঙ্গে মেনে নিল।

দু'জন নারীর হাতই খানার প্লেট থেকে গুটানো। ওমর বলল, মা জী খানা মে হাত লাগাইয়ে, রোহানা খানা খা লেও।

কয়েক ফোঁটা চোখের লবনাক্ত পানি আগেই মিশে গেছে রোহানার খাবারের সঙ্গে। তবু সে প্লেটে হাত নামাল। নইলে ওমর খানা ছোঁবেও না।

সাবিহা উঠে যেতেই ওমর বলল, এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিতে পার?

–একটু অপেক্ষা কর।

রোহানা বের হয়ে গেল। আধঘন্টা পরে ফিরে এল, হাতে দু'প্যাকেট সিগারেট।

–তুমি গেলে দোকানে?

–ওমর, তুমি কোনদিন কিছু চাও না আমার কাছে। তবু তো আজ কিছু চাইলে।

–বাইরে খুব গন্ডগোল।

–কাজের মেয়েটা গেলেও তো একই অবস্থায় পড়ত।

–তাই নিজেই ঝুঁকি নিলে?

–নিলাম।

ওমর রোহানার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, একটা কথা বলব?

–বল।

–মাঝে মাঝে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আমার অনেক আদর করতে ইচ্ছে করে।

–করলেই পার।

–দেখো, বেশি লাই দিয়ো না। আমি শান্ত হলেও অশান্ত হয়ে উঠতে দেরি হবে না। তুমি ধর্ম মান?

–মানি।

–সামাজিক অনুশাসন মান?

–শোভনীয় রেখা অতিক্রম করতে চাই না।

www.pathagar.com

–তাতে অনেক লাভ?

–জানি না। কিন্তু না পাওয়ার দুঃখে ভালবাসা আরো গভীর হয়ে অন্তর্গত মাধুর্যের সৃষ্টি করে। ওমর, সিগারেট খাও।

–খাচ্ছি। জান, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমি তোমাকে সুন্দর ভাবে কল্পনা করতে পারি। এই সুখের টানের সঙ্গে আরেকটা সুখ আমাকে গভীর তৃপ্তি দেয়।

–আমি তাহলে সিগারেটকে হিংসে করি।

–হোয়াই?

–তুমি একের মধ্য দিয়ে অন্যকে পেতে চাও। তুমি আমাকে অনন্য ভাববে, তাই চাই।

–হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। তবে কি জান, মানুষ কনেকে সাজায় আরো সুন্দর দেখাবে বলে। উপকরণ সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ দুই-ই বৃদ্ধি করে।

–অনেক কবিত্ব হয়েছে। এবার বিশ্রাম কর।

–তুমি এখন ঘুমুবে, কথা দাও।

–দিলাম।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ড্রইং রুমে এসে রোহানা দেখল, ওমর ঘরে নেই। বিস্ময়কর কষ্ট নিয়ে এঘর ওঘর ছুটাছুটি করল রোহানা। ওমরের পাত্তা নেই। ওকে নিয়ে ডাক্তার খানায় যাওয়ার কথা। ব্যান্ডেজ খুলে দেখা দরকার ইনজুরিতে ময়লা আছে কিনা। ফ্রেশ ব্যান্ডেজ দরকার। ওমর কথা বলেনি। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়েছিল রোহানা। সেই অসুস্থ মানুষ কোথায় গেল?

সন্ধ্যার পরে যখন ফিরে এল ওমর, তখন তার গায়ে অনেক জ্বর। চোখ লাল। রোহানা নির্বাক।

–রাগ করেছ?

–না। চল, ডাক্তারের কাছে যাই।

–লাভ নেই। বাইরে ধড়পাকড় হচ্ছে। দোকানপাট, ডাক্তারখানা সব বন্ধ।

–আমার চেনা ডাক্তার আছে। বাসায় নিয়ে গেলে দেখে দেবে।

–রাস্তায় বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'পক্ষ থেকেই গোলাগুলী হচ্ছে।

–সেটা আমি দেখব।

–তোমাকে কোন বিপদের মধ্যে আমি যেতে দেব না।

–ও, এই কথা? আমার জন্য তোমার মমতা। তোমার জন্য আমার কোন মমতা নেই? ঘায়ে যদি সেপ্‌টিক হয়?

ওমর কোনও উত্তর দিল না। বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত নয়টায় রোহানা ডাকল, ওমর ওঠ, কিছু খেয়ে নাও।

www.pathagar.com

–আমাকে শুধু এক গ্লাস হরলিকস্ দাও।

রোহানা হরলিকসের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, ওমর তৈরি হচ্ছে চলে যাওয়ার জন্য।

রোহানা স্তম্ভিত। গাম্ভীর্য নিয়েই কথা বলল, তুমি আমাদের বাসায় কখনো রাত কাটাও নি। আমিও কখনো অনুরোধ করিনি। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় এখানে একটা রাত কাটালে খুব কি অসুবিধে হবে?

–রোহানা, কথা বলে দেরি করিয়ে দিলে হলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

যা বোঝার বুঝে নিল রোহানা, ওমর যাবেই।

হরলিকসের গ্লাস ওমরের হাতে তুলে দিয়ে ঠোঁট চেপে ভেতরে চলে গেল রোহানা। হাসল ওমর।

পথে রিয়াজের সঙ্গে দেখা। তাড়াহুড়া করে হাঁটছে। মুখ মলিন।

–কোথায় যাচ্ছ?

উত্তর দিল না রিয়াজ।

নাছোড়বান্দা ওমর, এ্যাই কাঁহা যা রাহা?

–চুলোয়, রাগান্বিত উত্তর রিয়াজের।

দু'জনেই দি শাইনিং স্টার ডেইলিতে কাজ করে। রাজনৈতিক মতবাদে রিয়াজ প্রতিক্রিয়াশীল। সুযোগ পেলেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের গাল দেয়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মুন্ডুপাত করে। হাসে ওমর। প্রতিবাদ করে না। বলে, যত খুশি গাল দাও, কিন্তু মনে রেখো, শাসকগোষ্ঠি আর জনসাধারণ এক নয়।

–তোরা তো ওদেরই জাতি গোষ্ঠি, এক ঝাড়ের বাঁশ।

–মুসলমান ভাই ভাই, ওমরের হাসি হাসি উত্তর।

–শালা নীতি কথা আওড়াস নে। আর্য রক্ত নিয়ে তোরা পাঞ্জাবীরা কম বড়াই করিস নে।

রাগের ভান করে ওমর, তোরা তো আদি হরিজনদের বংশধর। ইসলাম কবুল করে জাতে উঠেছিস।

–সেই হরিজন মেয়েকে নিয়েই তো প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস শালা। তোর ছেলেমেয়েরা হরিজনের রক্ত নিয়েই জন্মাবে।

হো হো করে হেসে উঠল ওমর বাট, তোরা বাঙ্গালী জাত কথার মারপ্যাঁচে ওস্তাদ। আয় হাত মেলা। আমরা তৌহিদে বিশ্বাসী, এইটেই বড় কথা।

রিয়াজ হাত মেলায়, হাসে। বলে, হার যখন মানলি তখন চা খাওয়া।

বেয়ারাকে ডেকে গরম চা আর সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিয়েছিল ওমর বাট।

সেই রিয়াজ আজ বিরক্ত এবং খাপ্পা।

ওমর কাছে এসে রিয়াজের হাত শক্ত করে ধরল, কি হয়েছে বল, কোন অসুবিধে?

www.pathagar.com

–চোখে দেখতে পাচ্ছিস না, তোর জাত ভাইরা কি করছে? আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এ্যারেস্ট করবে বলে। হাত ছাড় বলছি, আলগা দরদ দেখাতে আসিস না।

–এমন করে বলছিস কেন? বিপদ তো আমাদের সবার।

–তোর কি বিপদ? তুই তো ওই দেশেরই মানুষ। চাকরির খাতিরে এখানে পড়ে আছিস।

–যত খুশি গাল দে, কিন্তু এমন করে বলিস না। এ দেশের মানুষকে আমি ভালবাসি।

–বাঙ্গালী মেয়েটাকে ভালোবাসিস বলে আদিখ্যেতা দেখাচ্ছিস।

–দেশটাকে ভালোবাসি বলে মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলেছি। ওর চোখে মুখে, ভাষায় আমি এদেশের জীবন ধারার প্রতিফলন দেখতে পাই, বলল ওমর।

–তুই তোর আদর্শবাদ নিয়ে থাক। হাত ছাড়, আমাকে যেতে দে, বলে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল রিয়াজ।

ওমর চিৎকার করে বলল, তোর কোনও উপকারে আসতে পারি?

উত্তর দিল না রিয়াজ। দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। হতভম্ব হয়ে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রইল ওমর। জীবনে এমন দুঃখের আঘাত সে কখনো পায়নি। রিয়াজ তার শুধু সহকর্মী নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু। আজ সেও তাকে বিশ্বাস করল না। বিভক্তি করণের চিহ্ন এঁকে দিয়ে আজ তাকে অনেক দূরে ঠেলে দিল এ দেশের মানুষের কাছ থেকে। গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ওমর।

ওমর কিছু দূর এগুতেই রোহানাদের পাড়ার মিসেস সায়েমা খন্দকারকে দেখল। রিক্সায় জিনিসপত্র চাপিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে। রিক্সার চেন পড়ে যাওয়ায় রিক্সাওয়ালা সীট থেকে নেমে চেন ঠিক করছে। ওমর কাছে এল, আন্টি কোথায় যাচ্ছেন?

মহিলা প্রথমে চমকে উঠল শেষে বিব্রত মুখে উত্তর দিল, এ পাড়ায় থাকা সম্ভব হলো না। তাই চলে যাচ্ছি।

–কোথায় যাচ্ছেন?

–তোমার শুনে কি দরকার?

ওমর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই চিৎকার করে ডাকল মহিলা, এই শোনো।

ওমর ফিরল।

–তুমি তো পশ্চিম পাকিস্তানী।

–হ্যাঁ।

–আমার একটা উপকার করবে?

–বলুন?

–আমার ছেলেকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। ওকে ছাড়িয়ে আনতে পার?

–পারি না। বোমা ফাটানোর সময় মিলিটারিরা ওকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।

www.pathagar.com

–কে বলেছে এসব কথা?

–পাড়ার অনেকেই দেখেছে। রোহানাও দেখেছে।

–ঐ আইবুড়ো মেয়েটার কথা বিশ্বাস করলে?

–ভদ্রভাবে কথা বলুন।

–তুমি ওবাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত কর। অথচ ওবাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নেই।

–তাতে কি হয়েছে? রোহানা আমার ভাবী স্ত্রী।

–বিয়েটা করে ফেললেই পার। তাহলে তো লোকে কথা বলার সুযোগ পায় না।

–ওটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি নিজের ঘর সামলান।

–মানে?

–আপনার ছোট ছেলে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। মিলিটারিরা দেখলে গুলী করবে।

–মিথ্যে কথা।

–এই দেখুন, আমি দেয়াল থেকে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছি। দেখুন কি লেখা, পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিপাত যাও, এ দেশ ছেড়ে চলে যাও।

–আমার ছেলেই যে লিখেছে তার প্রমাণ?

–ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

মহিলা ছেলের দিকে তাকাল, কিরে তুই লিখেছিস?

তেজের সঙ্গে উত্তর দিল ছেলেটি, আমিই লিখেছি। আরো লিখব।

ওমর কিছু না বলে হাঁটতে আরম্ভ করল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ, দেশটা কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মানুষ সাহসী হচ্ছে। হলে যখন পৌঁছল রাত দশটা। রুমের আসল মালিক দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে যাচ্ছে। ওমর বলল, চাবিটা দে মুহিত।

–না।

–কেন রে?

রুষ্ট কণ্ঠস্বর মুহিতের, একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে রুমে জায়গা দিয়েছি, কথাটা জানাজানি হলে আমার বিপদ হবে।

–তুমি পাকিস্তানী নও?

–ছিলাম। এখন থাকব কিনা এ প্রশ্ন এ দেশের জনগণের।

–বেশ। আজ রাতটা অন্তত থাকতে দাও। আমি খুব ক্লান্ত এবং অবসন্ন।

–পারব না।

–মুহিত, রাজনীতি রাতারাতি বদলাতে পারে, মনুষ্যত্ব বদলায় না। কথা দিচ্ছি, সকালে উঠেই আমি চলে যাব।

একটু সময় ভাবল মুহিত। তারপর চাবিটা তাচ্ছিল্য ভরে ওমরের হাতে ফেলে দিয়ে বলল, প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন। নইলে গন্ডগোল করব।

www.pathagar.com

কথার উত্তর না দিয়ে ওমর দরজার তালায় চাবি ঘোরাল। জুতা না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। অথচ রিয়াজ অথবা মুহিত কেউ একবারও জিজ্ঞেস করেনি, তার কি হয়েছে। অথচ কতদিনের বন্ধুত্ব এদের সঙ্গে। মুহিত ভার্সিটির নামেমাত্র ছাত্র। ছাত্র রাজনীতি করে। কোন দল করে, জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না।

তবে অবিনাশ দাসগুপ্তের বটতলার মিটিংয়ে মুহিতকে দেখা গিয়েছিল। তখন বয়স অল্প। হাত তুলে তুলে কি সব শ্লোগান দিচ্ছিল।

পেট্রল কারে পুলিশ কমিশনার টহল দিচ্ছিলেন। ওমর বাটের বাবা সেলিম বাটও ছিলেন সেই কারে। বললেন, একটা কথা বলব স্যার।

–বলুন।

–লোকটাকে অ্যারেস্ট করুন স্যার।

–কেন?

–ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে।

–পুলিশের কর্মকর্তা রেগে আগুন, তুমি পুলিশের কর্মকর্তা, না আমি?

–সরি স্যার। এটা টীম ওয়ার্ক মনে করেই কথাটা বলেছি।

–তোমরা পশ্চিমারা আসলে সন্দেহবাজ। তিলকে তাল বানাও। ভদ্র লোক হয়তো ঢাকা ভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্র। সুযোগ বুঝে বক্তৃতা ঝাড়ছে।

–সুযোগ কি দেয়া উচিত? কাজটা আইনের বিরুদ্ধে।

–কথায় কথায় আইন ঝেড়ো না মিঃ বাট। তোমাদের নিয়ে অসুবিধে এই যে তোমরা গণতন্ত্র বোঝ না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতবাদ প্রচার করার অধিকার আছে। স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কিছু না বললেই হলো।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সেলিম বাট। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, এই লোকটি ভিন্ন এক দেশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক। ধ্বংসাত্মক কাজেই নেমেছে। তার ডিটেক্ট করার কথা। অ্যারেস্ট করার কথা পুলিশ বিভাগের। না করলে তার কিছু করার নেই।

আব্বাজীর গলায় গভীর ক্ষোভ এবং হতাশা ছিল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বিপদের আভাস পাচ্ছি। ওমরের 'ও' লেভেলটা শেষ হলেই আমি বদলি হয়ে দেশে চলে যাবো।

–আপনি মুসিবত দেখে চলে যাবেন? কর্তব্য করবেন না? স্ত্রীর মৃদু উত্তর।

–আমার কথা এখানকার প্রশাসন বিভাগ শোনে না, পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরা বিশ্বাস করে না। খামাকা দুর্নামের ভাগী হয়ে কি লাভ? চলেই যাব।

ওমর বাট বালক। তবু তার চোখে মুখে কৌতূহল, আব্বাজী আপনি প্রায়ই বলেন, এটাও আমাদের দেশ। তবে চলে যাবেন কেন?

www.pathagar.com

–বেটা সাচ্ বাত হ্যায়। কিন্তু রাজনীতিতে ভুল করলে সমস্ত জাতিকে খেসারত দিতে হয়। নসিবে কি আছে কে জানে?

উনিশ বছর পরে আবার সেই অবিনাশ দাস গুপ্তদের আবির্ভাব। অশনি সংকেতের দ্বিতীয় পর্ব শুরু।

আব্বাজী সত্যি সত্যি বদলি হয়ে ফ্যামিলি নিয়ে করাচী চলে গিয়েছিলেন। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও ওমর বাট যায় নি। রোহানা চৌধুরীর সঙ্গে তখন তার গভীর প্রেম। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়।

এই দেশকে ভালোবেসে ফেলেছে ওমর বাট। এ অঞ্চলের মানুষগুলো কত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। রুক্ষ মেজাজের নয়, কোমল স্বভাবের। কিন্তু জটিল পরিস্থিতির শিকার হয়ে আজ তারা হিংস্র, রুক্ষ। যারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিত সহজে, আজ সেই হাতকে গুটিয়ে নিয়েছে নির্মম ভাবে।

ওমরের খারাপ লাগছে। মনে হলো, রোহানার কাছে এখনই সে ফিরে যায়। নিজের মনেই হাসল, পাগল। এত রাতে রাস্তায় বেরুনো বিপজ্জনক। টহল দিচ্ছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। তাছাড়া রোহানাদের বাসার গেটেও তালা পড়েছে। মেয়েটা তার চিন্তায় পাগল। নিজেও সে উদভ্রান্ত। বিয়েটা সেরে ফেললেই পারতো। কতজনেই তো এ ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পরমুহূর্তে নিজের মনে বলে উঠল ওমর, ছিঃ! দুঃসময়ের সুযোগ নিতে পারবে না সে। তার ভালবাসাকে হীনমন্যতায় জড়িয়ে ছোট করতে চায় না। রোহানাই বা কি ভাববে? ঘর জামাই থাকাটা রোহানা পছন্দ করবে না। অথচ আগামীকাল ভোর থেকে তার থাকার জায়গা নেই।

৭

রোহানা চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় পর্বটা যেন একটা সুন্দর নিটোল গল্প।

একদিন পত্রিকা অফিসে ঝড়ের বেগে ঢুকল এক তরুণী। মনে হলো এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরের উত্তাপকে মিইয়ে দিল। প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ার মতো সুন্দরী নয়। শ্যামবর্ণ, ছোটখাট দেহ। কিন্তু পরিচ্ছন্ন এবং রুচি সম্পন্ন। সাজে এবং পোশাকে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ঠান্ডা হয়, স্নিগ্ধতার আমেজ নামে সারা দেহ জুড়ে।

রিয়াজের টেবিলে বসে কথা বলছিল। রিয়াজ আড় চোখে ওমরের দিকে তাকাল। ওমর বাট ততক্ষণে নিজের কাজে চোখ নামিয়েছে।

–এই যে ভায়া, এদিকে একবার নজর দাও।

–কিছু বলছ?

–হ্যাঁ, এই ভদ্রমহিলার একটা ইন্টারভিউ নেয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু এমন ভাবে কাঁধে কাজ চেপেছে যে দম ফেলার সময় নেই। তুমি আমার হয়ে কাজটা সেরে দাও।

www.pathagar.com

–কিসের ইন্টারভিউ?

ওহো আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। এর নাম রোহানা চৌধুরী। এদেশের একজন উদীয়মান কথাশিল্পী। বেশ ট্যালেন্টেড্। তাছাড়া সাংবাদিক, দু' দুটো কাগজের সঙ্গে জড়িত।

–কথা বললে বুঝতে পারব সত্যি ট্যালেন্টেড্ কিনা। মানুষের গুণ প্রচারের ব্যাপার নয়, বিকাশের ব্যাপার।

ওমর বাটের কথা শুনে রোহানা চৌধুরীর মুখ কালো হলো। পরমুহূর্ত উজ্জ্বল, বাঃ আপনি তো চমৎকার কথা বলেন।

রিয়াজের টেবিল ছেড়ে মেয়েটা তার টেবিলে এসে একেবারে মুখোমুখি বসল।

ওমর এবার ওর মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। চোখ দুটো কৌতূহলে উজ্জ্বল। সারা দেহেই শোভনীয় দীপ্তি।

–কোন্ বিষয়ে ইন্টারভিউ দেবেন? ওমরের প্রশ্ন।

–একজন সাহিত্যিক কি বিষয়ে ইন্টারভিউ দেন বলে আপনার ধারণা?

মনে মনে মার খেল ওমর। মুখে হাসি বজায় রেখে বলল, পেশাগত, ব্যক্তিগত, ক্রীড়া, গান কত কিছুই তো হতে পারে। একজন মানুষের একাধিক গুণ থাকা অসম্ভব নয়।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তীব্রতর হলো রোহানার চোখে, আমার প্রিয় বিষয় সাহিত্য।

–বেশ আসুন। একটা রিসেন্ট ফটো লাগবে।

–এনেছি, নিন।

–ফটো দেখে অবাক ওমর, কবেকার?

–মাসখানেক আগের।

–ফটো দেখে মনে হয় সতের আঠারো বছরের টিনেজার।

–আই এ্যাম টুয়েন্টি নাইন।

হতবাক ওমর, আপনাকে বড়জোর কুড়ি একুশ মনে হয়। না বললে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতাম না। তাছাড়া বয়স তো মেয়েরাই লুকোয়।

–আজকাল ছেলেরাও লুকোয়।

–ওটা চাকরির সুবিধের জন্য।

–কিন্তু আমার বাবা ছেলে এবং মেয়ে কারোর ব্যাপারেই বয়স কমাননি। বড় হয়ে আমরা যখন বাবাকে চ্যালেঞ্জ করেছি, বাবার উত্তর, মা বয়স কমালে কি হায়াত বাড়ানো যায়? মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়েই আসে। তাছাড়া জীবনের প্রথমেই মিথ্যে দিয়ে আরম্ভ করবি?

–বাঃ দারুণ প্রজ্ঞাময় ব্যক্তি, দেখতে ইচ্ছে করছে, ওমরের অকপট উক্তি।

রোহানা চৌধুরীর চোখ ছল ছল, গলা ভারি, বাবা বেঁচে নেই।

www.pathagar.com

–তাতে কি হয়েছে? তাঁর মেয়েকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি আপনার মধ্যে বেঁচে আছেন।

–এমন করে বলবেন না মিঃ ওমর, কষ্ট হয়। আমরা কেউই তাঁর মতো হতে পারিনি। ফেরেস্তা কখনো দেখিনি। কিন্তু আমার বাবাকে দেখলে সেই ঐশ্বরিক দীপ্তিময় ফেরেস্তাদের কথাই মনে হতো।

–আপনি ভাগ্যবতী। আসুন, ইন্টারভিউ আরম্ভ করি।

ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে ওমর শুধু বিস্মিত নয়, মুগ্ধ। ইংরেজী কাগজ, প্রশ্ন ইংরেজীতে, উত্তরও ইংরেজীতে। কিন্তু এমন সাবলীল ভঙ্গিতে ইংরেজী বলতে খুব কম বাঙ্গালী মেয়েকেই দেখেছে ওমর। এছাড়া সাহিত্য সম্পর্কে রোহানা চৌধুরীর জ্ঞান গভীর এবং বিশ্লেষণমূলক। মেয়েটাকে ঠকাবার জন্য জেদ চেপে গিয়েছিল ওমরের। কঠিন কঠিন প্রশ্ন রেখেছে। প্রতিবারই সহজ, সরল এবং অর্থপূর্ণ উত্তর দিয়েছে রোহানা চৌধুরী। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, শ্লেষ কিছুই ছিল না তার কথায়। প্রাণবন্ত এবং গঠনমূলক বক্তব্য। জীবন, সমাজ, সাহিত্য সবকিছু সে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখল। বিরূপ হয়ে উঠল না সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিতে।

সে নিজেই বলল, মিঃ ওমর, আমি জীবনকে পূণ্যের বোঝা বলে মনে করিনা। মানুষ অতি প্রাকৃত প্রাণী নয়। ভুল ভ্রান্তি; পাপ পূণ্য, আশা নিরাশা, সফলতা বিফলতা, সব মিলে মানুষের জীবন। জীবন সরল রেখা নয়, যেন নদীর অসংখ্য বাঁক, নদীর সেই চলার পথে কত উত্থান পতনের ইতিহাস। মানুষের জীবন তো এমনিই। আমি আমার গল্প উপন্যাসে এই ভাবেই জীবনকে আঁকি।

–আপনি সমাজকে কষাঘাত করে এর বিবেককে জাগ্রত করতে চান না? রোহানা চৌধুরীর উত্তর শুনে মুগ্ধ ওমর বাট।

–চাই কিন্তু তাতে আমার সহানুভূতি এবং ভালবাসা থাকবে। শুধু আঘাত করলে চৈতন্যের উদয় হয় না। একজন শিল্পীর মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি মানবতা বোধ থাকবে। ভালবাসাহীন কর্তব্য যেমন ব্যক্তি বিশেষের জন্য আকর্ষণীয় নয়, তেমনি দেশ এবং মানবতার জন্যও হিতকর নয়। আবেগ এবং ভালবাসা মানুষকে সীমাহীন সুন্দর করে। এই সৌন্দর্য বোধ নিয়েই সাহিত্যিক তার সাহিত্য সৃষ্টি করে।

ওমরের মুখে কথা যোগায় না। অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকল। হঠাৎ সে উদ্ধত হয়ে প্রশ্ন করে, এগুলো কি আপনি সাহিত্য উৎকর্ষের সূত্র হিসাবে বিশ্বাস করেন, নাকি নিজের জীবনের প্রতিফলন হিসাবে দেখতে চান?

এই প্রথম রোহানা চৌধুরীর চোখ সরাসরি ওমরের চোখের উপর পড়ল। তাকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর নিজেকে প্রকাশ করল সংকোচহীন সরলতায়, মিঃ ওমর, যে ভালোবাসতে জানে না, সে ভালবাসার কথা বলতেও জানে না। বললেও তার কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। আসলে সমগ্র সৃষ্টিটাই তো বিধাতার ভালবাসার ফসল। মানুষ তাঁর

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ ভালবাসার ধন। সে যদি নিষ্ঠুর হয়, বুঝতে হবে প্রকৃতি তার মধ্যে ঠিকভাবে কাজ করছে না। সে এক অস্বাভাবিক প্রাণী। জীবনের বড় ঐশ্বর্যই ভালবাসা। আমি তাকে হারাতে চাই না, অর্জন করতে চাই।

জীবনে এই প্রথম ওমরের মনে হলো, যে তার সামনে বসে আছে, সে শুধু একজন নারী নয়, উৎকৃষ্ট জীবন বোধের এক নির্মল মডেল। তার চোখ, মুখ, ঠোঁট অবয়ব সবই ভালবাসা স্নাত এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। এমন মেয়ে এই সবুজ শ্যামল উর্বর দেশেই জন্মাতে পারে। যে স্বপ্ন নিয়ে জন্মায়, স্বপ্ন দেখে উন্নত জীবনের। তারপর মায়াময় স্বপ্ন নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

দু'জনের কারুর মুখেই কথা নেই। চুপচাপ বসে রইল। ফোন বেজে উঠতেই সম্বিত ফিরে পেল ওমর।

–আপনার ইন্টারভিউ শেষ।

–উঠি?

–এক কাপ চা খেতে হবে।

–চা তো আমার খাওয়াবার কথা।

–কেন?

–এত কষ্ট করলেন আমার জন্য।

–উঁহু, কষ্ট করে ইষ্ট মিলল।

–ইষ্ট মিলল মানে?

–আপনাদের ভাষায় ইষ্ট মানে তো অভীষ্ট বস্তু বা প্রিয়।

রক্তিম হলো রোহানা চৌধুরী। লজ্জাটুকু কাটাবার জন্য বলল, আপনাদের ভাষা মানে?

–ওহ্ সরি, রিয়াজ বলেনি যে আমি জাতে পাঞ্জাবী?

রোহানার হতভম্ব ভাব। রিয়াজ তার টেবিল থেকে চিৎকার করে উঠল, ও শালা আসলে খোট্টা।

–দ্যাখ, যাচ্ছেতাই বলিস নে।

রোহানা দু' বন্ধুর ঝগড়া থামাবার জন্য বলল, আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন যে, বোঝার উপায় নেই আপনি বাঙ্গালী নন।

–এই যে একটু আগে ইন্টারভিউতে বললেন, ভালবাসা। এই দেশটাকে, মানুষদের ভালবেসে ফেলেছি। ওমরের ইচ্ছে হলো বলে, আপনাকেও। কিন্তু বলল না, শত হলেও প্রথম পরিচয়।

–জানেন আমি আসলে বোকা।

–কেন বলুন তো?

–আপনার চোখ নীল, চুল লাল্চে। বাঙ্গালী যত ফর্সাই হোক, চোখ নীল হয় না।

www.pathagar.com

ওমর উত্তর দিল, দুঃখ এইটেই যে আমার চোখের রং আপনাদের সঙ্গে এক হতে দেয় না।

–নীল চোখ আমি দারুণ ভালবাসি, বলা মাত্রই রোহানা চৌধুরীর মুখ লজ্জায় লাল।

রোহানার দিকে ওমরের দৃষ্টি পলকহীন। ঢোক গিলে বলল রোহানা, বলছিলাম কি সীজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ছবিতে লীজ টেলরের নীল চোখ দেখে মনে হয়েছিল লীজ যেন আসল ক্লিওপেট্রা। নীল নদের সব নীল এসে জমা হয়েছে ওর চোখে, কী সুন্দর!

–আমাকে দেখে সেই নীলের কথা মনে হচ্ছে?

অনেক সহজ রোহানা চৌধুরী এখন, হ্যাঁ। নীল রং কি ব্যক্তি বিশেষের চোখে এসে বদলে যায়? একই রকম সুন্দর থাকে।

–সত্যি বলছেন?

–হ্যাঁ। সব মিলিয়ে আপনি খুব সুন্দর। আকর্ষণীয়। মুগ্ধ আনন্দে ওমর বাট মূক। এক সময় মুখ খুলল, ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের রূপের প্রশংসা করে। এ ক্ষেত্রে উল্টো ব্যাপার ঘটল।

– যা সত্যি তাই বললাম। আপনি কি বলবেন? আমি ত সুন্দর না।

–আপনি কত সুন্দর, আজ বলব না, অন্যদিন বলব।

এরপর দু'জনেই চুপ। মনে হলো, প্রথম পরিচয়েই বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে চা সিঙ্গাড়া এসে গেছে। খাবারের অংশ বিশেষ রিয়াজের টেবিলে পাঠিয়ে দিল ওমর। চায়ে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলল রিয়াজ, রোহানা চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়টা সেলিব্রেট করছিস নাকি? শালা দেখিস, বাঙ্গালী মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত ঘোমটা পরিয়ে তোর দেশে পাচার করিসনে।

দু'জনেই হাসল, কথার উত্তর দিল না। ওমর অবশেষে রোহানা চৌধুরীকে বলল, প্লিজ, কিছু মনে করবেন না, ওর মুখে কোন লাগাম নেই। আমাকে খুব ভালোবাসে, তাই যা খুশি বলে। নিন, আরম্ভ করুন, বলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল রোহানা চৌধুরীর সামনে।

সাতদিন পরেই ওমর বাট রোহানা চৌধুরীদের শেরে বাংলা নগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত।

–আপনি?

–খুব অবাক হলেন? বিরক্ত হলেন নাকি?

–যদি বলি দারুণ খুশি হয়েছি।

–বিশ্বাস করব।

–এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস এলো?

www.pathagar.com

–সবার উপরে আসে না। কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়।

–যদি কখনো ভুল ভেঙ্গে যায়?

–ভাবব, সে জন্য আমি দায়ী, আপনি নন। ভেতরে আসুন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এই তিনশ' চার রুমের বাল্বের উজ্জ্বল আলো আড়াল করার জন্য ওমর বাট নিজের চোখের উপর হাত রাখল। মাথার আঘাত টনটন করছে ব্যথায়। সারা শরীর ক্লান্তির ভারে অবশ। তবু পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন এত আনন্দদায়ক, কষ্ট লাঘব করছে।

সেদিনের এই বিশ্বাস কোনদিন ভাঙেনি রোহানা চৌধুরী। দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। রোহানা এমন মেয়ে যে বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে লালন করে পবিত্র আমানতের মতো। ওর চরিত্র এমন যে, যে পাত্রে রাখা যায় রং বদলায় না। আপন শোভায় আপনি শোভিত। তাইতো ওকে ভালোবেসে এত মুগ্ধ, এত আনন্দ।

দি শাইনিং স্টারের দুটো কপি এনেছিল ওমর, রোহানা চৌধুরীর জন্য। পাতা খুলে দেখে রোহানা বিস্মিত, এত তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ ছাপা হবে, ভাবেনি সে। পড়ে দেখে আনন্দে আত্মহারা। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে ওমর বাট যা চিন্তাই করা যায় না। গাছ থেকে এলোমেলো নানা জাতের ফুল এনে মানুষ যেমন তার নিজের মনের রুচি এবং সৌন্দর্যবোধ দিয়ে ফুলদানিতে সাজায় তেমনি রোহানা চৌধুরীর কথাগুলো ওমর বাট সাজিয়েছে অন্তরের সব মাধুর্য এবং উদারতা ঢেলে দিয়ে। ভাষা, আবেগ এবং রচনাশৈলীতে তা ছাড়িয়ে গেছে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের শিল্পগুণ।

রোহানা চৌধুরী সরাসরি তাকাল ওমর বাটের চোখের দিকে। এই চোখ শুধু আকাশের নীল রং স্মরণ করিয়ে দেয় না, তার সীমাহীন বিস্তৃতিকেও মনে করিয়ে দেয়। মানুষ শুধু কর্মে বড় হয় না, হৃদয়ের সম্পদেও বড় হয়।

আনন্দ ভরা চোখের পানি লুকোবোর জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল রোহানা, বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।

চা নাস্তা, সেই সঙ্গে মাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রোহানা, মা, এ ওমর বাট। ও জার্নালিস্ট। ওর দেশ পাঞ্জাব।

ওমর উঠে দাঁড়িয়েছিল। সাবিহা চৌধুরী বললেন, বস বাবা, বাসায় এত ফর্মালিটিজ কিসের?

যেমন মেয়ে তেমনি মা। সহজ, সরল আন্তরিক। প্রথমেই তুমি সম্বোধন, অনুমতি গ্রহণের ভড়ং না করে। দূরে চলে যাওয়া নিজের মাকেই মনে পড়ল ওমর বাটের। নিজের হাতে প্লেটে নাস্তা তুলে দিল রোহানা। ঠিক বাঙ্গালী মেয়ের মতো আদর করে, শাসন করে খাওয়াল। এক সময় বিদায়ের পালা এল। গেট পর্যন্ত এল রোহানা। বলল,

www.pathagar.com

আবার আসবেন।

–আপনি চাইলে আসব।

–আপনি নিজে চান না?

–চাই। কিন্তু অজুহাত লাগে তো?

হেসে ফেলল রোহানা, দুষ্টু বুদ্ধিও দেখি আছে।

–আপনাকে দেখার পর থেকে ওটা মাথায় গজিয়েছে।

–এবার ইন্টারভিউয়ের কাগজ থাকবে না আর হাতে। কোন অজুহাতে আসবেন?

ওমরের ইচ্ছে হলো বলে, আপনিই অজুহাত। কিন্তু বলল না। অন্য কথা পাড়ল, এবার হাতে খাতা কলম নিয়ে আসব।

–ওমা সেকি, ছাত্র নাকি? পড়াশোনা করবেন?

–ঠিক তাই। আমাকে বাংলা শেখাবেন।

–আপনি চমৎকার বাংলা বলেন।

–বলতে পারি। লিখতে পড়তে পারি না।

–বিনা শর্তে শেখাব না।

নীল চোখ বিস্ফারিত, কি শর্ত?

–আমাকে উর্দূ শেখাবেন।

হো হো করে হেসে উঠল ওমর, তাই বলুন। মনে মনে ভাবল, রোহানা চৌধুরী এমন মেয়ে নয় যে আবেগের কথা বেফাঁস বলে ফেলবে। ওসব কল্পনা করা বৃথা।

–হঠাৎ এমন সখ?

–আপনার সখও তো হঠাৎ।

–আমি এখানে চাকরি করি। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি, খবর সংগ্রহ করতে হয়। বাংলা পুরোপুরি শেখা দরকার।

–আমার প্রয়োজন, কৃষনচন্দর, খাজা আব্বাস, সাদত হাসান মান্টো, কবি ইকবাল এঁদের অরিজিনাল বই পড়া। এছাড়া গালিব, আমীর খসরু এঁরা তো আছেনই।

–বেশ রাজি।

–আমিও রাজি।

ওমরের ভীষণ ইচ্ছে হলো, রোহানা চৌধুরীর হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। পারল না। রোহানা দাঁড়িয়ে আছে চোখে মুখে আন্তরিকতার আভাস ছড়িয়ে, কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। দৃষ্টি ওমরের দিকেই।

মৃদু হাসল ওমর। রোহানা চৌধুরীও হাসল নিঃশব্দে।

দু'জনের পড়াশোনা ঠিকমতোই চলল। কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো জীবনের অন্তর্গত ভালোবাসার স্রোত বয়ে চলল, নিঃশব্দে দু'জনের অন্তরের শিরা-উপশিরা বেয়ে বেয়ে, কেউ সে কথা মুখে বলল না।

www.pathagar.com

ন্ধিতে দু'জনেই গাঢ় এবং গভীর হলো।

। কিশোর কিশোরী নয় যে ভালবাসায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠবে। টীনেজার নয় যে তে মুখর হয়ে উঠবে। নদী যেমন বয়ে চলে ধীরে ধীরে, অথচ পরিপূর্ণতার গ ঐশ্বর্যময়ী হয়ে, তেমনি তাদের অবস্থা। দুকূল প্লাবিত করে পারের মাটি, পথ ঘাট গ্রাম প্রান্তরকে শস্য-শ্যামল করে দিয়ে আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। সুন্দর হয়, পবিত্র হয়, পরিপূর্ণ বিকাশে হয় গৌরবান্বিত।

ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের কথাও বলে তারা।

রোহানা চৌধুরী একটা প্রাইভেট গালর্স স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার কাজও করে। বেতন যা পায় এবং লিখে যা উপার্জন করে, মা মেয়ের সংসার কোনও মতে চলে যায়। বাড়িটা নিজেদের, তাই রক্ষে। ভাড়া গুনতে হয় না। ভাইরা সব বিদেশে। একটিমাত্র বোনকে বিদেশে নিয়ে যেতে চায়, রোহানা রাজি নয়। নিজের দেশে থেকে ও দেশকে কিছু দিতে চায়। চাকরি এবং লেখার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা করে প্রচুর। ইংরেজী সাহিত্যের দিকে প্রচন্ড ঝোঁক।

সাবিহা চৌধুরীর দুঃখ, ইংরেজী, অর্থনীতি এবং বাংলা এই তিনটে সাবজেক্ট নিয়ে মেয়েটা পড়াশোনা করল অথচ শেষ পর্যন্ত এম, এ, পরীক্ষাটা দিল না। ওর নাকি পরীক্ষা দিতে ভাল লাগে না, এটা কেমন সৃষ্টি ছাড়া কথা?

ওমর বলল, মা, বেশি ডিগ্রী নিলে অলংকার বাড়ে, কিন্তু যে অলংকার ছাড়াই সুন্দর, তার তো এসব লাগে না।

–কি যেন বাবা বুঝি না। তবে সময় পেলেই ও লিখতে বসে। পরীক্ষার কথা ভাববে কখন?

–ওর ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্ট অন্য সব কিছুর চেয়ে বড়। ওকে ওর মতো থাকতে দিন মা।

সাবিহা চৌধুরী চলে যেতেই রোহানা বলল, আমাদের দেশের পুরুষরা ভাবে, অলংকার ছাড়া মেয়েদের সুন্দর দেখায় না, তুমিই কেবল ব্যতিক্রম, ওমর।

–ব্যতিক্রম আমি নই, তুমি। তোমার জীবনের সহজ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে।

–তুমি নিজে এত ভাল বলেই কি আমাকে এত ভাল বল?

–এ প্রশ্নের কোনদিন মীমাংসা হবে না রোহানা। নদী যখন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তখন মোহনার সৃষ্টি হয়। তা এত বিশাল হয় যে, বোঝা যায় না, আসলে এটা নদী না সমুদ্র।

রোহানা ওমরের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে রইল, কথা বলল না।

হাতটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে নিল ওমর। মাথাটা এখনো ঝিম্ ঝিম্ করছে। ঘুম আসছে না। পানি খেতে ইচ্ছে করছে, উঠতে ইচ্ছা করছে না। শুয়ে শুয়েই আবার

www.pathagar.com

ভাবতে লাগল রোহানার কথা।

প্রেম এবং মমতা দিয়ে দিন দিন ওমরকে স্নাত করে দিচ্ছে ও। অথচ ওকে ধরে চুমুতে চুমুতে ওর সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দেয়ার অধিকার দিল না রোহানা। মেয়েটা ধর্মভীরু, আশ্চর্য।

রাত বাড়ছে। ওমরের চোখে ঘুম নেই। এক গ্লাস পানি খেয়ে নিয়েছে। এখন চিন্তা অন্যরকম। ভোর হওয়া মাত্র এখান থেকে চলে যেতে হবে। কোথায় যাবে, তা সে নিজেও জানে না।

ভেবেছিল বর্ডারে যাবে, স্রোতের মতো লোক চলেছে বর্ডারের দিকে। সীমানা পেরিয়ে ইন্ডিয়া ঢুকবে। রিফিউজি হয়ে চলেছে। সেখানে কি ঘটবে কেউ জানে না, এখন শুধু তারা প্রাণে বাঁচতে চায়। পাকিস্তানী সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

সাতক্ষীরা বর্ডারের দিকে ভিড় বেশি। ওদিকেই সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখার জন্য যাবে ওমর। দি শাইনিং স্টার ডেইলির জন্য প্রতিবেদন তৈরি করবে, এমন একটা আলোচনা আগেই হয়েছিল সম্পাদকের সঙ্গে। পরমুহূর্তে নিজের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল ওমর। তার চোখের যে নীল রং কে রোহানা চৌধুরী এত ভালোবাসে, আজ তা দাক্ষিণ্য না হয়ে বাঙ্গালীদের কাছে তাকে চিহ্নিত করছে দুশমন হিসাবে। ওরা যদি তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর সমাধান খুঁজে পেল ওমর। আগামীকাল সেলুনে গিয়ে সে চুল ডাইং করবে কালো রংয়ে। চোখ দুটোকে আড়াল করার জন্য একজোড়া কালো গগল্‌স্ কিনে আনবে। ব্যস।

ঘুমিয়ে পড়ল ওমর। বেলা ওঠার আগেই দরজায় করাঘাত। ওমরের ঘুম ভেঙ্গে গেল আচমকা। ধড়মড় করে উঠে বসল। দরজা খুলে শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বেলা হয়ে গেল।

মুহিতের চোখে ঘৃণার আভাস, কথা বলল না।

জুতা পরে নিল ওমর। চেয়ার থেকে কিট ব্যাগ তুলে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এল, বলল, রাতটা থাকতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ মুহিত।

কোনও উত্তর এল না।

বাসে সরাদিন জার্নি করে সন্ধ্যায় খুলনা টাউনে নামল ওমর। এই বন্দর শহরে সে অনেকবার এসেছে। কর্মচঞ্চল শহর, খালিশপুরের মিল এরিয়া, পেপার মিল, জুট মিল ইত্যাদির কর্ম ব্যস্ততা নগরীকে করে তুলত চঞ্চল মুখর। ওদিকে শিপ ইয়ার্ডে জাহাজ মেরামত, লঞ্চ, বার্জ, ট্রলার তৈরির কাজে দেশী বিদেশীদের দক্ষ হাতের নৈপুণ্য অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করত। বাগেরহাটের খানজাহান আলীর দরগা, ষাট গম্বুজ মসজিদ,

www.pathagar.com

মড়েলগঞ্জে সাহেবদের কুঠি বাড়ি, সর্বশেষ দক্ষিণে সুন্দর বন, যার নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার, সব মিলিয়ে খুলনা শহর এত সুন্দর, প্রাণবন্ত এবং সম্পদময় যে পূর্ব পাকিস্তানের এ এক গৌরব এবং স্বর্ণময় অহংকার। অথচ আজ সন্ধ্যায় শহরটাকে মনে হচ্ছে ম্রিয়মান এবং নিষ্প্রাণ।

কার অভিশাপে শহরটা যেন হঠাৎ পাথর বনে গেছে। শাহীন হোটেলে উঠল ওমর। খাতায় নাম লিখল, মিঃ ওমর। কেউ কোনও সন্দেহ করল না।

সন্ধ্যায় চা খেয়ে শহরে বের হলো ওমর বাট। সার্কিট হাউজ রোড, খান জাহান আলী রোড সব ঘুরে রূপসা নদীর ঘাটে এসে থামল। শহরের লোক গুদারা পার হচ্ছে নৌকোয়। সবাই ওপারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। যারা বর্ডার পার হবে, তারা বাসে চলে যাবে সাতক্ষীরায়। যশোরের নাবারন হয়ে বেনাপোল সীমান্তের ওদিকটায় কেউ যাবে না। ওখানে চেকপোস্ট আছে। কিন্তু এদিকে এত ভিড় কেন? একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল ওমর, আচ্ছা ভাই, ছেলে পুলে স্ত্রী সহ গোটা সংসার গুটিয়ে নিয়ে এত ছোটাছুটি করে কোথায় যাচ্ছেন?

–আপনি কোন হোম থেকে ফিরলেন ভায়া? দেখছেন না পাকিস্তানী সৈন্যদের কান্ড? শুধু ধরপাকড় নয়, মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করা দায়। তাই ওদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসতে যাচ্ছি। আমাদের পুরুষদের যাওয়ার উপায় নেই। চাকরি বাকরি করি। পেটের দায় বড় দায় রে ভাই। আমাদের শহরে থাকতেই হবে। ছেলেপুলে বৌ নিরাপদে থাকলে তবু কিছুটা রক্ষে।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে সত্য, কিন্তু মা-বোনদের বেইজ্জতির কোন কারণ ঘটেনি। তবু গুজব রটেছে। আর তা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে ভয় এবং আতংক।

অনেক রাত পর্যন্ত গুদারা ঘাটে বসে থেকে মানুষের এই পারাপারের দৃশ্য দেখল ওমর। এপার খুব কম লোক আসছে। ওপারে যাচ্ছে বেশি। ওদিকে বাগেরহাটে বড় বড় সব সমৃদ্ধ গ্রাম। ওদিকেই লোকজন ভীত-বিহবল হয়ে ছুটছে। কাঁথা, কাপড়, বস্তায় থালবাসন হাড়িকুড়ি এমন কি ছেঁড়া মাদুরটি পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

বাচ্চারা ভিড়ের চাপা গরমে সেদ্ধ হয়ে কান্নাকাটি করছে। ওদের হাতে মায়েরা লজেন্স, বিস্কুট গুঁজে দিয়েও কান্না থামাতে পারছেনা। নৌকার গায়ে নৌকার ধাক্কা লাগছে। ঘুরপাক খেয়ে দুলে উঠছে নৌকা। মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে। আগেভাগে গোদারা ঘাট পার হওয়ার প্রতিযোগিতা, পুরুষদের কথা কাটাকাটি, মেয়েদের বিলাপ, বাচ্চাদের ক্রন্দন সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার দৃশ্য।

মন খারাপ করে রাত বারোটায় হোটেলে ফিরে এল ওমর। বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, খাবার আছে?

–না। বোর্ডারের কি অভাব আছে যে এত রাতে আপনার খানা কেউ আগলে

www.pathagar.com

রাখবে?

–তা তো সত্যি।

এবার বেয়ারের সুর কিছুটা নরম, দেখছেন না সাহেব, মানুষের ঢল নামছে শহরে। সব ঢাকা থেকে ছুটে আসছে। আমাদের বোর্ডিংটাই শহরের সেরা বোর্ডিং, এখানে লোকজন আসে বেশি।

ওমরের এসব শুনতে ইচ্ছে করছিল না। তার পেটে ক্ষিধে থাকলেও চোখে ঘুম ঘুম ভাব। বলল, ঠিক আছে, চলি।

–শুনুন।

থমকে দাঁড়াল ওমর।

–বাইরে থেকে কিছু এনে দেবো? এই যেমন পাউরুটি, বিস্কুট, চা?

–না।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনল ওমর, এক বেয়ারা অন্য বেয়ারাকে বলছে, শালা কেপ্পন, দুটো টাকা বখশিস্ দিতে হবে ভয়ে বাইরে থেকে খাবার আনাল না। সকালে দেখি তোমাকে কে ব্রেকফাস্ট দেয়?

ভোরে উঠেই ওমর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে নিচে নামল। কাউন্টারে হোটেলের পাওনা এবং চাবি বুঝিয়ে দিয়ে পথে নামল। বাসস্ট্যান্ডে যাবে। ওখানে এক কাপ চা খেয়ে নেবে। বেয়ারাদের বখশিস দিল ওমর। গত রাতের অসন্তুষ্ট বেয়ারা কাদেরের চোখ ছলছল, সাহেব খালি পেটে পথে বেরুবেন? কিছু খেয়ে যান। আমি গরম গরম চা বানিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে খাস্তা বিস্কুট।

–ধন্যবাদ কাদের, আমি এত সকালে কিছু খাইনা।

মাথা নিচু করল কাদের। তার দিকে তাকিয়ে হাসল ওমর, বলল, অযথা মন খারাপ করো না।

বাসে দারুণ ভিড়। ভেতরে ভ্যাপসা গরম। যে যার মত তাল পাখা নেড়ে বাতাস নিচ্ছে। ওমর খবরের কাগজ কিনল। দি শাইনিং স্টার পাওয়া গেল না। মর্নিং নিউজ কিনল। বিশেষ কোন খবর নেই। শুধু সামরিক সরকারের জনসাধারণকে দেয়া হুঁশিয়ারি, গুজব ছড়ালে কঠিন শাস্তির পরোয়ানা জারি, অবস্থা সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্বে ইত্যাদি। বোঝা গেল, খবরের কাগজে সেনসরশীপ আরোপিত হয়েছে। খবরের কাগজের কণ্ঠরোধ করা হলেও পৃথিবীর বিবেকের কণ্ঠরোধ করা যায় না, ভাবল ওমর।

বাসের লোকজনের মুখেও একই আলোচনা, পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের অবাঞ্ছিত কর্মকান্ড, জনসাধারণের দুর্দশা, শহরে গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র ভীতির সঞ্চারণ, মানুষের বর্ডার পার হয়ে পলায়ন, ইত্যাদি। সব আলোচক যে শিক্ষিত এমন নয়, অথচ সমালোচনায় সবাই মুখর, দেশের রাজনীতি এবং ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত। একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, একটা অনিশ্চয়তার তোড়ের মুখে তারা এসে পড়েছে। ঘটনা

www.pathagar.com

এখন কোন দিকে গড়াবে কেউ জানেনা। ওমর সব শুনছে, কথা বলছে না। মাঝে মাঝে খবরের কাগজ নেড়ে গায়ে বাতাস নিচ্ছে।

দুপুর নাগাদ সাতক্ষীরায় পৌঁছে গেল বাস। ক্ষিধেয় নাড়ি জ্বলছে। পথে ডাবের পানি ছাড়া আর কিছু খায় নি। রিক্সাওয়ালা একটা হোটেলের সামনে এনে দাঁড় করাল রিক্সা, সাহেব নামুন, খুব ভালো হোটেলে নামাইয়া দিলাম আপনারে।

অবাক ওমর, একটা জরাজীর্ণ একতলা দালান। সঙ্গে টিনের ছাপরা, বোধ হয় পাকশালা।

দ্বিধান্বিত কণ্ঠস্বর ওমরের, আর কোন ভাল হোটেল নেই?

–কি যে কন সাব, বড় বড় সাহেব সুবারা তো এখানেই ওঠে। অন্যগুলান দেখলে তো আপনার পছন্দ হবি না। টিনের ঘর, বেড়া দিয়া পাটিশন করা, বাইরে পায়খানা পচ্ছাব সারতি হয়।

–থাক থাক বলতে হবে না, বুঝেছি।

ওমর ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে ঢুকল, নামটা চমৎকার, 'আগমন।'

সিঙ্গল সীটেড রুম নেই। একটা রুম তিন জনের জন্য। সব অসুবিধে মেনে নেয়া যায়, শুধু এইটেই সম্ভব নয়। ম্যানেজার কিছুতেই রাজি নয়। ওমর ডাবল, ট্রিপল ভাড়া দিতে চাইল। ম্যানেজার গম্ভীর, ঠিক আছে, আমার বিশ্রামের জন্য ছোট একটা ঘর আছে, ওটাই আপনাকে দিচ্ছি। আমাকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। তাতে কি কম অসুবিধে? দৈনিক আটআনা রিক্সাভাড়া লাগবে অযথা। তাছাড়া সর্বক্ষণ হোটেলের উপর নজর রাখতে না পারলে লাভের বখরা বাটপারে খাবে। ওমর উত্তর দিল না।

উঠোনের চত্বরের এক পাশে পাকা হাউজ। পানি ভর্তি। পানি মগ দিয়ে তুলে অনেকেই এক সঙ্গে গোসল করছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ওমর। ভিড় বাড়ছেই। রোদের তেজ বাড়ছে। বাধ্য হয়ে চৌবাচ্চার কাছে এল ওমর। তলে শ্যাওলা জমে আছে। পানি সবুজ দেখাচ্ছে। মগ হাতে তুলে নিল ওমর। বরফ ঠান্ডা পানি। আঃ কি আরাম। মুহূর্তে সে ভুলে গেল মফস্বল শহরের দৈন্য, অপ্রতুলতা, অব্যবস্থার করুণ চেহারা। খাবারের টেবিলে এসে হাত গুটিয়ে বসে রইল ওমর। আজ মীটলেস ডে। টেবিলে ডাল, উচ্ছা ভাজি আর মাছ। সে এই তিনটের একটাও খায় না। হঠাৎ রোহানার কথা মনে হলো ওমরের। একদিন সে কড়া করে মাছ ভেজে এনে তার পাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, দ্যাখো তো খেতে পার কিনা। বাঙ্গালীর সব অভ্যাসই তুমি আয়ত্ব করেছ, এটা বাকি থাকবে কেন? কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙ্গালী।

মাছ খেতে গিয়ে সে বমি করে ফেলেছিল। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে রোহানার উক্তি, আমার কপাল থেকে চিরদিনের জন্য মাছের পাট উঠল।

–তুমি খাবে।

www.pathagar.com

–আমি খাই, আর তুমি আমার মুখের কাছে মুখ এনে মাছের গন্ধে ফিরিয়ে নাও।

হো হো করে হেসে উঠল ওমর। পর মুহূর্তে গম্ভীর, অধিকারটুকু আজ পর্যন্ত পেলাম না।

–অধিকার পেয়েছ, পজেশন পাওনি।

আবার হাসি ওমরের। রোহানার বুদ্ধি দীপ্ত কথার সঙ্গে সে কোনদিন পেরে ওঠেনি। জয়ের চেয়ে পরাজয়ের আনন্দই হয় তখন বেশি।

নিজের মার কথাও মনে পড়ে গেল ওমরের। মছলি তাদের বাড়ির কেউই খায় না। এ নিয়ে সমস্যা ছিল না। কিন্তু খাওয়া নিয়ে ওমরের বাহানার অন্ত ছিল না। বাড়ির বড় ছেলে। বড় আদরের। মা নিজের হাতে নানা রকম খানা পাকাতেন, বারবার অনুরোধ করতেন, খা লও বেটা, খা লও। মায়নে আচ্ছা করকে পাকায়া।

ওমরের জেদ বেড়ে যেত, কিছুই পাতে নিতে চাইত না। মার চোখে পানি।

আব্বাজী বলতেন, এ্যায়সা প্রেশার ক্রিয়েট মাত্ করনা বিবিজী, উসকো আপ্‌কা মরজি সে খানে দেও।

মা চুপ। অন্তরে ব্যথা চেপে রেখে মুখে হাসি ফোটাতেন।

–ঠিক হ্যায় বেটা, তোমহারা মরজি মাফিক খা লও। মগর পেট তো ভরনা চাহিয়ে।

–কি সাহেব খাচ্ছেন না যে। পাক খারাপ হয়েছে?

চমক ভাঙ্গে ওমরের। বর্তমানে ফিরে আসে, বলে, কই, না তো? ভালই হয়েছে।

–আপনি তো শুরুই করেন নি।

ওমর হাসে, এই তো করছি। ডিম ওমলেট করে দিতে পারবে?

–না সাহেব, মীটলেস ডে তে ডিমের দাম চড়া। তাই ম্যানেজার কেনে না।

ইতিমধ্যে অন্য টেবিলের লোক তার দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছে। রুই মাছ খায় না এমন বাঙ্গালী এদেশে আছে নাকি?

ওমর তাড়াতাড়ি হাত ডোবাল ডাল আর ভাতের মধ্যে।

ঘরে বিশ্রাম নিতে এসেও ফ্যাসাদ। বারান্দায় বাড়তি মূলি বাঁশের বেড়া দিয়ে বানানো বিশ্রাম ঘর। সঙ্কীর্ণ এবং অপরিসর। এক ফালি জায়গার মধ্যে নড়বড়ে তক্তপোষ। তোষক, চাদর, বালিশ সব ময়লা। লম্বা জার্নিতে ক্লান্ত ওমর। পেট প্রায় খালি। চোখে ঘুম নামছে। তক্তপোষ লম্বায় এত খাটো যে পায়ের স্থান সঙ্কুলান হয় না। বাইরে পা ঝুলে রইল। একটু পরেই গভীর ঘুমে অচেতন।

বেলা গড়িয়ে গেছে। ধড়মর করে উঠে বসল ওমর। কোন রকমে কাপড় বদলে রিক্সা স্ট্যান্ডে এসে হাজির।

–ইন্ডিয়ান বর্ডার কত দূর? রিক্সাওয়ালাকে প্রশ্ন করল ওমর।

–বর্ডার পার হবিন?

www.pathagar.com

–না।

–তাই হলে?

ওমর চুপ।

নিজ থেকেই বলে রিক্সাওয়ালা, গতকাল এখানে মাতবর লোকজনের মীটিং হয়িছে, ঢাকা এবং অন্যান্য শহর থাইকা আসা লোকজনকে তারা বর্ডার পার হইতে সাহায্য করবি। যোয়ানদের নিয়া ভলান্টিয়ার টীম গঠন করিছে। ওমর চুপ করে শুনল, কথা বলল না।

বর্ডার দেখে হতবাক ওমর, সঙ্কীর্ণ খাল, শুকনো খটখটে। বারোমাস এখান দিয়ে নাকি লোক পারাপার হয়। স্মাগলিং ব্যবসা চলে অবাধে। এত বছরের মধ্যে একটা কাঁটাতারের বেড়াও ওঠেনি। বড় ধরনের চেক পোস্টও নেই। এপার থেকে চলে যায় চাল, গুড়ো দুধ, মেশিনারি পার্টস, আরো জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ। আসে তামাক পাতা, গরম মশলা, আরো হরেক রকম ক্ষতিকর জিনিস। আজ এই উন্মুক্ত বর্ডার দিয়ে স্রোতের মত বয়ে চলেছে ভীতি-বিহ্বল মানুষ। ব্যাংক থেকে তারা শেষ কপর্দক পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়েছে। বৌ-ঝিদের সঙ্গে সোনার গহনা, কাঁসার থালা, কলস, হাড়ি পাতিল পর্যন্ত। এগুলো তারা বিদেশেই খোয়াবে। আপন দেশকে নিঃস্ব করে ভরে তুলবে অন্য দেশের কোষাগার। সে জন্য দায়ী কে?

এই ভুলের ইতিহাস বয়ে এসেছে শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে স্রোতের মত। মোগল সম্রাটদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে এদেশে বাণিজ্য করতে দেয়ার অনুমতি, কুঠি নির্মাণ দানের অনুগ্রহ, সিরাজোদ্দৌলার রাজ দরবারে উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়বল্লভদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, সেনাপতি মীরজাফরকে বিশ্বাস করা, আরো কত কি? একটার পর একটা ভুল জমা হয়েছে হিসাবের খাতায়। সেই হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখেনি। যখন শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে অংক, তখন নৃপতিদের খেয়াল হয়েছে। উই পোকা আর ইদুঁর ততদিনে কুরে কুরে খেয়েছে বিশাল সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড। তারপর একদিন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাজত্বের ভিত্তি স্তম্ভ।

নদীর বেগবান স্রোতের মত লোকজন ধেয়ে এসেছে বর্ডারে। খাল পার হবে, ওপারে চলে যাবে, কিন্তু ওপারে ভাগ্যে কি আছে তা তারা জানে না।

ওমরের চোখে ভেসে উঠল অনেকদিন আগের ঘটে যাওয়া এক দৃশ্য। সুন্দরবনে হরিণ শিকার নিষিদ্ধ হলেও এক বড় ধরনের ভেল্‌ভেট হরিণকে গুলী করল এক শিকারী। গুলী মাথায় পেটে না লেগে লাগল পায়ে। খোড়া এবং রক্তাক্ত পা নিয়ে দৌড়তে লাগল হরিণ, পেছনে শিকারী। নদীর পারে এসে আহত হরিণ ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। শিকারী হরিণের ভাসমান মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করে আছে। হরিণ তা বুঝতে পেরে স্রোতের বিরুদ্ধে এঁকে বেঁকে সাঁতার কাটছে। হঠাৎ মুহূর্তের জন্য দেখা গেল কুমীরের পিঠ। তারপর হরিণ আর কুমীরের যুদ্ধরত দৃশ্য। কতটুকু সময়। হরিণ

www.pathagar.com

তলিয়ে গেল। শুধু রক্তাক্ত বুদ্বুদ ছড়িয়ে পড়ল পানির চিকচিকে ঢেউয়ের উপর।

পরিণতি একটাই, ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। .... ওমরের চোখের সামনে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। ঢল নেমেছে মানুষের, তোড়ে ভেসে যাচ্ছে। শৃংখলা নেই, সংঘবদ্ধতা নেই। নিয়ম নেই, সময় নেই। অসহায় মানুষ স্রোতের ধাক্কায় শুধু এগিয়ে চলেছে সামনে।

হঠাৎ ভিড়ে কান্নার রোল উঠল। কান্না ভাসতে ভাসতে কাছে এল, দূরে চলে গেল। আবার কান্না। একজন শরনার্থীকে জিজ্ঞেস্ করল, কি হয়েছে?

–একজন মেয়ে মানুষের বাচ্চা ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

–বাচ্চার বাবা মা কোথায়?

–আরে সাহেব, তারা কি বসে আছে? থামলে তো ভিড়ের চাপে পিষে যাবে।

–ফেলেই চলে গেল?

–হ্যাঁ, যে কোন সময় মিলিটারি চলে আসতে পারে। তখন তো পরিবারের সবার যাওয়া বন্ধ।

–বাচ্চার নাম কি, দেখতে কেমন?

–খুঁজবেন নাকি?

–চেষ্টা করি।

–সখের দালাল?

ওমর চুপ।

হেঁটেই ওমর ফিরে এল হোটেলে। এখানে থাকা সম্ভব নয়। জীবন ধারণের সহজ উপকরণগুলোরও কত অভাব এই সব মফঃস্বল শহরে। তবু মানুষের জীবন ছিল কত নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিত, দুর্ভাবনাহীন। কত অল্পতে সুখী ছিল এরা। কিন্তু আজ এরা ভীত, শঙ্কিত, মনোবল হারা, আশ্রয় চ্যুত।

অন্য একটা হোটেলে গিয়ে উঠল ওমর। ভাগ্য ভাল, আলাদা একটা কোঠা মিলল। গোস্ত ডিম বাজার থেকে নিজেই কিনে আনে। বাবুর্চিকে বাড়তি পয়সা দিয়ে খানা পাকিয়ে নেয়।

বাবুর্চি রশিদ সবিনয়ে বলে, সাহেব, ম্যানেজার যেন কিছু না জানে। এটা নিয়ম নেই। এখানে যা পাকানো হবে তাই খেতে হবে বোর্ডারদের। কেউ জানলে ম্যানেজারের কানে দেবে। আমার চাকরি চলে যাবে।

–তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কেউ জানবে না।

হোটেলের খাবারটাও নিতে হয় ওমরকে। ডাবল খরচ। তবু ভাল, সন্দেহ এড়ানো যায়। রশিদ বার্বুচি মানুষ ভাল। তাকে দু'হাতে আগলে আছে।

শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এটা তো মোটে একটা বর্ডার। এমন কত শত বর্ডার আছে পূর্ব পাকিস্তান ঘিরে। সেগুলোর অবস্থা তা হলে কি? ভাবতেই শিউরে উঠল

www.pathagar.com

ওমর। শিক্ষিত যুবক এবং বুদ্ধিজীবিরা আগেই পালিয়ে গেছে। এবার বুড়োবুড়ি, কিশোর এবং শিশুদের পালাবার পালা। যুবক যুবতীরাও আছে। এদের মধ্যে নানা গুজবের সৃষ্টি। একজন শরণার্থীকে চিৎকার করে বলছে, শুনছেন, এক যুবতী মেয়েকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। মেয়েটার নাম জয়নব। বড় সুন্দরী।

ওমরের মন খারাপ। কথাটার সত্যতা যাচাইয়ের উপায় নেই। তবে পাক আর্মিরা এ বর্ডারে এখনো এসে পৌঁছেনি। অবাধ রয়েছে বর্হিগমন।

সন্ধ্যায় ওমর বাজারে এল এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে। পাশের শাড়ির দোকানে এক তরুণ এবং তরুণী। ছেলেটি বলছে, জয়নব শাড়ি তুমিই পছন্দ কর। মেয়েটির মুখে মিষ্টি লাজুক হাসি।

ওমর এগিয়ে এল, আপনারা কি গতকাল বিকেলে বর্ডার পার হচ্ছিলেন?

রেগে উঠল তরুণ, ভাল ল্যাঠা, গায়ে পড়ে আলাপ করছে। অত খবরে আপনার দরকার কি?

–জয়নবের বাবা মা জয়নবকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছেন।

–তাতে আপনার কি?

–ওকে খুঁজে দেয়ার ভার আমার উপর।

–মাস্তানি রাখুন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। নইলে....

–নইলে কি?

–কপালে দুঃখ আছে। ছেলেটি হাতের মাসল ফুলাল।

–আমি সাংবাদিক। সত্য খবরটা মানুষকে জানানো দরকার। গুজবে মনের ভয় বাড়ে। আমি থানায় যাচ্ছি।

ছেলেটি নরম, ভাই ঝামেলা বাড়াবেন না। আজ আমাদের বিয়ে।

–অভিনন্দন। অন্তত নিজের দেশে থেকে গেলেন। দুঃখ হোক, সুখ হোক, বিপদ আসুক অবস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করবেন।

ছেলেটি আরো বিনীত, আসুন না আমাদের বিয়েতে।

–সময় কই, দোয়া রইল।

অবস্থা এখন পাল্টিয়েছে। পাক আর্মিরা কাছাকাছি এসে গেছে। গুজবও বাড়ছে। শরনার্থীদের বর্ডার পার হওয়ার সময়সূচী শুধু পরিবর্তিত হয়েছে। বেড়েই চলেছে সংখ্যা।

একটা মরা বাচ্চা পাওয়া গেল পাশের ধান ক্ষেতে।

মরা বাচ্চা ঘিরে অনেক লোকের ভিড়। ওমর ঘটনা শুনল। মিলিটারিদের ভয়ে বাবা মা বাচ্চাটাকে নিয়ে ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পড়েছিল। বাচ্চাটা তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। ওকে থামাতে গিয়ে মা চেপে ধরেছিল শিশুর মুখ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে বাচ্চাটা। মরা বাচ্চাটাকে ধানক্ষেতে ফেলে রেখেই বাবা-মা পার হয়েছে

www.pathagar.com

বর্ডার। দোর করার উপায় নেই। মিলিটারিদের ধাওয়া আরম্ভ হয়েছে।

সবাই লাশ দেখছিল, কারো মুখে কথা নেই। ওমর বলল, একটা কোদাল যোগাড় করে আনতে পারেন কেউ?

-কি করবেন?

-দাফন করব।

-লাভ?

-লাশ পঁচলে বাইরে দুর্গন্ধ ছড়াবে। বাতাস দূষিত হবে। পঁচা ফুলা লাশ দেখলে মানুষ ভয় পাবে, অসুস্থও হয়ে পড়বে।

-তাইতো, ওহে একটা কোদাল নিয়ে আসো। জানাজা পড়া হলো। লাশ দাফন হলো। বিষণ্ন মন সবার। অনেকের চোখে পানি।

পিছিয়ে পড়া এক বৃদ্ধকে বেধড়ক পেটাল পাক আর্মি। বৃদ্ধের ছেলেকে খুঁজছিল ওরা। সে আপত্তিকর পোস্টার লাগিয়েছে এখানে সেখানে। বোমাও ফাটিয়েছে অস্থায়ী সেনানিবাসের কাছে।

-তোমহারা নাম কিয়া হ্যায়?

বৃদ্ধ ভাষা না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে, রাইফেলের নল ততক্ষণে বৃদ্ধের বুকে লাগিয়েছে ওরা। অবস্থা বেগতিক দেখে ওমর এগিয়ে এল, ওরা আপনার নাম জিজ্ঞেস করছে।

-জিয়াউদ্দিন মোল্লা।

-তোমহারা এক লাড়কা হ্যায়?

ওমর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

-হ্যাঁ সাহেব।

-ও কিধার হ্যায়।

বিপদের গুরুত্ব ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে বৃদ্ধ।

-জানি না সাহেব।

-জরুর মালুম হ্যায়, বাতাও।

-জানি না সাহেব।

রাইফেলের বাট ততক্ষণে বৃদ্ধের মাথায় পড়েছে। গোঁ গোঁ করছে বৃদ্ধ, জানি না সাহেব, জানি না, বৃদ্ধের মুখে একই কথা।

একজন পাক আর্মি বলল, ছোড় দেও। ও ভাগ গিয়া।

-মগর হেডকোয়ার্টাস সে তলব আ গিয়া, ওসকো ঢুন্ডো। পাকাড়কে লে আও।

ওদের মধ্যে অন্য একজন বলে উঠল, চিড়িয়া ফুরুৎ। বহুত দেরসে হুকুম জারি হোয়া।

-দেরসে হুকুম জারি হোয়া?

www.pathagar.com

–বিলকুল, সব জোয়ান আদমী ভাগ গিয়া।

–বুড়োগুলোকে ধর। ওদের আওরতদের পাকড়াও। কান টানলে শির তখন আসবেই।

–কভি নেই আয়েগা। তুম বাঙ্গালী আদমীকো নেহি জান্‌তা।

–শালা তব্ কোর্ট মার্শাল মে চলা যাও।

–জবান সামাল করকে বাত করনা।

দু'জনের মধ্যে তখন হাতাহাতি হবার উপক্রম। ওমর চলে যাচ্ছিল। ওদের মধ্যে একজন তা খেয়াল করল, এ্যাই তুম কাঁহা যা রাহা? ইধর আও।

ওমর ফিরে এল।

–তুম কৌন হো?

–জার্নালিস্ট।

–শালা, তুম খবর লে কর কাগজ মে পাবলিশ করেগা?

–আদবসে বাত করনা ভাই।

–তুম আদবসে কাম করনা শালা।

–ইয়ে দফতরকা কাম। মেরা পার্সোনাল কাম নেহি হ্যায়।

–সমঝমে আতা হ্যায়। তুম ঝুটা খবর পেশ করকে প্রভোকেশন ক্রিয়েট করেগা।

একজন ক্যাপটেন মত অফিসার এগিয়ে এসে ওমরের মুখে ঘুষি মারল। ছিট্‌কে পড়ে গেল সানগ্লাস। অফিসার অবাক, এই তুম কৌন হ্যায়?

–বাতায়া তো, জার্নালিস্ট।

–মোকাম কাঁহা?

ওমর চুপ।

–বাতাও ভাই।

ক্যাপটেনের সুর নরম। ওমরের মুখে কথা নেই।

–ওয়েস্ট পাকিস্তানী?

–হ্যাঁ।

–তুম বাঙ্গালী লোগকো এজেন্ট হো কর কাম কর রাহা হো?

কভি নেহি। ইয়ে মেরা আপনা ডিউটি হ্যায়।

ওমরের মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ দমিয়ে দিল ক্যাপটেনকে। সুর নামিয়ে ফেলল। ইংরেজিতে বলল, দ্যাখো ভাই, নিজের দেশের বেইজ্জতি হবে, এমন কাজ করো না।

ওমরের সাফ জবাব, ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের।

–বাঙ্গালী আদমী বহুত বজ্জাত। এই দেশটাকে ইন্ডিয়া বানাতে চায়।

ওমরের মুখে কথা নেই। তার মতে বাঙ্গালীরা দেশটাকে ইন্ডিয়া বানাতে চায়, কথাটা ঠিক নয়। ইতিহাস কেউ পাল্টায় না, পাল্টে যায়। তার বুনিয়াদ কেউ না কেউ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে।

রোহানা বলে, ওমর, লোকে বলে, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। আসলে কেউ শিক্ষা নেয় না। যদি নিত, ইতিহাস একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। এর গতিটা আসলে নদীর ধারার মত। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যায়, গড়তে গড়তে ফিরে আসে। আসলে ইতিহাস আমাদের শিকার নয়, আমরাই ইতিহাসের শিকার।

কথা বলতে বলতে ভারি হয়ে ওঠে রোহানার কণ্ঠস্বর। যে ভুলটা পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা করে ফেলল, তাতে একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। এর ভিত্তিপ্রস্তর যেই স্থাপন করুক না কেন?

আরো কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক চলল ওমরের ক্যাপটেনের সঙ্গে। তাকে সার্চ করার জন্য একজন সৈন্যকে ইশারা করল ক্যাপটেন। কিছু পেল না। ছেড়ে দিল ওমরকে।

আহত বৃদ্ধকে দেখার জন্য ওমর সন্ধ্যায় তার বাসায় গেল। ঠিকানা এক ফাঁকে জেনে নিয়েছিল। দুঃখের হাসি হাসছিল তখন বৃদ্ধ, ঠিকানা কি আর আছে রে বাবা। ঘর গৃহস্থালীর সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়েই তো বর্ডার পার হচ্ছিলাম। ভিটেটুকু শুধু আছে এক ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। সেটুকুও ফেরৎ পাব কিনা সন্দেহ।

বৃদ্ধের অবস্থা খারাপ, তবু মুখে প্রসন্ন হাসি। আমার ছেলে এবং পরিবারের লোক জন যে নিরাপদে বর্ডার পার হয়েছে, এতেই আমি খুশি। ওদের জান তো বাঁচুক। আমি বুড়ো মানুষ, আমি আর কয়দিন? আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই বুঝতে পারলাম ঠিকানা বলা চলবে না ছেলের। বেঁচে থাকুন বাবা, বেঁচে থাকুন।

একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিয়ে ওমর হোটেলে ফিরে এল। রাত তখন দশটা। দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যানেজার। মুখ গম্ভীর, এই যে সাহেব এসেছেন? আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক। আমি দেখছি একটা বিষাক্ত সাপকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছি।

–কি যা তা বলছেন?

–যা তা বলছি? আপনার জন্য আমার ব্যবসা লাটে ওঠার উপক্রম।

–খুলে বলবেন, কি হয়েছে?

–মিলিটারি এসেছিল, মিলিটারি। সমস্ত হোটেল তছনছ করে ফেলেছে। পুড়িয়ে দেবে বলে শাসিয়ে গেছে।

–কেন বলুন তো?

–সার্চ হয়েছে। আপনাকে খুঁজছিল।

–কারণ?

–কারণ আপনিই ভাল জানেন। আপনি নাকি ইন্ডিয়ান গুপ্তচর।

ওমর চুপ করে ভাবতে লাগল।

–আপনার ডায়েরি, ক্যামেরা সব নিয়ে গেছে।

–এতে কি প্রমাণ হয়, আমি ইন্ডিয়ান গুপ্তচর?

www.pathagar.com

–আপনিই ভাল বোঝেন। সাধারণ মানুষ এসব রাখে নাকি?

–আমি একজন সাংবাদিক। এসব রাখার প্রয়োজন হয়।

–শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবে না। আপনি ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যান। নইলে আমি থানায় যাব।

–আপনাকে কষ্ট করে থানায় যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

–তাই যান। আমি নেহাৎ ভাল মানুষ বলে মিলিটারিদের হাতে ধরিয়ে দিলাম না। আরেকটু হলেই হোটেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল আর কি!

ওমর কথা বলল না। নিজের ঘরের দিকে এগুলো।

–শুনছেন, হোটেলের পাওনা মিটিয়ে যাবেন। ম্যানেজারের ক্রুদ্ধ স্বর।

ওমর ব্যাগ হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এল। দরজায় কে একজন দাঁড়িয়ে। বুঝল, সে যাতে হোটেলের পাওনা ফাঁকি না দেয় সেজন্য পাহারাদারি। ভাগ্যিস সে হোটেলে ছিল না, নইলে এ্যারেস্ট হয়ে যেত। কখন যে ওরা তাকে ফলো করেছে, আস্তানা জেনে নিয়েছে। আশ্চর্য, সে টের পায় নি।

হোটেলের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সে যখন গেটের বাইরে এল, দেখল রশিদ মিয়া দাঁড়িয়ে। চোখে পানি। বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র এর মানুষ, বিস্মিত ওমর ভাবল। এ দেশের মানুষ কেউ হিংস্র, কেউ দয়ামায়ায় বিগলিত। কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই।

দশ টাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে রশিদের হাতে দিতে গেল ওমর। রশিদ কিছুতেই নিল না। বারবার কোমরে গোঁজা ময়লা গামছা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। একবার পিছন ফিরে তাকাল। রশিদ বাবুর্চি তখনো দাঁড়িয়ে। ভিজে হাত কপালে তুলে সালাম জানাচ্ছে।

ঢাকার বাসে উঠে পড়েছে ওমর। কিন্তু কোথায় গিয়ে উঠবে জানা নেই। হলে স্থান নেই। হোটেলে উঠবে, এত পয়সা পকেটে নেই। সে যখন ঢাকা পৌঁছবে, রোহানা তখন স্কুলে। সেখানে দিনটুকু কাটাতে পারলেও রাত কাটানো যাবে না। রোহানা অশোভন আবদার পছন্দ করে না। সেইবা চাইবে কেন। ভালবাসা শুধু আবেগের ব্যাপার নয়, আত্মসম্মানের ব্যাপারও। দিন হোক, রাত হোক, সে পত্রিকা অফিসে উঠবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ওমর।

দি শাইনিং স্টার ডেইলি কাগজের অফিস শূন্যতায় খা খা করছে। রিয়াজ এবং আরো অনেকে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। কেউ ঢাকায় নেই। বর্ডার পার হয়ে ওপারে চলে গেছে।

অফিসে ভাঙ্গা একটা বেতের ইজি চেয়ার আছে। মাঝখানে বেত নেই। শূন্য গর্ত। আপাততঃ তাতেই গা এলিয়ে দিল ওমর বাট। সম্পাদক তাকিয়ে দেখল, কথা বলল না। পিয়নকে দিয়ে চা বিস্কিট এনে খেয়ে নিল ওমর। পেটে ভাত রুটির খিধে।

www.pathagar.com

অথচ উপায় নেই। রোহানা চৌধুরী কত কাছে। কিন্তু যাবে না সে। রূপকথার সেই ডিমওয়ালার কথা ভাবতে ভাল লাগল, একদিন অনেক ডিম হবে, বিক্রি করে বড়লোক হবে, রাজপ্রাসাদ বানাবে, রাজকন্যা বিয়ে করবে। রাজকন্যা দেমাগ দেখালে এইভাবে তাকে লাথি মারবে। কোথায় রাজকন্যা, কোথায় প্রাসাদ। তার লাথিতে ঝুড়ির ডিম ভেঙ্গে একাকার।

রোহানা চৌধুরী যেন তার পাশে বসে এটা ওটা সুস্বাদু খাবার তার পাতে তুলে দিচ্ছে। মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়াচ্ছে। তৃপ্তির ঢেকুর উঠছে।

পেটে ক্ষিধে মোচড় দিতেই হেসে ফেলল ওমর বাট, কোথায় রোহানা চৌধুরী, কোথায় খাবার?

সম্পাদক তার টেবিল থেকে আড় চোখে ওমরকে দেখল, নীরব। কথা নেই মুখে।

ওমর বাট সম্পাদকের টেবিলে এসে বসল। জিজ্ঞেস করল, এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন? কাগজ বেরুচ্ছে না?

নিস্পৃহ উত্তর সম্পাদকের, বেরুচ্ছে। ছয় পৃষ্ঠার জায়গায় দু পৃষ্ঠা।

–অসুবিধে কি?

–খবর নেই।

–বলেন কি? এত কিছু ঘটছে।

–মনে হয় আপনার মগজ কাজ করছে না, শ্লেষ সম্পাদকের গলায়, সেনসরশীপ আরোপ হয়েছে কড়াকড়ি ভাবে। যা ঘটছে লিখতে দেবে না। যা ঘটছে না তাই লিখতে হবে। অর্থাৎ অবস্থা সরকারের আয়ত্ত্বাধীন। দেশে আইনের শাসন বলবৎ। শান্তি বিরাজিত, ইত্যাদি।

দু' পক্ষই চুপচাপ। সম্পাদক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল তা করতে পেরেছেন?

ওমর মাথা নাড়ল।

–লেখাগুলো দিন।

–নেই।

–নেই মানে? বিস্মিত ভদ্রলোক।

–মিলিটারিরা নিয়ে গেছে।

–আশ্চর্য, একটু সাবধানে থাকতে পারলেন না?

–ছিলাম। হোটেল রেইড্ করে নিয়ে গেছে।

–ছবি টবি উঠিয়েছিলেন?

–হ্যাঁ। ক্যামেরাও নিয়ে গেছে। রীল ভেতরেই ছিল।

–সর্বনাশ, আপনি দেখি উপকারের চেয়ে কাগজের অপকার করলেন বেশি। এখন তো আমাদের উপর সরাসরি গজব নেমে আসবে।

www.pathagar.com

–আসবে না। ডায়েরিতে আমার নাম ঠিকানা, কাগজের নাম কিছুই লেখা ছিল না।

ব্যঙ্গ ঝলসে উঠল সম্পাদকের কণ্ঠে, তবু ভাল, এই সুবুদ্ধিটুকু ছিল মাথায়।

ওমর নিরুত্তর, সুবুদ্ধিটুকু তার মাথায় আসেনি। রোহানা চৌধুরী মনে করিয়ে দিয়েছিল। এমন কি হোটেলের খাতায় আসল নাম দিতে নিষেধ করেছিল। তাতেই বিপদ কাটাতে পেরেছে ওমর। মেয়েটাকে সে শুধু ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। ওর প্রতি তার হৃদয়ে সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি।

অনেকক্ষণ দু'তরফেই চুপচাপ। ওমর নীরবতা ভাঙ্গল, ডায়েরি খোয়া গিয়ে এমন কিছু ক্ষতি হয়নি। আমার সবকিছু মনে আছে। ভালভাবে রির্পোট তৈরি করতে পারব।

সম্পাদক হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, রিপোর্ট তৈরি করলেই হলো? প্রমাণ লাগবে না?

–খবরের কাগজের সব তথ্যের কি প্রমাণ লাগে?

ভদ্রলোক আরো ক্ষিপ্ত, আপনাদের, আই মীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাথা মোটা, তা আপনাদের কথা আর কান্ডকীর্তি দেখলেই বোঝা যায়।

ওমর বাট কথার কোন উত্তর দিল না। সম্পাদকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক লজ্জিত। গলার স্বর নরম, বলল, চারদিকের হাল হকিকত দেখছেন তো, মানহানির মামলা, কাগজ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা, কত কি! এখন তো জরুরী অবস্থা। কখন কি হয় বলা যায় না।

ওমর এবারও কোন উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সম্পাদক বললেন, আপনার মিশন ফেল। আমরা আপনাকে টি,এ, ডি,এ, দিতে পারব না।

–আপনি আগাম কিছু দেননি। এখনো কিছু চাইনি আমি, না দিলেন।

–দেখুন আগে, কাগজ চালাতে পারি কিনা। চাকরি কারোর থাকে কিনা।

ওমর চুপ। আজ রাতটা এখানে কাটাতে হবে। অতএব মৌন থাকা ভাল।

সারারাত ভাঙ্গা ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় কাটাল ওমর বাট। মশা, ছারপোকার কামড়, তেলাপোকার উপদ্রব। মাঝে মাঝে ইদুঁর সরসর করে ছেঁড়াফাড়া কাগজের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চোখে রাজ্যের ঘুম, অথচ ঘুমোতে পারছে না। অতীত কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে মাথায়। মায়ের কথা মনে হলো ওমর বাটের। বিছানা আরামদায়ক করে দিয়েও আম্মাজীর দুশ্চিন্তার সীমা নেই। মশারী বারবার তুলে দেখে মশা ঢুকেছে কিনা।

ওমর হাসত, আম্মাজী, মশা দেখতে গিয়ে আপনি তো মশা ঢুকতে সাহায্য করছেন।

–ক্যায়সে বেটা?

–মশারী তুলে মশার প্রবেশ পথ আপনি খুলে দিচ্ছেন আম্মাজী।

www.pathagar.com

অবস্থার বাস্তবতা বুঝে হেসে ফেললেন তিনি। অতঃপর চতুরতার সঙ্গে বললেন, তোমার মাথার বালিশ ঠিক আছে কিনা, ব্ল্যাংকেট সরে গেল কিনা দেখতে হবে না? তোমার যে ঠান্ডা লাগবে বেটা। বোখার হবে।

দু'জন দু'জনের মনের কথা বুঝতে পারে। কিন্তু মুখে সে কথা কেউ উচ্চারণ করে না। অন্তরে অন্তরে শুধু স্পর্শ করে যায় রক্তের নিবিড় উষ্ণতা। আজ এই অবস্থায় নিজের সন্তানকে শুয়ে থাকতে দেখলে আম্মাজী কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন। ভাগ্যিস তিনি এখানে নেই। রোহানা চৌধুরীর কথা এবার মনে এল ওমরের। রোহানা তার এই বিপদ দেখলে বলবে, ওমর থেকে যাও আমার এখানে।

–তোমার প্রাইভেসি নষ্ট হবে না?

–আপনজনের চেয়ে প্রাইভেসি কি বেশি?

–রোহানা, তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করা আমার পবিত্র দায়িত্ব।

রোহানা চৌধুরী কথা বলবে না, শুধু তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠবে।

হঠাৎ মনে হলো ওমরের, রোহানার সঙ্গে অন্তত সে পরামর্শ করতে পারে এ ব্যাপারে। সে ছাড়া আপনজন এদেশে তার আর কেউ নেই। কথাটা মনে হতেই স্বস্তি ফিরে এল ওমরের মনে। শেষ রাতের দিকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে জমাদার ঘর ঝাড়ু দিতে এসে অবাক, সাহেব, আপনি বাড়ি যাননি রাতে?

–না।

–শরীর খারাপ?

–না।

জমাদার কথা বাড়াল না। সাহেব সুবোর মরজি। তারই বা কি দরকার আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়ার।

–রতন, এক কাপ চা এনে দিতে পার দোকান থেকে?

–পারব সাহেব।

দাঁত ব্রাশ না করেই খালি পেটে চা খেয়ে নিল ওমর, শরীরের ম্যাজমেজে ভাবটা অন্তত দূর হোক। বেড টী খাওয়া রোহানা পছন্দ করে না। বলে, দুর্গন্ধময় মুখে কিছু খাওয়ার কথা ভাবতে গেলেই ঘেন্না লাগে।

–সিগারেট যে খাই, এর গন্ধে তোমার বমি আসে?

–এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

–ইচ্ছাকৃত অভ্যাস?

–হ্যাঁ।

–কাছে এসো। আরো নতুন কিছু অভ্যাস করা যাক।

–হেসে ফেলেছিল রোহানা, দিন দিন তুমি যা দুষ্ট হচ্ছ। বস, চা নিয়ে আসি, বলে অনুরোধ এড়িয়ে গেল রোহানা চৌধুরী।

www.pathagar.com

মেয়েটার ভেতরে দু'কূল প্লাবিত তৃষ্ণার্ত আবেগ আছে। কষ্টও পায় সে জন্য। তবু ধর্ম বিরোধী কিছু করতে চায় না।

ওমর বাটকে দেখে চমকে উঠল রোহানা। এমন বিধ্বস্ত চেহারা সে আর কখনো দেখেনি। কাগজের অফিসে ওর নাইট ডিউটি পড়ে, রাত জাগতে হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা লিখতে হয়, তবু এমন বিপর্যস্ত করুণ চেহারা রোহানা দেখেনি। দ্বিধা না করে ওমরকে জড়িয়ে ধরল সে, কি হয়েছে তোমার?

ওমরের ইচ্ছে হলো, এই বাঁধনটুকু আরো শক্ত করে। ভেতরের প্রবল আবেগ ঝড়ো হাওয়ার মত আছড়ে পড়ে ওমর বাটের সারা দেহে। মনে হয়, একটা কিছু ওলটপালট হয়ে যাবে। সুখের সময় এমন হয়, দুঃখের সময়েও যে এমন হয়, এই প্রথম টের পেল ওমর। আকাশের গায়ে হেলান দেয়া যায়, এটা কবিত্বপনা। একজন নারীর দেহ এবং মনে একই সময়ে আশ্রিত হওয়া যায়, এটা ওমর বাটের প্রথম উপলব্ধি।

রোহানার মুখের দিকে তাকাল। এই মুখে, এই চোখে শুধু ভালবাসা নেই, মমতা, স্নেহ এবং সহানুভূতির কোমল প্রস্রবন। আস্তে আস্তে ওকে আলগা করে দিল ওমর বাট। এই মুহূর্তে ওর ভালবাসার দুর্বলতাকে লুণ্ঠন করতে পারেনা। যে মেয়ে অসামান্য, শুধু আবেগের বিহ্বলতায় তাকে সামান্য করে তুলতে চায় না ওমর বাট।

ঘটনাগুলো শুনে মন্তব্য করল রোহানা, এগুলো কোন বড় সমস্যা নয়, তোমার একটা থাকার জায়গা প্রায়োজন, এই তো?

দুপুরে খাওয়ার পর ওমরকে বিশ্রাম করতেও দিল না রোহানা। পথে বের হলো। তার স্কুলে একজন পুরুষ টীচার আছেন। বেশ অভাবী। টিউশনি না করলে সংসার চলে না। কিন্তু বাসাটা নিজের, টিনের ঘর। পাটিশন দিয়ে দুটো কামরা করা। রোহানাকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, ম্যাডাম যদি পারেন, একজন নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে ঠিক করে দেবেন। একটা রুম আমি সাবলেট দেব। তাতে সংসারের কিছুটা সাশ্রয় হবে।

ভদ্রলোক যে এককথায় রাজি হবেন, এ ব্যাপারে রোহানা নিঃসন্দেহ। ওমরের চেয়ে বেশি নিরাপদ লোক কে?

ভাড়া মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব রোহানা নিজেই নেবে। ভদ্রলোককে বাসায় পাওয়া গেল। বিস্ময়ের ব্যাপার, ওমর বাটকে ঘর ভাড়া দিতে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বারবার বলতে লাগলেন, অজানা অচেনা লোক, কি বিপদ।

–অজানা অচেনা হবেন কেন? উনি আমার অতি পরিচিত।

–উনি বিদেশী।

–বিদেশী বলছেন কেন? উনি এদেশে সেটল্‌ড্।

–অতশত বুঝি না ম্যাডাম। ওঁকে আশ্রয় দিলে আমার উপর দু'মুখী আক্রমণ হবে। বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী দু'দলই আমাকে সন্দেহ করবে।

ওমর এক মুহূর্তও দেরি করল না, বলল, ওঠ রোহানা।

www.pathagar.com

রোহানার মুখ কালো, তারই অধীনে কাজ করেন এমন একজন লোক তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল!

রোহানার কষ্ট বুঝতে পারছে ওমর। হাঁটতে হাঁটতে মৃদু স্বরে বলল, বাস্তবকে অস্বীকার করে লাভ কি রোহানা?

–সে আবার কি?

–আমি বাঙ্গালী নই।

–শুধু জন্ম সূত্রে এ দেশের নাগরিক হওয়া যায়, আর কিছুতে হওয়া যায় না?

–হয়তো হওয়া যায়। চোখের রং, চুলের রং মুছে ফেলা যায় না। জবানও ভুলে যাওয়া যায় না। আকৃতি প্রকৃতি একেবারেই দেশজ জিনিস।

–এগুলোই কি জাতীয়তাবাদের বড় কথা?

–সাধারণ মানুষ ইতিহাস পড়ে মানুষ এবং জাতিকে বিচার করে না। বিচার করে আবেগ দিয়ে, অন্ধ অনুকরণের ঐতিহ্য দিয়ে। তাই দেশে দেশে এত বিভেদ, এত হিংসা এত কলহ। রোহানা, তুমি আমার জন্য কষ্ট পেয়ো না।

রোহানা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল, কথা বলল না। ওমর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তোমার স্কুলে একজন দারোয়ান আছে না।

–হ্যাঁ।

–কি যেন নাম?

–জয়নাল।

–তোমার মনে আছে, ও একদিন বলেছিল, তোমরা জন্য ও জান কবুল করতে পারে?

–মনে আছে।

–চল, ওর ওখানে যাই।

রোহানা থমকে দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করল, কেন?

–ও বেচারা একাই থাকে। ওর সঙ্গে ঘরটা যদি শেয়ার করা যায়।

রোহানার মনে রাগ হলো, কণ্ঠে বিরক্তি, ওর ঘরটা গুদামের মত। অন্ধকার, স্যাতসেতে, জানালা নেই।

–আমার কোন অসুবিধে হবে না।

–তুমি আমার চেয়ে বেশি জান, অসুবিধে হবে কি হবে না? রোহানার কথাগুলো রুক্ষ এবং কর্কশ।

ওমর রোহানার সামনে এসে দাঁড়াল, উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর, তুমি কি চাও, আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই? তুমি কি চাও, আমি কমলাপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে রাত কাটাই? বল চুপ করে থেকো না।

রোহানা স্তম্ভিত। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাঁটা আরম্ভ করে

www.pathagar.com

বলল, চল।

মরিয়া হয়েই রোহানা একসময় বলল, বিয়েটা সেরে ফেললেই তো পার। তাহলে থাকার জায়গার অসুবিধা হয় না।

–আমার কি ইচ্ছের অভাব? কিন্তু দেশের যা অবস্থা, তাতে তোমাকে বিধবা করার ইচ্ছে আমার নেই।

–কি সব ভাব!

–অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হয়। তুমি তো আবার পশ্চিম পাকিস্তানে যাবে না। তা না হলে লাল কাতান পরিয়ে তোমাকে নিয়ে আজকেই ফ্লাই করতে পারি।

–তেমন কথা ছিল না, মৃদু কণ্ঠ রোহানার।

–জানি।

–তুমি কি অনুতপ্ত ওমর?

–আমার ভালবাসা, আমার দুঃখ এবং অনুতাপের চেয়ে অনেক বড়, এ পরীক্ষা কি বারবার তোমার কাছে দিতে হবে?

রোহানা কথা বলল না। শুধু ওমরের ধরা হাতের উপর এক ফোঁটা চোখের পানি এসে পড়ল।

চমকে উঠল ওমর, মাফ কর, তোমার কষ্ট বাড়াচ্ছি।

রোহানা চুপ।

হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতেই বলল ওমর, আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি না, এ দেশটাকেই ভালবেসে ফেলেছিলাম। অথচ এ দেশ আমার ভালবাসার সদিচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

–মূঢ়তার কোন ব্যাখ্যা হয় না ওমর। শুধু এর ফলভোগ করব তুমি, আমি এবং আগামী প্রজন্ম।

জয়নালকে ঘরেই পাওয়া গেল।

–জয়নাল, তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এলাম। না করতে পারবে না।

জিহ্বা কাটল জয়নাল, এসব কি বলছেন আম্মাজী। আপনি হুকুম করুন।

–হুকুম তোমাকে স্কুলে করতে পারি, তোমার ঘরে নয়।

–ছেলেকে তার মা সবখানে হুকুম করতে পারে আম্মাজী।

–এই সাহেবকে তোমার ঘরে জায়গা দিতে হবে।

জয়নাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, মা কি ছেলেকে ঠাট্টা করতে পারেন?

–ঠাট্টা নয় জয়নাল। ওর থাকার জাযগা নেই। মেসে, হোটেলে ওকে রাখা বিপজ্জনক। তোমার এখানে ও নিরাপদে থাকবে।

আজকাল কিছু কিছু কথা জয়নাল বুঝতে পারে। সাহেব বাঙ্গালী না। এদেশে

www.pathagar.com

আজ ওর জায়গা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে। আম্মাজীর বাড়িতে জায়গা দিলেও সমাজে নানা কথা উঠতে পারে। এত বয়স হলো, বিয়ে সাদী হলো না।

বিনয়ে কুঁজো হয়ে গেল জয়নাল, উনি থাকবেন, এ আমার সৌভাগ্য। গরীব মানুষ আমি, ওঁর অসুবিধে না হলেই বাঁচি।

–অসুবিধে হলেও সুবিধে অনেক। তোমরা দু'জনেই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। একে অন্যকে দেখতে পারবে। ওর থাকা খাওয়ার খরচা তুমি পাবে।

আবার জিহবা কাটল জয়নাল, আমাকে অপরাধী করবেন না আম্মাজী। আমার ছেলে এ ঘরে থাকলে আমি কি তার কাছ থেকে ঘর ভাড়া নিতাম? তবে হ্যাঁ, আমি গরীব মানুষ. সাহেবের খাওয়া খরচা যোগানো আমার পক্ষে সম্ভব না। স্কুল তো একরকম বন্ধ। মেয়েরা মিলিটারিদের ভয়ে ঠিকমত স্কুলে আসে না। বেতনও দেয় না। আম্মাজী আপনার মাইনে তো বন্ধ। আমাদের মাইনেই বা দেবেন কোত্থেকে?

এ প্রসঙ্গ বন্ধ করতে চাইল রোহানা চৌধুরী। তাড়াতাড়ি বলল, স্কুল ফান্ডে আগের টাকা কিছু জমা আছে। তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন দিতে পারব।

ওমরের এই প্রথম ভাবনা হলো, রোহানা প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করে, যেখানে কথায় কথায় বেতন বন্ধ। এখন একটা বিশেষ অবস্থা চলছে দেশে। কোন কিছু ঠিকমত চলছে না। [illegible] সংসার চলছে কি করে? অথচ এ প্রসঙ্গ উঠানো যাবে না। ওর আত্মমর্যাদা এত বেশি যে, এ কথা উঠালে ও ক্ষেপে যাবে।

–এবার তাহলে চলি জয়নাল, রোহানার কণ্ঠ বেশ শান্ত।

–সে কি কথা? কিছু মুখে না দিয়ে যাবেন? গরীবের বাড়িতে প্রথম এলেন।

বাড়ি থেকে ভাত খেয়েই বেরিয়েছি। ভাল কথা, তুমি সাহেবকে রেঁধে বেড়ে দিয়ো। ইচ্ছে করলে এক সঙ্গে ব্যবস্থা করতে পার, তাতে তোমার সাশ্রয় হবে। তবে মনে রেখো তোমার সাহেব মাছ খায় না। তুমি ওটা আলাদা পাত্রে রেঁধে খেয়ো। এবার তাহলে আসি।

–বসবেন না আরেকটু?

–না, দরকারি জিনিষপত্র নিয়ে রাতে আসব।

ভাল কথা, এখানে খাট পাতা যাবে না। এত অল্প জায়গা। তুমি একটা তক্তপোষের ব্যবস্থা করে দিয়ো। দাম দেব। যদি না পার, স্কুল থেকে কয়েকটা লং বেঞ্চ এনে জোড়া দিয়ে দিয়ো। মেয়েরা এখন স্কুলে আসছে না।

অভিভূতের মত মাথা নাড়ল জয়নাল।

সন্ধ্যায় ওমর ও রোহানা টেবিলে চা খেতে বসল মুখোমুখি। ওমরের ইচ্ছে, দরকারি কিছু কথা বলবে। রোহানা নিঃশব্দ। বাইরের বিষণ্নতা ওকে ঘিরে ধরেছে। চোখ তুলে চাইছে না পর্যন্ত। সাবিহা চৌধুরী মাগরিবের নামাজ আদায় করছেন। তিনি চায়ের টেবিলে আসেননি। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল রোহানা, তুমি কি বলতে চাইছো

www.pathagar.com

জানি ওমর। না বললেই কি নয়?

ওমর বিস্মিত, কি বলতে চাইছি?

–টাকার প্রসঙ্গ। তোমার খরচ চলবে কি করে?

মনে মনে অধিক বিস্মিত ওমর। বলল, এটা একটা বাস্তব সমস্যা, ভাবাটা কি অন্যায়?

–অন্যায় না। তবে না ভাবলেও চলবে। আমার কিছু টাকা আছে, ব্যাংকে আমার বাবা তার একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্য জমা রেখে গেছেন।

–ওটা বিয়েতেই খরচ করো।

–আমার বিয়ে হবে কাজীর অফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রি করে। গহনা আমি পরি না।

–একটা আংটি, এক জোড়া কানের দুল, আর একটা কাতান শাড়ি পরবে না রোহানা? ওমরের কণ্ঠস্বর কোমল।

–তুমি কতদিন বলেছ, তাঁতের শাড়িতে আমাকে দারুণ মানায়। বিয়ের দিন আমি জড়ি পাড় তাঁতের শাড়ি পরব। তুমি বেলি ফুলের মালা কিনে এনো। তাই হবে আমার গহনা।

–রোহানা, তুমি আমাকে আরেক কাপ চা দিতে পার?

রোহানা ভেতরে চলে গেল। ওমর এই সুযোগে তার ভিজে চোখ রুমালে মুছে নিল।

ওমর সিরাজ সাহেবের বাসায় সেদিন সরাসরি চলে এল। ভদ্রলোক সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। ওমরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ওমরের পরিচয় এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে। 'দি শাইনিং ষ্টার ডেইলি'র অফিসের সামছুদ্দিন সাহেব সাব এডিটর। তাঁর কাছে সিরাজ সাহেব নিম্নস্বরে কিছু টাকা ধার চাইতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি আমাকে পেয়েছ কি হে, ব্যাংক না খাজাঞ্চিখানা? কিছুদিন পর পর টাকা ধার চাইবে। আর আমি ওমনি হাত উপুড় করব? একটা পয়সাও আর তোমাকে দিচ্ছি না।

–সামছু, আমি তোমার আগের দেনা শোধ করে দিয়েছি। কাতর কণ্ঠ সিরাজ সাহেবের।

–তা দিয়েছ। তাই বলে বারবার এসব বদারেশন পোয়ায় কে?

–কি করব বল, এতগুলো ফ্যামিলি মেম্বারস, তাদের নানা ধরনের বায়না চাকরির এই কয়টা গোনা টাকা দিয়ে মেটাতে পারি না।

–তুমি যদি সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে না পোষাতে পার, আমি খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে কেমন করে পোষাব?

মুখ মলিন হয়ে গেল সিরাজ সাহেবের। খুব দীন–হীন ভাবে বলল, এই শেষবার,

www.pathagar.com

আর আসব না। দারুণ ঠেকা ঠেকেছি। তোমার ভাবী সাহেবার খুব অসুখ, ডাক্তার ডাকতে পারিনি।

সামছুদ্দিন সাহেবের মন গলল না, কঠিন কণ্ঠে বললেন, পারব না।

থ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক, আমতা আমতা করে বললেন, এত বড় বিপদে.......।

–ইনিয়ে বিনিয়ে বললেই বিপদ বড় হয় না। সবার ঘরেই অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

কালো সিরাজ সাহেবের মুখ, চোখ ছলছল।

ওমর চুপ করে এতক্ষণ দু'জনের কথা শুনছিল। সামছুদ্দিন সাহেবের টেবিলের কাছে উঠে এল, কথা বলল সরাসরি সিরাজ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে, আমি এবং সামছুদ্দিন সাহেব কলীগ। অনেকদিন থেকে একত্রে কাজ করছি। আপনি ওঁর আত্মীয়, মানে আমারো আত্মীয়। টাকাটা আমি আপনাকে ধার দিতে চাই।

কথাগুলো বোধগম্য হতেই ওমরের হাত চেপে ধরলো সিরাজ সাহেব, যেন কত দিনের উষ্ণ পরিচয়। উত্তেজনায় তাঁর হাত ভেজা।

–কত টাকা দরকার?

–এক হাজার।

টাকার পরিমাণ শুনে ঘাবড়ে গেল ওমর। মনের ভাব চেপে রেখে বলল, পকেটে অত নগদ টাকা নেই। চেক লিখে দিচ্ছি।

–ওতেই হবে।

বর্তমানে ফিরে এল ওমর। অনেকদিন হয়ে গেল, ভদ্রলোক টাকা ফেরৎ দেননি। সেও লজ্জায় চায়নি। আজ এসেছে, টাকা নিতে।

ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস করে বললেন, টাকাটা এখন ফেরৎ দিতে পারব না।

–টাকাটা যে আমার খুবই দরকার।

–দেশের দরকারের চাইতে আপনার ব্যক্তিগত দরকার বেশি না।

–আপনার কথা বুঝলাম না।

–বুঝলেন না, কোন গ্রহে বাস করেন সাহেব? পাকিস্তানীদের মোকাবেলা করার জন্য এক গোপন তহবিল খোলা হয়েছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে একদিনের বেতন জমা দিতে হবে। যতদিন সংগ্রাম চলবে ততদিন এ চাঁদা দিতেই হবে। অস্ত্র কিনতে হবে, প্রতিরোধ সংগঠন মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে, ইত্যাদি। কাজেই আপনার টাকা এখন দেয়া সম্ভব না। কবে সম্ভব হবে তাও বলতে পারব না।

ওমর হতভম্ব, তার কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল, আমি অতশত বুঝি নে। আপনার প্রয়োজনে আপনাকে টাকা ধার দিয়েছি, এবার আমার প্রয়োজনে আপনি তা শোধ করবেন।

প্রথমে বিব্রত, তারপর বিদ্রূপে ঝলসে উঠল সিরাজ সাহেবের কণ্ঠস্বর, ও, আপনি তো আবার ঐ দলে। তাই দেশের প্রয়োজন আপনার কাছে বড় না।

www.pathagar.com

তর্ক রাজনৈতিক মোড় নিচ্ছে। তাই সংযত করল ওমর নিজেকে, সিরাজ সাহেব, ঋণ রেখে দান করা শোভা পায় না। তাছাড়া বিপদের দিনে সাহায্যের কথাও ভুলে যাওয়া উচিত না।

সিরাজ সাহেবের মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব, শাসন করে লাভ নেই। আপনাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবার আমাদের দিন।

ওমর ঘর থেকে বের হয়ে এল, আবার পিছন ফিরল, টাকাটা ফেরৎ দেবেন। আমার সত্যি খুব দরকার।

সিরাজ সাহেব নিরুত্তর।

বাসায় ফিরে ওমর দেখল রোহানা বসে আছে মলিন মুখে।

–কোথায় গিয়েছিলে ওমর?

–এক ভদ্রলোকের কাছে কিছু টাকা পেতাম, দিলেন না।

–পাবে না জানি।

–কেমন করে জান?

–মানুষের চরিত্র চিনি না? তাছাড়া ঐ যে চীনা প্রবাদ, যদি শত্রু বানাতে চাও, টাকা তাকে ধার দাও।

ম্লান হাসল ওমর।

–ঝগড়া বাঁধিয়ে এসেছ তো?

–হ্যাঁ। একতরফা ঝগড়া। আমি যত বাঙ্গালী বনতে চাই, ওরা তত আমাকে ঠেলে দেয় দূরে। আমার খিচুড়ি পছন্দ, কিন্তু বাঙ্গালীরা এখন চাল ডাল আলাদা করতে ব্যস্ত।

–এসব কথা এখন থাক, যা হবার হবে। কাল রাতে মিলিটারি এসেছিল স্কুলে।

–রাত্রে কেন?

–ওরা ভেবেছিল, আমি স্কুলের কোয়ার্টারে থাকি।

–কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

–হ্যাঁ। মেয়েরা ঠিকমত স্কুলে আসে কিনা।

–কি বলেছে জয়নাল?

–যা সত্যি তাই বলেছে। খুব কম মেয়ে আসে।

–সত্যি কথা বললেই বিপদ এড়ানো যাবে এমন ভেবো না।

–আমি কি করব?

–স্কুল ঠিকমত না চলার জন্য ওরা তোমাকে দায়ী করবে?

–আমি তো সত্যি সত্যি দায়ী না।

–রোহানা, জরুরী অবস্থায় যুক্তি কোন কাজ করে না, জবরদস্তি কাজ করে।

ওমর মিথ্যে বলে নি। রোহানা চুপ করে রইল।

জয়নাল কাছেই বসেছিল, ওমর তাকে বলল, তুমি তোমার মাকে সাহায্য করতে

www.pathagar.com

পার?

–জান দিতে রাজি সাহেব।

–মেয়েদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসো স্কুলে আসার জন্য। রোহানা, মেয়েদের স্কুল পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে তুমি গার্জিয়ানদের নোটিশ দাও। এতে তোমার নিজের বিপদ অনেক কেটে যাবে।

–কিন্তু মেয়েদের যদি কোন বিপদ হয়, গার্জিয়ানরা কি আমাকে ছাড়বে?

–মিলিটারিরা কচি শিশুদের উপর হামলা করবে না। ওরা শুধু বিদেশীদের দেখাতে চায়, দেশে সব কিছু নর্মাল চলছে। জয়নাল, তুমি নোটিশ বুকে গার্জিয়ানদের সই এনো।

–জ্বি সাহেব।

রোহানা বুঝল, ওমর তার নিরাপত্তার কথা এই মুহূর্তে বেশি ভাবছে। ওমরের অনুমান ঠিক। দু'চার জন করে মেয়ে আসছে স্কুলে। দু'হাজারের জায়গায় পাঁচ ছ'শ। তাই বা মন্দ কি? ঘন্টা বাজে। ক্লাসরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। মাঠে মেয়েরা খেলে। স্কুলে শিক্ষকরা আসেন। পড়াশোনা হয়। কিন্তু ওদুদ সাহেব, যার বাসা ভাড়া নিতে চেয়েছিল রোহানা ওমরের জন্য, আসেন না স্কুলে। হয়তো লজ্জায় আসতে পারছেন না।

সন্ধ্যায় রোহানা জয়নালকে সঙ্গে নিয়ে ওদুদ সাহেবের বাসায় গেল। অন্ধকার ঘর বাড়ি। পিন পতন নৈঃশব্দ। কোথায়ও কোন জীবনের সাড়া নেই। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিল।

–ওদুদ সাহেব কোথায়?

–জানি না।

বৃদ্ধের গলা কাঁপা কাঁপা। মনে হলো ভয় পেয়েছে।

–আমি ওঁর স্কুলের হেড মিসট্রেস, খবর নিতে এসেছি।

অথৈ সমুদ্রে তল পেল ভদ্রলোক, ভেতরে আসুন মা।

ঘরে কুপি জ্বলছে, আসবাবপত্র কিছু নেই।

–ওঁরা কোথায়?

–ইন্ডিয়া চলে গেছে। কাউকে কথাটা বলবেন না মা।

রোহানা চুপ, একজন স্কুল মাস্টারকেও দেশ ছাড়তে হয়?

–পাক সেনারা কি এ বাড়িতে হামলা করেছিল? রোহানা একটু পরে জিজ্ঞেস করল।

–ঠিক হামলা নয়, মাস্টার সাহেবের ছেলের খোঁজে এসেছিল। সে মুক্তিযুদ্ধে নাম লিখিয়েছে।

–বারবার আসছিল মিলিটারিরা, একদিন মাস্টার সাহেবকে ধরে নিয়ে গেল, ক্যান্টনমেন্টে সারাদিন আটকে রেখে জেরা আর নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল

www.pathagar.com

মাস্টার সাহেবকে। সেইদিন বাসায় ফিরে এসেই মাস্টার সাহেব পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতে বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল। না গিয়ে করবে কি? তাকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছিল, সাত দিনের মধ্যে ছেলেকে এনে হাজির করতে হবে ওদের সামনে। কোথায় ছেলে? সে তো এখন ট্রেনিং নিচ্ছে আগরতলার ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে।

–আপনার এ বাসায় থাকা উচিত না। মিলিটারিরা আবার আসবে।

–সবই বুঝি মা। যাওয়ার সময় চোখে পানি নিয়ে মাস্টার সাহেব আমার হাত ধরল, চাচা এই ভিটে বাড়িটুকুই আমার সম্বল। আপনি এর জিম্মাদারীতে রইলেন। দেশ একদিন স্বাধীন হবে। ছেলেপুলে নিয়ে আমি আবার ফিরে আসব। তখন যেন আমাকে গাছতলায় দাঁড়াতে না হয়। আমি কথা দিলাম। এখন জানের মমতায় ওয়াদা খেলাপ করি কি করে?

ওদুদ সাহেবের সূত্র ধরে পাক সেনারা প্রায়ই আসতে লাগল রোহানা চৌধুরীর স্কুলে। মেজর ওয়াসিমের এক কথা, তোমার শিক্ষক একজন মিসক্রিয়েন্ট, তুমি ওর সম্পর্কে উপরে রিপোর্ট করনি কেন?

–জানব কি করে, সে আসলে কি?

–তোমার স্টাফ সম্পর্কে জানাটাই তোমার রেসপনসিবিলিটি।

–মেজর সাহেব, একজন শিক্ষক যখন স্কুলে দায়িত্ব পালন করেন তখন তাঁর কার্যকলাপ জানা আমার রেসপনসিবিলিটি, কিন্তু বাড়িতে বসে সে কি করে তা জানা আমার দায়িত্ব না।

মেজরের ভ্রু কুঁচকে গেল, সে অনেকদিন থেকে স্কুলে আসছিল না, তার এ্যাবসেন্স পিরিয়ড জানাও নি কেন?

–স্কুল তখন চলছিল না। কেউই আসে নি।

–এখন তো আসছে।

–হ্যাঁ। তাইতো তাঁর গরহাজিরের খবর নিতে গেলাম।

–কোথায় গেছে?

–জানি না।

–কিন্তু বুড়োটা বলে দিয়েছে।

–তাহলে তো জানেনই, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

–নিজে সত্য খবরটা দিলে না।

–মেজর, আমি আমার অধিকারের বাইরে খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহী নই।

–আই এ্যাপ্রেশিয়েট ইউর উইট। কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করলে ভাল করবে।

রোহানা চুপ। এ কথার কোন উত্তর দিল না।

সন্ধ্যায় কাদের চাচা স্কুলে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, মা, আমি যে কথা রাখতে

www.pathagar.com

পারলাম না। মারের চোটে বলে দিলাম। বুটের লাথি আরেকবার খেলে আমি বাঁচতাম না।

–কাদের চাচা, আপনি ঠিক কাজ করেছেন। মাস্টার সাহেবরা যেখানে চলে গেছেন সেখান থেকে মিলিটারিরা ওদের ফিরিয়ে আনতে পারবে না। মাঝখান থেকে আপনার জান বাঁচল।

–তাহলে আমি ঠিক কাজ করেছি মা?

–হ্যাঁ চাচা, রোহানা আন্তরিকতার সঙ্গে বলল।

–কিন্তু ওয়াদা খেলাপ হলো যে।

–ওতে কিছু হবে না। জান বাঁচানো ফরজ। এখন আপনি বাড়িটা দেখে রাখতে পারবেন। আপনার কিছু হলে বাড়িটা কার হাতে গিয়ে পড়ত ঠিক কি?

–ঠিক বলেছেন মা। আমি তাহলে যাই।

–চা খেয়ে যান।

–আজ নয়, অন্যদিন আসব।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল রোহানা। দেশের অবস্থা দিন দিন কি যে হচ্ছে! কোথায় গিয়ে স্থির হবে, তাও কারো জানা নেই।

স্কুল ছুটির পরে দারোয়ানের ঘরে গেল রোহানা। ওমরের জ্বর হচ্ছে। পেটে ব্যাথা। তক্তপোষ এত ছোট যে ওর পা মশারীর বাইরে ঝুলে থাকে। সারারাত মশা কামড়ায়। পা ফুলে ঢোল, মনে হয় গোদ হয়েছে। রোজ কেরোসিন মাখে পায়ে। মশাগুলোও চালাক হয়ে উঠেছে। কিছু মানে না।

দিন দিন ওমর শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে। ম্লান ছায়া ওর মুখে। কিছু বললে বলে, ভাল আছি, চমৎকার আছি। জয়নাল আমাকে যত্ন করছে, ঠিক বাপের মত।

রোহানা চুপ। যে অবস্থার উপর তার কর্তৃত্ব নেই, তা নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায়ও নেই।

ওমর হঠাৎ প্রশ্ন করল, তোমার মুখ আজ এত শুকনো কেন? এমন কখনো দেখিনি।

–স্কুলে চাকরি বোধহয় আর করতে পারব না। মেজর বলে গেছেন, মাঝে মাঝে আসবেন। এদিকে ছেলেরাও শাসিয়ে গেছে, আমি কেন স্কুল চালাচ্ছি। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিইনি। আমাকে তারা দেখে নেবে। এখন বল, জান বাঁচাই, না সম্ভ্রম বাঁচাই।

জয়নাল বলল, মা অমানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা চলে না, করলে তার মর্যাদা থাকে না। আপনি কোন দলের কাছেই নতি স্বীকার করবেন না।

রোহানা এই অশিক্ষিত মানুষটির দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে রইল। আজকাল

www.pathagar.com

জয়নাল তাকে আম্মাজী না ডেকে মা ডাকছে। রোহানা এতে খুশি, সহজ ভাষায় ডাক, এই ভাল জয়নাল।

ওমর বলল, জয়নাল মিথ্যে বলেনি। এ দেশ তোমার দেশ। মেয়েরা তোমার সন্তানের মত। তাদের পড়াশোনায় ক্ষতি করবে কেন? এয়ার রেড হলে না হয় কথা ছিল। তেমন সম্ভাবনা নেই।

রোহানা চুপ করে রইল। এক সময় তাকিয়ে দেখল, ওমর দু'চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

–কিছু বলবে?

–যুদ্ধ বোধ হয় পুরোপুরি লেগে গেল।

–কি করে বুঝলে?

–চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্র থেকে নানা রকম ভাষণ প্রচার হচ্ছে।

–বেতার কেন্দ্র তো ভাষণ প্রচারের জন্যই।

বিষণ্ন হাসি ওমরের, রোহানা, তুমি আজকাল অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও। ওখান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আশা করি তোমার মত বুদ্ধিমতী মহিলা এবার সব বুঝতে পারছে।

–সব বুঝি ওমর, শুধু ক্ষতের জায়গায় হাত দিতে চাই না।

–স্বাধীনতা চাও না?

–চাই।

–তাহলে?

রোহানা চুপ।

–কেন এমন কর আমি বুঝি।

রোহানা তাকাল ওমরের মুখের দিকে।

–দেশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তোমার ওমরের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

–আমি স্বার্থপরের মত কিছু ভাবি না ওমর। সব কিছু ভাগ হলেও ভালবাসা ভাগ হয় না। হয়তো ভালবাসার মানুষটাকে পাওয়া যায় না, মন কিন্তু সঙ্গেই থাকে।

–মানুষটাকেই বা পাওয়া যাবে না কেন? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাচ্ছি না।

–তোমার জীবন বিপন্ন হলেও না?

–না।

–আমি চাইলেও না?

–না। জীবন আমার একটাই। আর তা তোমার জীবনের সঙ্গে অনেক আগে থেকে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

–আমি তোমাকে এভাবে মরতে দিতে পারি না ওমর, রোহানার কণ্ঠ ভিজে।

www.pathagar.com

–কি ভাবে?

–না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, না কাজ করে, আর বিপদের আশঙ্কায় সব সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে থেকে।

–কি করতে হবে বল।

–অন্তত কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখো। অন্য কোন কাগজের অফিসে চাকরি নাও।

–দি শাইনিং স্টার কাগজের অফিস থেকে বিতাড়িত হয়েছি জানতে পারলে কোন অফিসই আমাকে কাজ দেবে না।

–কিন্তু তোমার তো কোন দোষ ছিল না। আমি একবার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

–ছিঃ রোহানা।

–বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে মেনে নেব?

–এখানে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নেই। যুদ্ধকালীন অবস্থা। এখানে যুক্তি কোন কাজ করে না। তাছাড়া আমার জন্য তোমাকে কারো কাছে নিচু হতে দেব না।

–বেশ, তাহলে আমার একটা শেষ প্রস্তাব আছে। এটা তোমাকে মানতেই হবে।

–বল।

–তুমি নিজে একটা কাগজ বের কর। কাগজ চালাবার মত সব রকম অভিজ্ঞতা তোমার আছে।

–টাকা পাব কোথায়?

–আমার কিছু আছে।

–তোমার সেই বিয়ের খরচের টাকাটা?

–কেন, টাকাটা কি তোমার কাছে হালাল না?

মৃদু হেসে রোহানার হাতটা নিজের ঠোঁটের কাছে টেনে নিয়ে আল্‌তো ভাবে চুমু খেল ওমর, বলল, ও টাকাটা তোমার কাছে যেমন প্রিয় আমার কাছে ঠিক তেমনি প্রিয়। টাকাটা থাক না। বিয়ের সময় আমাকে একটা এনগেজমেন্ট রিং আর পাজামা পাঞ্জাবী কিনে দিয়ো।

–দিতে তো পারি। তুমি রাজি হও না।

–যে ভদ্রলোক বৌকে খাওয়াতে পরাতে পারবে না, নিদেন পক্ষে একটা বাসা ভাড়া করে বৌকে রাখতে পারবে না, তার বিয়ের সখ হবে কেমন করে?

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোহানা, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে এত আনন্দ পাও?

–ছিঃ রোহানা, ও ভাবে ভেবো না। আমি আমার নিজের অক্ষমতাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। নিজে কষ্ট পাই, তাই হয়তো তোমাকেও দিই।

রোহানা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ওমর যন্ত্রণাদায়ক দৃষ্টি নিয়ে ওর যাওয়া তাকিয়ে

www.pathagar.com

দেখল। কেউই কথা বলল না।

স্কুল চালানো এখন অসহ্য রোহানা চৌধুরীর পক্ষে। মেজর ওয়াসিম এসে উপস্থিত, মিস চৌধুরী, তোমার স্কুলটা একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

–দেখুন।

টিচাররা ক্লাস নিচ্ছিলেন। মেজরকে দেখে কেউ সালাম জানাল, কেউ জানাল না। মেজর এসব খেয়াল করছেন, এমন ভাব দেখালেন না। কমপাউন্ড ঘুরতে ঘুরতে দারোয়ানের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত। ওমর ঘরেই, খবরের কাগজ পড়ছে। মেজরকে না দেখার ভান করল। খবরের কাগজটাই হলো কাল। মেজর ঘরে এসে উপস্থিত, তাঁর মুখে আকস্মিক পরিবর্তন, ইয়ে কৌন হ্যায়?

জয়নাল একবার তাকাল রোহানা চৌধুরীর মুখের দিকে। সে নিশ্চুপ। সে নিজেই উত্তর দিল, মেরা ভাতিজা।

–ইধার কিউ আয়া?

–ও বিমারী হ্যায়। ট্রীটমেন্টকো লিয়ে মেরা পাস আয়া সাহাব।

–ইয়ে বাত ঠিক হ্যায় মিস চৌধুরী?

–ইয়েস মেজর।

–কৌই ডাগ্‌দার দেখায়া?

–জরুর।

–প্রেসক্রিপশন দেখলাইয়ে।

আল্লাহ কত মেহেরবান, এই মুহূর্তে রোহানা এবং জয়নাল দু'জনেই বুঝল। কয়দিন আগেই ওমরকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ডাঃ কোরেশীর সেই প্রেসক্রিপশন জয়নাল মেজরকে দেখাল।

অসন্তুষ্ট মেজর, ইয়ে তো মামুলি ডিজিজ হ্যায়, গ্যাসট্রিক পেইন ইস লিয়ে ঢাকা মে চলা আয়া? আগে ও কোথায় ছিল?

রোহানা বুঝল, জয়নালের পক্ষে আর উত্তর দেয়া সম্ভব না। মেজরের সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছে না।

রোহানা বলল, ও পুরনো ঢাকাতেই ছিল। ওখানে ভাল ডাক্তার নেই। এখানে ধানমন্ডিতে তাই ডাঃ কোরেশীকে দেখানো হয়েছে।

–আভিতক কিউ নেহি চলা যায়া?

–মেজর ওয়াসিম, ও বড় গরীব আদমী। ওর নোকরি দরকার। ভাবছি স্কুলের ছোটখাট একটা কাজে ওকে লাগিয়ে দেব।

–আই সী। লেখাপড়া ভালই জানে। ইংরেজি কাগজ পড়ছিল।

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল রোহানা চৌধুরী। এ ব্যাপারটা সে নিজে খেয়াল করেনি। অথচ মেজর করেছেন।

www.pathagar.com

–ভাবছি ওকে স্কুলের লাইব্রেরিয়ান পোস্টে কাজে লাগাব।

–ওকে, মিস চৌধুরী, দি রেস্পনসিবিলিটি ইজ ইউরস।

মেজর চলে যেতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওমর, মিস চৌধুরী সত্যি সত্যি পোস্টটা আমাকে পাইয়ে দাও। বসে থেকে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেল। আসলে তো ও ধরনের কোন পোস্ট তোমার স্কুলেই নেই।

রেগে গেল রোহানা, এ ছাড়া আমার বলার কি ছিল? শুয়ে আছ নোংরা বিছানায়, এ দিকে হাতে ইংরেজি কাগজ। আজ রাজধানীতে যারা বোমা ফাটাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে, দেয়ালে পোস্টার লাগাচ্ছে, চোরা খুন করছে তারা সবাই তোমার মত যুবক। কাজেই মেজরের সন্দেহ যায়নি। উনি আবার আসবেন। ওমর তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

–সব বুঝতে পারছি রোহানা।

–দেখি তোমার জন্য অন্য কোথায়ও ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

–না।

ওমরের এত স্পষ্ট কণ্ঠ কোনদিন শোনেনি রোহানা। অবাক হয়ে বলল, কেন?

–আমি চলে গেলে ওদের সব সন্দেহ তোমার উপর পড়বে। তুমিই এক মিসক্রিয়েন্টকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

–তাহলে আমি কি বসে বসে তোমার বিপদ দেখব?

–আমার কোন বিপদ নেই।

–তোমার কোন অযৌক্তিক কথা শুনতে চাইনা। আমি চললাম।

–রোহানা শোন, শোন রোহানা।

এই প্রথম ওমরের কথা অগ্রাহ্য করে চলে গেল রোহানা। ওমর ফাঁপড়ে পড়ে গেল। এখানে থাকার উপায় নেই, এটা যেমন সত্য তেমনি বাসা ভাড়া করে থাকাও অসম্ভব। মাস মাস অত টাকা কোথায় পাবে রোহানা? সম্বলের মধ্যে ব্যাংকে মাত্র হাজার দশেক টাকা রোহানার বিয়ের খরচ।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করল ওমরের। সে একজন অক্ষম পুরুষ। এই অক্ষমতা নিজের সৃষ্ট নয়। পরিস্থিতির সৃষ্ট, সে তার শিকার। কেন যে সে এই দেশটাকে, মেয়েটাকে ভালোবাসল? জীবন যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু ভালবাসা যে এত দুঃখের, কষ্টের এবং যন্ত্রণার তা সে কোনদিন জানত না।

রোহানার দিকে আজকাল সে ভাল করে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। শুকিয়ে গেছে ও। চোখের কোলে কালি। ওর সব দুশ্চিন্তা তাকে নিয়েই। ও এদেশের মেয়ে। ওর পরিচিতি এবং সম্মান এ দেশে কম না। নিজেকে নিয়ে ও ভাবে না। ভাবে এক ভবঘুরে প্রেমিককে নিয়ে, এ যাবৎ যে তাকে কিছুই দিতে পারেনি।

রাত দশটায় দরজায় করাঘাত। দরজা খুলে রোহানা অবাক, ওমর তুমি? এত

www.pathagar.com

রাতে?

–ভয় পেলে?

–পাওয়ার কথাই। ফিরতি পথে মিলিটারিরা তোমাকে ধরতে পারে। সারা রাত ওরা রাস্তায় পেট্রল দেয়।

–যদি না ফিরি রাতে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রোহানা, লুকোচুরি খেলো কেন? থাকবে না তা তো জানি।

–রাগ করেছ?

রোহানা চুপ। সে ভাবছে, অল্প বয়স হলে সে এখন খামচাখামচি করে ওমরকে নাজেহাল করে দিত এই নির্মম উপহাসের জন্য, এখন তা পারে না। সম্ভ্রমময় দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভালবাসার আগুনে শুধু জ্বলে পুড়ে মরে। কি দুঃসহ বেদনা নিয়ে যে তারা ভালবাসাকে লালন করছে তা শুধু তারাই জানে।

–সরি, ওমর বলল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল রোহানা চৌধুরী, বলল, কি বলতে এসেছ বল?

–ভাবছি কাগজ একটা বের করেই ফেলি।

–এ নিয়ে আমিও ভাবছি। তবে ইংরেজি কাগজ চলবে না এখন।

–কেন বল তো?

–কয়জন ইংরেজি কাগজ পড়ে? তা ছাড়া এটা একটা ক্রান্তিকাল। আপামর জনসাধারণ দেশের অবস্থা জানতে চায়। তারা বাংলা কাগজ পছন্দ করবে। দেশের সব লোক তো আর উচ্চশিক্ষিত নয়।

–আমি যে বাংলা জানি না।

–আমি তো জানি।

–সর্বনাশ, সব দায়িত্ব তুমি নেবে?

–প্রয়োজনে চাকরি ছেড়ে দেব।

–কাজটা কি ঠিক হবে?

–এক সময়ে যে কাজটা বেঠিক বলে মনে হয়, ভিন্ন পরিস্থিতিতে তা আবার ঠিক হয়ে যায়।

–তোমার কথা বুঝলাম না।

–মেজর ওয়াসিম আমার কাছে টিচার এবং কর্মচারীদের একটা লিস্ট চেয়েছেন, যারা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করছে, অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। আমি তা দিতে পারি না ওমর।

–ঠিক।

–এদিকে স্কুল চালাচ্ছি বলে ছেলেরা ঘন ঘন ওয়ার্নিং দিচ্ছে স্কুল পুড়িয়ে দেবে বলে। জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করার আমার কোন অধিকার নেই।

www.pathagar.com

–তুমি চাকরি ছেড়ে দিলেও অন্য কাউকে দিয়ে ওরা স্কুল চালিয়ে নেবে।

–সে দায়িত্ব তার, আমার না। আমি চাকরি ছেড়েই দেব। তাছাড়া যুদ্ধ তো পুরোপুরি লাগল বলে।

–হ্যাঁ, এ দেশের ছেলেদের, যারা বর্ডার পার হয়েছে, ইন্ডিয়া গেরিলা ট্রেনিং দিচ্ছে, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে।

–জানি।

–কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে পাক বাহিনী বোমা ফেলেছে।

–তাও শুনেছি।

–তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বসানো হয়েছে পঞ্চাশ কিলোওয়াটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

–তুমি এত খবর জানলে কি করে ওমর?

–জয়নাল স্বাধীন বেতার কেন্দ্র ধরে দেয়। ওর একটা ছোট রেডিও আছে।

রোহানা ভাবছে, আজ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ দেশের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, এমন কি জয়নাল শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষরাও। প্রত্যেকের মনে ভয়, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা। ফলাফল কেউ জানে না। কিন্তু দু'দলই নিজেদের জয় সম্পর্কে আশাবাদী।

–কি ভাবছ রোহানা?

–কিছু না। এসো তাহলে কাগজটা বের করেই ফেলি। তবে দৈনিক না, পাক্ষিক পত্রিকা।

ওমর এবং রোহানা যখন পথে নামল, রাত তখন সাড়ে এগারোটা। ওমর বলেছিল, আমি একাই যেতে পারব। রোহানা শোনেনি।

–ফিরতি পথে তোমার যদি বিপদ হয়?

–হবে না। এ এলাকায় সবাই আমার পরিচিত।

এরপরে দু'জনেই চুপ। মন উভয়েরই ভারাক্রান্ত। ওমর ভাবছে, পত্রিকা যদি না চলে, রোহানার শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা পানিতে যাবে। সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। রোহানা ভাবছে, কি লেখার আছে পত্রিকায়? কড়া সেনসরশীপ আরোপ হয়েছে সব কাগজ এবং পত্রিকায়। প্রত্যেক কাগজের একটা নীতি এবং আদর্শ থাকে। সত্যি কথা বলতে গেলে দু'দলই ক্ষেপে উঠবে। সে কোন পক্ষপাতিত্ব করতে পারবে না। বিবেককে সে কোন কিছুর বিনিময়ে বিসর্জনও দেবে না। একটা আদর্শ নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে বাঙ্গালীরা, এটা ঠিক। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব, চরিত্র কি বদলিয়েছে? ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠিস্বার্থ এখনো কেউ ভুলছে না। একদল রাজনীতিক কোলকাতার বড় বড় হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে। প্রচুর টাকা তাদের হাতে। দিল্লীতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে দেন-দরবার করছে।

অন্যদল ভারতের আশ্রয় শিবিরে ধুঁকে ধুঁকে মরছে খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে

www.pathagar.com

এবং দুর্ব্যবহারের করুণ শিকার হয়ে। মেয়েরা ইজ্জত হারাচ্ছে। যুবকরা গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে কঠোর মনোবলের মাধ্যমে। এগুলো কি সে লিখতে পারবে?

কারো কারো ব্যক্তিগত চরিত্রও বদলায়নি। ওদুদ সাহেবের চাচাকে কারা যেন মেরে ফেলেছে। বাড়িটা এক বাঙ্গালী পরিবারের দখলে। রোহানা খোঁজ নিতে গিয়েছিল বুড়ো চাচার। দেখে এই অবস্থায় ঘরসংসার সাজিয়ে আঁটঘাট বেঁধে বসে আছে এক বাঙ্গালী পরিবার।

–আপনারা এখানে কেন?

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক যুবক, কোমরে রিভলভার গোঁজা, বেরিয়ে এল বাইরে, তার আগে আমার জিজ্ঞাসা, আপনি কে?

–আমি আদর্শ নিকেতন গালর্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।

–এখানে কেন এসেছেন?

–ওদুদ সাহেব আমার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওর বাড়িটা দেখে রাখা আমার দায়িত্ব।

–এখন থেকে আপনার দায়িত্ব নেই, এটা আমার দায়িত্ব।

–এর নাম দায়িত্ব? এতো দখলদারিত্ব।

–ম্যাডাম, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। কেটে পড়ুন।

–ভয় দেখাচ্ছ?

–সাবধান করছি।

–বাড়িটা ছেড়ে দাও।

–যদি না ছাড়ি?

–আমি তোমাদের উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করব।

–তা পারেন। আপনি তো পাক আর্মিদের দালালি করছেন। পরিণাম ভেবে দেখেছেন?

–মুখ সামলে কথা বল।

–কে না জানে, এক মেজর প্রায়ই আপনার স্কুলে আসে। আপনি তার সঙ্গে শলা–পরামর্শ করে কাজ করেন। ভেবেছেন, এ দেশের ছেলেদের ধরিয়ে দিয়ে ইনাম পাবেন? সে গুড়ে বালি। ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে আপনার অস্তিত্ব।

–তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

–আপনি যাবেন ম্যাডাম? এরপর ম্যাডাম বলব না, বলব মহিলা। তারপর মেয়ে মানুষ।

রোহানার মুখ লাল। কানে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। বলল, দেশপ্রেম মানুষকে ইতর করে না। কিন্তু তুমি একটা ইতর। দেশের ভালই যদি চাও, তাহলে অন্যায় করবে কেন?

এবার যুবকটি চুপ করে রইল, কথা বলল না।

www.pathagar.com

স্কুলের গেটে কখন রিক্সা এসে গেছে, রোহানা জানে না। ওমর বলল, তুমি আর নেমো না। এই রিক্সাতেই বাড়ি ফিরে যাও।

–না সাহেব, আমি আর ও পথে যাব না। রিক্সা গ্যারেজে জমা দিতে হবে। বলল রিক্সাওয়ালা।

–ভাই, একজন মহিলাকে এ ভাবে পথে ফেলে যাবে? এত রাতে আর রিক্সা পাওয়া যাবে না। ওমর অনুনয় করে বলল।

–চলেন আপা তাইলে। বোনরে কি ভাই বিপদে ফেলাইতে পারে?

ব্যাপারটা এমন কিছু না। তবু রোহানার চোখে পানি। এ দেশটা আসলেই বিচিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, সম্পদের উপকরণে, মানুষের স্বভাব এবং চরিত্রে। তাইতো এ দেশটা নিঃশেষ হতে গিয়েও হয় না। অটল বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে।

রাস্তায় এক মিলিটারি জীপের সামনে পড়ল রিক্সা। হাঁক দিয়ে উঠল এক সৈন্য, এই রোখ যাও।

একজন অফিসার নেমে এলো, কোমরের হোল্ডারে পিস্তল ঝোলানো, আপ কৌন হ্যায়? কিধার যা রাহা?

রোহানা পরিচয় দিল, সে আদর্শ নিকেতন গার্লস্ স্কুলের হেডমিসট্রেস। স্কুলের দারোয়ানের অসুখ। দেখতে গিয়েছিল। ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করতে দেরি হয়ে গেল। এখন বাসায় ফিরছে।

রোহানার কথা বিশ্বাস করল অফিসার। বলল, ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। মগর এতনা রাতমে কভি নিকাল না চাহিয়ে।

–থ্যাঙ্কস।

নিজের উপর এই প্রথম ঘৃণা হলো রোহানার। এতগুলো নির্জলা মিথ্যা বলল সে কি করে? শুধু ঝামেলা এড়াবার জন্য, ওমরকে নিরাপদে রাখার জন্য, এই তো? কিন্তু সেই ওমরই তাকে বলে, রোহানা, সত্যের পরীক্ষা হয় বিপদের সময়। বিপদের সময়েও কেউ যদি মিথ্যে বলে, তাহলেও সে সত্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু আজকাল কেন যে সে মনের আগের জোর ফিরে পায় না, আশ্চর্য। ভালবাসা তাকে বলিষ্ঠ না করে দুর্বল করছে। ছিঃ। ওমরকে সে মুখ দেখাবে কি করে?

কাগজ বা পত্রিকা বের করতে হলে প্রেস দরকার। কোথায় সেই প্রেস? কত প্রেসই তো আছে, কেউ কি সহযোগিতা করতে রাজি হবে? তবু চেষ্টা করতে হবে? ভাবনাগুলো এখন ওমরের। দাড়ি শেভ করে পরিচ্ছন্ন হতে চেষ্টা করল ওমর। শেভ করতে করতেই আপন মনে হাসল, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পাবে কোথায়? রোহানা ময়লা কাপড়-চোপর নিয়ে যেতে চায়, দেয় না ওমর, বলে, জয়নাল পরিষ্কার করে দেবে।

–ওর সময় কোথায়? সারাদিন স্কুলেই থাকে।

www.pathagar.com

–আমি নিজে করে নেব।

–কোনদিন করেছ?

–কোনদিন করি না বলে আজ করব না, পারব না, এটা কেমন কথা? সময়ের পরিবর্তনে অনেককে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হচ্ছে। শুধু আমিই বদলাব না?

রোহানা তর্ক করেনি। চলে গিয়েছিল। সেই কাপড় আজো ধোয়া হয়নি। অতএব ময়লা এবং ভাজ ভাঙ্গা পাজামা-পাঞ্জাবী পরেই রওয়ানা হলো ওমর। মনসুর সাহেব তাকে চিনতেই পারলেন না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

–আমি ওমর বাট।

অনেকক্ষণ নীরব ভদ্রলোক। তারপর জিজ্ঞাসা, কি ব্যাপার বলুন তো? এ দশা কেন আপনার?

–আমি এখন বেকার।

–শুনেছি।

–একটা কিছু এখন করতে চাই।

মুহূর্তে গলার স্বর বদলে গেল ভদ্রলোকের, আমার এখানে কোন চাকরি খালি নেই। তাছাড়া আমার বাংলা কাগজ, আপনি বাংলা জানেন না।

–আমি নিজেই একটা বাংলা পত্রিকা বের করব।

–বাংলা পত্রিকা! হাসালেন দেখছি।

–হাসির কি আছে? লেখিকা রোহানা চৌধুরী সাহায্য করবে।

–তা সমস্যাটা কোথায়?

–প্রেস দরকার।

–আমার মেশিন খালি যায় না।

–কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, বিকাল থেকে কাগজ ছাপা আরম্ভ হয় প্রেসে। দিনের বেলাটা প্রেস খালিই থাকে। ঐ সময়টায় যদি......।

কথা শেষ করতে দিলেন না মনসুর সাহেব, শোনা কথা আর কান কথা তো একই রকম। এর কোন ভিত্তি নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওমর বাট। মনে মনে ভাবল, মনসুর সাহেব সত্য কথা বললেন না। এই প্রেসের ম্যানেজারই তাকে খবরটা জানিয়েছে। অনেক দিনের বন্ধুত্ব তাদের, সেই সুবাদে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সে। ওমর স্পষ্টই বুঝল, মনসুর সাহেব তাকে প্রেস ভাড়া দিতে নারাজ।

–উঠি তাহলে?

–এক কাপ চা খান।

–এই সময়ে খাই না।

ওমর দরজার দিকে এগুলো।

www.pathagar.com

–ওমর সাহেব শুনন।

–কিছু বলবেন?

–অন্য কিছু প্রয়োজন হলে বলবেন।

–ধন্যবাদ। আর কিছু প্রয়োজন নেই।

–সময়টা বড় কঠিন ওমর সাহেব।

–জানি, বিশ্বাস করাটা তার চেয়েও কঠিন।

–মনসুর সাহেবের আর কোন জবাব এল না।

ঢাকা কলেজের সামনে আসতেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনল ওমর, ধর, মার, শালা বিহারী। দেখতে দেখতে জনতা একটি তরুণ ছেলেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তারপর তা গড়িয়ে গড়িয়ে চলল পীচ ঢালা রাস্তায়। অল্প সময়েই সেই তরল রক্ত দলা বেঁধে কালচে রূপ ধারণ করল। তরুণের দেহটা ছেঁড়া খোড়া পাহাড়ের টিবির মত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো ডিনামাইট দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া অমসৃন দৃশ্যের মত।

জনতার একজনকে জিজ্ঞেস করল ওমর, ভাই ছেলেটা কি করেছিল?

–শালা বিহারী।

ওমর আরো দু'পা এগিয়ে গিয়ে অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, ছেলেটার অপরাধ কি ছিল?

–বদমায়েশটা বিহারী।

তৃতীয় জনের কাছে ওমরের জিজ্ঞাসা, ওর অন্যায়টা কোথায়?

–ও উর্দুতে কথা বলে। ওরা আমাদের দুশমন। খতম করাই উচিত।

ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগল ওমর। তীক্ষ্ণ ভয় এবং বেদনার স্রোত বয়ে যেতে লাগল শিরা উপশিরা বেয়ে। অনেক দিনের অতীত হয়ে যাওয়া এক গল্প দৃশ্য হয়ে ভাসতে লাগল তার চোখের সামনে। মার কাছে শোনা কাহিনী।

তাদের পূর্ব পুরুষ বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা। বাপ দাদার ভিটেমাটি পাটনার এক উপ-শহরে, তাদের আদি নিবাস। মোটামুটি অবস্থা স্বচ্ছল। কোঠা বাড়ি। জমিজমা। ব্যবসা। বাজারে কাপড়ের দোকান। একটা ভ্যারাইটি স্টোর। একদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধল। দেখতে দেখতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত বিহারে। মুসলমানদের বাড়িঘর, দোকানপাট পুড়ে ছারখার হতে লাগল। তাদের বাজারের কাপড়ের দোকান প্রথমে লুট হলো। তারপর এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। একদিন গভীর রাতে আক্রান্ত হলো তাদের বাড়ি। ওমরের দাদা মইনউদ্দিন তার ছেলেকে বললেন, বৌমাকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালাও। ছেলে মোটে বছর দুই হলো বিয়ে করেছে। ছ' মাসের কচি শিশুকন্যা কোলে।

www.pathagar.com

মা বাচ্চার দোলনার দিকে এগিয়ে গেলেন। দাদী আম্মা বললেন, ওকে নিয়ে তুমি দৌড়াতে পারবে না বৌমা। তাছাড়া পথে শিশু কাঁদলে ওরা ধাওয়া করবে তোমাদের। তাতে কারো জানই বাঁচবে না। আব্বাজী আপত্তি করেছিলেন, আপনাদের ফেলে ....

দাদাজী ধমকে উঠলেন, বাত্ শোনো। জলদি ভাগো। হামলোগ বুড্ডাবুড্ডি। মরণেকা ডরনা কিয়া? যাও বেটা যাও। পরের দিকে বৃদ্ধের গলা ভারি।

–কিধার যানে হোগা আব্বাজী?

–নজদিগ ভুট্টা ক্ষেত আছে। ওখানে লুকিয়ে আপাততঃ রাতটা কাটাও। পরে দেখা যাবে। অবস্থা শান্ত হলে সোবেহ্ সাদেকের সময় বাসায় ফিরে এসো।

আব্বাজী ও আম্মাজী চলে গেলেন। শিশুটির দিকে একবার তাকালেন। কোলে তুলে আদর করার সময় নেই। বৌমার মনের অবস্থা বুঝলেন শাশুড়ী আম্মা। বললেন, আল্লাহ ভরসা কর। ও মাসুম বাচ্চা। ওকে কেউ কিছু বলবে না।

ভুট্টা ক্ষেত থেকেই আব্বাজী আম্মাজী দেখতে পেয়েছিলেন, দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের বাড়ি। আগুনের লেলিহান শিখা সহস্র বাহু মেলে শূন্যে আস্ফালন করছে। অজস্র জনতার কণ্ঠস্বর বাতাসে তান্ডব-নৃত্য করতে করতে ভেসে আসছে, রামজীকি জয়, হনুমানজীকি জয়। বন্দে মাতরম। আম্মাজী পাগলের মত ভুট্টা ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি ঘাগড়া, দুপাট্টা আর মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছেন। আব্বাজী তাঁকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। জানেন, এখন গিয়ে লাভ নেই। শুধু বেইজ্জতি হবে তাঁর, স্ত্রী প্রাণ হারাবে।

পরদিন সকাল আটটায় তারা ভুট্টা ক্ষেত থেকে বের হয়ে মোকামে ফিরে এসেছিল। শুধু ধ্বংসস্তূপ। কোথায় তাঁদের বুড়ো বাবা মা আর শিশু সন্তান? শোবার ঘরে গিয়ে অবাক, খাটের পায়ের সঙ্গে বাঁধা পিতাজী এবং আম্মাজীর অর্ধগদ্ধ দেহ বীভৎস করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, দু'জনে মুখোমুখি বসে সুখ-দুঃখের গল্প করছে। দোলনায় শিশুকে খুঁজছিলেন মা সাঈদা। দুটোই পুড়ে ছাই। যেন কৃষ্ণপুরের কালো মাটির পুতুল। হাত দিয়ে ছুঁতেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ল ছাই। কি অবশিষ্ট রইল তা দেখার আগেই সাঈদা জ্ঞান হারালেন। তিনদিন পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী আশ্রয় ক্যাম্পে। পিতাজী ঠিক করলেন, আর এখানে নয়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করবেন। মোহাজের হবেন।

বন্ধু-বান্ধব অনেক বোঝাল, আমাদেরও তো একই অবস্থা। জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি অনেক। তবু দেশের অবস্থা দেখে নগদ কিছু টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়েছিলাম। তাই রক্ষে। ওখান থেকে তোমাকে কিছু ধার দিতে পারি। আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ কর। বাপ-দাদার জন্মস্থান ত্যাগ করবে কেন?

পিতাজী অটল, যে দেশে বিনা দোষে নীরিহ মানুষ প্রাণ হারায়, সম্পদ লুটপাট হয় শুধু মুসলমান হওয়ার দোষে, মাসুম শিশুরও বাঁচার অধিকার থাকে না, সে দেশে

www.pathagar.com

আর থাকা নয়।

তবু হিতৈষীরা বারবার অনুরোধ করে। শেষে পিতাজী বলেন, সাঈদার অবস্থা দ্যাখো। যতদিন ও এখানে থাকবে, ওর সন্তানের করুণ পরিণামের বীভৎস দৃশ্য ভুলতে পারবে না। ও পাগল হয়ে যাবে।

বন্ধুরা তখন হাল ছেড়ে দিলেন।

পিতাজী স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি জমালেন একেবারে লাহোরে। কিছু টাকা ধার করে এনেছিলেন বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে। পরে শোধ করেছেন। পিতাজীর বুদ্ধি ছিল, বিদ্যা ছিল। ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন পুলিশ বিভাগে। তারপর বদলি হয়ে এসেছিলেন এই পূর্ব-পাকিস্তানে।

লাহোরে থাকতেই ওমরের জন্ম। নবজাত শিশুকে যখন পিতাজী দেখতে গেলেন নার্সিং হোমে, পত্নী সেদিন প্রথম কথা বললেন, দ্যাখো তো, ওর চেহারা রক্সীর মত হয়েছে কিনা।

পিতাজী কেঁদে ফেললেন। রক্সী তার প্রথম সন্তান, যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল দাঙ্গায়। বললেন, মেয়ে আর ছেলের চেহারা কি এক হয় সাঈদা?

–কেন হবে না গো? ভাই-বোন তো।

পিতাজী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

এই কাহিনী ওমর বাট খুলে বলেছিল রোহানা চৌধুরীকে। বলতে বলতে তার দু'চোখ ভরে উঠেছিল পানিতে। রোহানা বলল, যে স্মৃতি তোমাকে দুঃখ দেয়, বিমর্ষ করে তা আমাকে বলতে গেলে কেন?

আমি পৈত্রিক সূত্রে বিহারী, জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী, এটা তোমার জানা থাকা দরকার।

–আশ্চর্য, এটা একটা পরিচয় হলো?

ঘাবড়ে গেল ওমর, কেন?

–মুসলমানের জন্মসূত্র এবং পারিবারিক সূত্র এসবের কোন দাম নেই। সে মুসলমান, এইটেই বড় কথা।

–তুমি কি ইসলামের এই মানবিক দিকটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর?

–করি বলেই বলছি। যা আমি বিশ্বাস করি না, তা আমি বলি না।

–যত তোমাকে দেখছি তত অবাক হচ্ছি।

–তুমি বাড়িয়ে বলছ ওমর। এটা আমার ব্যক্তিগত ঔদার্য না, মানবতার ঔদার্য। সব ধর্মের সার কথা। আমার বাবা আমাকে এগুলো শিখিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী।

–যে তাঁর আদর্শকে ধারণ করে আছে, সেও কত সুন্দর এবং উদার।

–এই, আবার এসব কি কথা?

ওমর হেসে রোহানার হাত টেনে নিল। ইচ্ছে হলো চুমু খায়। খেল না, ধরে

www.pathagar.com

রইল। রোহানা বলল, তুমি এমন করে বল যে সুখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

অতীত থেকে ফিরে এল ওমর। সামনে ভাতের থালা, হাত গুটিয়ে বসে আছে।

–ওমর খাও।

মুখে গ্রাস তুলেই বমি করে ফেলল ওমর। মনে হলো, ভাতে শুধু রক্তের গন্ধ আর নোনা স্বাদ। সন্ত্রস্ত রোহানা, ওমর এমন করছ কেন?

ওমর চুপ। সে কি রোহানাকে বলবে, একটি নিরপরাধ বিহারী ছেলেকে চোখের সামনে তালগোল পাকিয়ে যেতে দেখেছে? তাজা রক্তের ফোয়ারা দেখেছে। আর তা নদীর স্রোতের মত রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে রক্তস্নাত লাল দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। কখনো বা রক্তজবা ফুল হয়ে চোখের সামনে নেচেছে আহত পশুর গলা কাটা ছটফটানির মত। এই দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়েছে। নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছে। মানুষের রক্তের সেই লোনা স্বাদ তার আকণ্ঠ ভরে তুলেছে পূতিঃগন্ধময় নরক যন্ত্রণার মত। কিন্তু রোহানাকে সে কোন দিন এসব কথা খুলে বলতে পারবে না। সে দুঃখ পাবে, দুশ্চিন্তা করবে। তারপর তাকে ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করবে পশ্চিম পাকিস্তানে। নিজে কাটাবে নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ একক জীবন।

রোহানা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আবার প্রশ্ন করে, তোমার কি হয়েছে ওমর? খেতে পারছ না, অথচ খিধে পেয়েছে বলে ভাত চেয়ে নিলে?

–মাথাটা ধরেছে।

–ওমর, তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওমর। তারপর বলল, আমি কোন প্রেস ঠিক করতে পারিনি।

–এটা একটা বড় সমস্যা হলো? আমার উপর সব ছেড়ে দাও। যা কিছু করা দরকার আমি করব। আজ মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশনে গিয়েছিলাম।

ওমর চোখ তুলল।

–কাগজ বের করতে হলে সরকারের পারমিশন এবং রেজিস্ট্রেশন লাগবে।

–রোহানা ভেবে দ্যাখো, যুদ্ধ যেখানে পুরোপুরি আরম্ভ হয়েছে সেখানে নতুন করে কোন কাজ আরম্ভ করা যাবে কি না।

–অন্য কাজ আরম্ভ করা যাবে না, পত্রিকা বা কাগজ বের করা যাবে।

–প্রত্যেকটি কাগজ বা পত্রিকা বের করার পেছনে একটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক আদর্শ থাকে, এগুলো কি এখন তুলে ধরতে পারবে?

–আমি স্ব–বিরোধী কাজ করিনা ওমর।

–তাইতো তোমাকে নিয়ে আমার এত ভয় রোহানা।

–ওমর আমার জীবনটা এই রকমই, কাজ করি, তৃপ্তি পাই না। ভালোবাসি, আনন্দে আপ্লুত হতে পারি না। জীবনে উন্নতি করতে চাই, কিন্তু ঠগবাজির পথে এগুতে

www.pathagar.com

পারি না। ওমর, আমি এই মনে করে পত্রিকা বের করতে যাচ্ছি না যে আর্থিকভাবে লাভবান হবো, অথবা ক্ষমতা অর্জন করে সমাজে একটা শীর্ষস্থান দখল করব। আমি শুধু সমাজের মানুষগুলোকে বোঝাতে চাই, এই মুহূর্তে আমাদের কি করা দরকার, কি করতে যাচ্ছি, ভবিষতে কি পাব আমরা। আমি কোন দলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলব না। আমার মুক্ত বিবেক কথা বলবে।

–বুঝেছি, তুমি বাড়তি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝোঝা কাঁধে নিতে যাচ্ছ।

–হয়তো তাই। স্কুলে কাজ করলেও বিপদ এড়াতে পারব না। ঘরে বসে থাকলেও বিপদ এড়ানো যাবে না। অতএব কাজ করাই ভাল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল ওমর, কথা বলল না। রোহানা বুকে কষ্ট চেপে রেখে ওমরের অভুক্ত খাবার তুলে নিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, কি হয়েছে ওর? এমন তো কখনো করে না। রাত্রে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হলো ওমরকে। খাওয়ার নাম মুখে তুলছে না। রোহানা বলল, আমি এখন পর্যন্ত কিছু খাই নি।

–কেন বল তো! বিস্ময় ওমরের প্রশ্নে।

–তুমি যে কিছু খেলে না।

হেসে ফেলল ওমর, দিনে দিনে তুমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ।

–আমার একটা কথার জবাব দেবে ওমর?

–বল।

–তুমি না খেয়ে থাকলে তোমার মা কি খেয়ে নিতেন?

ওমর চোখ তুলে তাকিয়ে রইল, কথা বলল না।

–এক জায়গায় আমাদের মিল, আমরা দু'জনেই মেয়ে মানুষ।

–ঠিক আছে, পাউরুটি নিয়ে এসো, চেষ্টা করে দেখি, একটু স্থির হয়ে বলল ওমর।

–দুধ দিয়ে ভিজিয়ে দিই?

–না, আমার গলায় কোন প্রব্লেম নেই। বরং কড়া ঝালের সবজি দাও।

–দু'জনে একত্রে খাই, যদি এঁটো ঘৃণা না কর।

–অনেকবার একত্রে খেয়েছি। নতুন করে এসব প্রশ্ন তুলছো কেন?

–তোমার শরীর মন ভাল নেই, তাই। ঠিক আছে, খাবার আনছি। তুমি ততক্ষণে আমার পত্রিকার নাম নিয়ে ভাব। সুন্দর একটা বাংলা নাম।

দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিল, পত্রিকার নাম হবে 'দর্শন'। ওমর প্রথমে বলেছিল, নামটা 'দর্পন' হোক।

–ও নামটা বহুল ব্যবহৃত। ওটা থাক, বলল রোহানা।

হাল্কা ঠাট্টা করল ওমর, এটা কি তোমার জীবন দর্শন, নাকি সক্রেটিস, প্লেটোর দর্শন?

www.pathagar.com

রোহানাও হাসল, যে ভাবে যে নেয়। আমি সমাজকে দর্শন করব মনের অকপট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, মানুষকে বিচার করব মানবিক দৃষ্টি নিয়ে, যুদ্ধ দেখব মনের আয়না দিয়ে, তারপর লিখব।

–যদি পক্ষপাতিত্ব কর?

–সেই ভয় নেই। যুদ্ধ আমি বাঁধাইনি। এখানে আমার লোভ, ক্ষমতা এবং সম্পদের ভাগ নেই। আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করব।

–যুদ্ধের পরিস্থিতি এত জটিল হয় যে, নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। দু'পক্ষই তোমাকে ভুল বুঝবে।

–ওমর, স্বদেশ রক্ষায় কোন মতদ্বৈধতা নেই আমার। সমস্যা অন্যখানে। অনুন্নত দেশের চরিত্র এই, যে ভাল দিয়ে আরম্ভ করে, মন্দ দিয়ে শেষ করে। যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেই দেখবে যে দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, হিংসা, লোভ, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে প্রায় সবাই তৎপর। থাক সে কথা, দর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই হেড লাইন দেব, যুদ্ধ কে বাঁধাল?

এক বড়শিতে দুই মাছ ধরে না, কিন্তু এক ঢিলে দুই পাখি মরে। যুদ্ধ যে ভাবেই বাঁধুক, যুদ্ধ বেঁধে গেছে, বাস্তবতার ভিত্তিতে এই কথাই এখন জনসাধারণের মনে বড়। এম. ভি সোয়াত জাহাজটি যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি জেটিতে নিধনযজ্ঞে বহু পাক সেনাকে বধ করা হয়েছিল এটাও সত্য। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বিশ্বাস করছে না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস দু' পক্ষকে দাঁড় করিয়েছে মুখোমুখি। তাই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কোথায় গিয়ে পড়ল, কে ফেলল, এই তথ্যের চেয়ে কত সম্পদ পুড়ে ছাই হলো, কত জীবন ক্ষয় হলো, কত মা-বোন-বধূর চোখের অশ্রু ঝরল, এই আহাজারিই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছে বেশি।

দর্শন পত্রিকায় এই ধরনের প্রতিবেদন জনসাধারণের মনে নতুন চেতনার সৃষ্টি করল। তারা ভাবতে চেষ্টা করল, বিশ্বে যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী? বিশেষ করে এই সব অনুন্নত গরীব দেশে?

ওমর ভয় পেয়ে বলল, তুমি একি সর্বনাশা খেলায় মেতেছ। যদি তোমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে?

–করবে না। গিল্টি মাইন্ড অলওয়েজ প্রিকস। যুদ্ধবাজরা নিজেরাই তাদের আদর্শের দুর্বলতা জানে। চ্যালেঞ্জ করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে।

ওমর গম্ভীর। কথা বলছে না। রোহানার কণ্ঠস্বর আবেগে ভেজা, ওমর আমার জন্য ভয় পেয়ো না। পৃথিবীতে ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে কাউকে না কাউকে যুদ্ধ করতেই

www.pathagar.com

হয়। তাতে জীবন বিনাশ হয়, কিন্তু আদর্শ বিনাশ হয় না। ধীরে, অতি ধীরে তা রক্ত স্রোতের মত সঞ্চারিত হতে থাকে জনজীবনে। লাভ তো সেইটুকুই।

ওমর চুপ করেই রইল। পত্রিকায় ওমরকে বেশি জড়িত করে না রোহানা। মালিক, সম্পাদক, প্রতিবেদক সে নিজেই। শুধু মফঃস্বল শহর এবং গ্রাম বাংলার খবরের রিপোর্টিংয়ে ওমরের নাম থাকে।

এরই মধ্যে একদিন মেজর ওয়াসিম এসে উপস্থিত, তাঁর হাতে দর্শন পত্রিকার বান্ডিল, মিস চৌধুরী, এ পত্রিকার মালিকানা তোমার?

–হ্যাঁ।

–এডিটর তুমি নিজে?

–দেখতেই তো পাচ্ছ।

–আর কে কে তোমার পত্রিকায় কাজ করে?

–দু'তিনজন পার্ট টাইম কাজ করে।

–তারা কোথায় থাকে?

–জানি না।

–ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে কমপ্লিমেন্ট জানাতে এসেছি।

–কেন?

–চমৎকার লিখেছ।

–আমি প্রশংসা পাওয়ার জন্য লিখি নি।

–তাহলে ....?

–সত্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

–একই কথা হলো। তোমাদের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এঁরাও তো সত্যের জন্য ফাইট করে গেছেন।

–তোমাদের বলছ কেন? এঁরা পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন।

–সরি মিস চৌধুরী। তোমার দেখছি সব দিকেই চোখ কান খোলা।

রোহানা জবাব দিল না।

মেজর ওয়াসিম বললেন, আমরা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

ভেতরে ভেতরে রোহানা শঙ্কিত। প্রশংসার আসল অর্থ এবার বোঝা গেল। বলল, নো নীড, থ্যাংকস।

–ভাল কাজে আমাদের একটু অংশ নিতে দাও মিস চৌধুরী।

–আরো কত ভাল কাজ আছে মেজর।

–আছে। কিন্তু এ কাজটা পাবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট করার কাজ।

–আমার কাজ আমাকেই করতে দাও।

–তুমিই করবে। আমরা শুধু তোমাকে আর্থিক সাহায্য দেব।

www.pathagar.com

মনে মনে বিরক্ত রোহানা চৌধুরী, ভালই টোপ ফেলতে চেষ্টা করছেন মেজর ওয়াসিম।

–আপাততঃ আমার কোন আর্থিক সমস্যা নেই মেজর।

–কত কপি বের কর?

–পাঁচ শ'।

–আরো বেশি বের কর। ধর হাজার। বাড়তি সংখ্যার টাকাটা আমরা দেব।

–অত সংখ্যা চলবে না।

–আহা বের করে দ্যাখোইনা।

–আমি বেহিসাবী কাজ করি না।

মেজরের মুখ একটু একটু করে লাল হচ্ছে। তবু ধৈর্য ধরে আছে।

–আমরা সৈনিকরা না হয় তোমার বাড়তি সংখ্যা কিনলাম।

–সাহিত্য পত্রিকা পড়ার মত অত সময় সত্যি কি তোমাদের হাতে আছে, মেজর ওয়াসিম? তাছাড়া আমার সব কথা যে তোমাদের মনে ধরবে এমন কোন কথা নেই।

–কিন্তু মন যুগিয়েই তো তোমাকে লিখতে হবে। কাগজে সেন্সরশীপ আছে। তুমি সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে পার না।

–আমি কারো বিরুদ্ধে লিখছি না, আবার সবার বিরুদ্ধেই লিখছি।

–হোয়াট?

–আমি আমার বিবেক অনুযায়ী সত্যকে তুলে ধরব। তাতে কার কি পছন্দ হলো বা না হলো তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

–পরিণাম ভেবেছ?

ওমরের কথা রোহানা চৌধুরীর সেই মুহূর্তে মনে পড়ল, পৃথিবীর সব সামরিক লোকদের চেহারা এক। নখর লুকিয়ে থাকে, সময় মত বের হয়।

–মেজর, ওসব ভাবলে কাজ করা যায় না।

মেজর ওয়াসিম উঠতে উঠতে বললেন, তবু ব্যাপারটা ভেবে দেখো। একটু বিরতি, তারপর ফের প্রসঙ্গ টানলেন, আমরা মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিই, কথা বলার অবসর দিই না। তোমার বেলায় অন্যরকম। তোমার উপর আমাদের ইমপ্রেশন ভাল, তাই অনুরোধ জানালাম।

রোহানা চৌধুরী কোন জবাব দিল না।

–ভাল কথা, তোমার সেই লাইব্রেরিয়ান কোথায়?

–ও ওর মাকে দেখতে পুরনো ঢাকায় গেছে। রাতে ফিরে আসবে।

–আরেক দিন এসে ওর সঙ্গে কথা বলব।

–ঠিক আছে।

একটু হাসি দেখা দিল মেজর ওয়াসিমের ঠোঁটে, মিস চৌধুরী, ইউ আর ভেরি

www.pathagar.com

ইনটেলিজেন্ট টু ট্যাকল দি প্রব্লেম। দেখা হবে আবার। গুড বাই।

–গুড বাই।

মেজর ওয়াসিম চলে যেতেই চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে রোহানা, মেজর ওয়াসিম তাকে বিশ্বাস করেননি। সেও সত্যি কথা বলেনি। ওমরকে সে জোর করেই সরিয়ে ফেলেছে তার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাসায়। স্বামী–স্ত্রী, একটি শিশু সন্তান। কোন ঝামেলা নেই। একটা রুম সাবলেট দিয়েছে ওরা। কিন্তু বাসাটা হাটখোলা রোডে। শেরে বাংলা নগর থেকে ওমরকে ওখানে দেখতে যাওয়া তার পক্ষে খুব কষ্টকর। পৃথিবীতে কাউকে বোঝানো যাবে না, কাউকে ভালোবাসলে তাকে চোখে না দেখতে পাওয়াটাও কত বড় কষ্টের।

রাতে ওমর এসে উপস্থিত। রোহানা বিস্মিত, কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিল খুশি হয়ে। হাতটা তুলে নিয়ে আলতোভাবে ঠোঁটে ছুঁয়ে ছেড়ে দিল ওমর, বসো আমার পাশে, কথা আছে।

ওমরের পাশে চুপচাপ বসে রইল রোহানা।

–আমি চান মিয়ার প্রেসে একটা চাকরি পেয়েছি।

প্রমাদ গুনল রোহানা, সে ভালই জানে, চান মিয়ার প্রেস থেকে কোন খবরের কাগজ অথবা সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা বের হয় না। ভাউচার বিল, ক্যালেন্ডার, আর কিছু স্কুলের পাঠ্য–পুস্তকের নোট বই ছেপে বের হয়।

–কিসের চাকরি? শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল রোহানা।

–প্রুফ রীডারের।

বিস্ফারিত দৃষ্টি রোহানার, সেই দৃষ্টিতে ভোরের বাতাসের বাষ্প জমা হচ্ছে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ওমর। আজ সে কোথায় নেমে এসেছে।

–কাজটা কি তোমার উপযুক্ত?

–উপযুক্ত এবং অনুপযুক্তের এই মুহূর্তে মাপকাঠি কি, তা আমি জানি না। বেগারস হ্যাভ নো চয়েস। সত্যি বলতে কি, কাজটাকে আমি মন্দ বলছিনা।

–আমিই বা মন্দ বলব কেন! শ্লেষ বাজল রোহানার কণ্ঠে।

–আমি তালুকদার সাহেবের বাসা থেকে আগামীকাল ভোরে চলে যাচ্ছি।

–কোথায় যাবে?

–আপাততঃ চান মিয়ার প্রেসে থাকব। খাব বাইরে।

রোহানা জানে, চান মিয়ার প্রেসে বাড়তি ঘর নেই। খুব বড় প্রেসে ছাড়া সাধারনতঃ থাকেও না। ওয়ার্কাররা শিফ্‌ট্‌ ডিউটি করে যে যার মত নিজের বাসায় চলে যায়। ধূলো–বালি, কালি, ছেঁড়া কাগজের স্তূপের মধ্যে কারো থাকার প্রশ্ন ওঠে না। ভেতরের রাগের চাপা কান্না বাইরে আসতে চাচ্ছে। রোহানা আসতে দিচ্ছে না। বলল, বাসা থেকে চান মিয়ার প্রেস দূরে না?

www.pathagar.com

–তালুকদার সাহেবকে তো মাস মাস দু'শো টাকা দিতে হচ্ছে।

রোহানার কাছে অর্থটা খুব পরিষ্কার যে ওমর তার খাওয়া পড়ার দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছে।

ওমর উঠে পড়ে বলল, রাত বাড়ছে, যাই।

–এসো।

–শোনো। রোহানা পিছন থেকে ডাক দিল। ফিরে তাকাল ওমর।

–তুমি যে দর্শন পত্রিকায় কাজ কর, তার জন্য কিছু পারিশ্রমিক নেবে?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ওমর। মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, ইচ্ছে হয় দিয়ো।

ওমর চলে গেল। শোবার ঘরে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল রোহানা, যুদ্ধ তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তাদের ভালবাসায় যেন বিপরীত স্রোতের টান ধরেছে। এটা কি সত্যি ভাঙ্গন। নাকি দুঃখের উপর দুঃখ চাপানো?

দর্শন পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা বের হলো। চট্টগ্রামে প্রথম বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদির সংঘবদ্ধ আক্রমণ শেষ পর্যন্ত টেকেনি। আধুনিক ট্যাংক এবং কামান গোলা বারুদের ব্যবহারে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা রাইফেল এবং তিন ইঞ্চি মর্টারের আক্রমণ কার্যকর হয়নি। কিন্তু এ্যামবুশ করে বহু পাক সেনাকে হতাহত করেছে মুক্তিবাহিনী।

মুখে হাসি ছড়িয়ে হঠাৎ মেজর ওয়াসিম এসে উপস্থিত, মিস চৌধুরী, তোমার পত্রিকার খবর বেশ চমৎকার। আমাদের সাফল্যকে ভালভাবে তুলে ধরেছ।

–আমি কারো সাফল্য ফলাও করে তুলে ধরিনি।

–যা প্রকৃত ঘটনা তাই লিখেছি। আমার পত্রিকার মটো হলো, সততার সঙ্গে বাস্তব ঘটনা তুলে ধরা।

–কথা একই হলো।

–না মেজর, যখন তোমরা পরাজিত হবে, তখন সেই ঘটনাই পত্রিকায় আসবে।

–তুমি তা লিখতে পারবে না। তোমার পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এমন কি তোমার স্কুলের চাকরিটাও থাকবে না।

–আমি এমনিতেই রেজিগনেশন দেব।

–হোয়াট? এখন চাকরি ছাড়লে সন্দেহভাজনদের লিস্টে তোমার নাম উঠে যাবে। চাকরি ছেড়ে দলে দলে তোমাদের বাঙ্গালী অফিসাররা ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে।

–তোমরা আমাকে এ ভাবে বিরক্ত করলে আমি চাকরি ছেড়েই দেব। তোমাদের সন্দেহের তোয়াক্কা করব না। তবে বর্ডার পার হবো না। আমার দেশে যাই ঘটুক না কেন এখানে বসেই মোকাবেলা করব।

মেজর ওয়াসিম বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, গুড। মহিলা হলেও তোমার

www.pathagar.com

সাহস আছে। আর তোমার বাঙ্গালী ভাইরা ওদেশে গিয়ে ওদের হাতের পুতুল বনে গেছে। ধ্বংসযজ্ঞ ওখান থেকেই চালাবে।

কথাগুলো অস্পষ্ট হলেও কান এড়াল না রোহানা চৌধুরীর। প্রতিবাদ করলে ঘৃতে আগুন জ্বলবে। ওদের এখন মেজাজের ঠিক নেই। ভৈরব ব্রীজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। রেলপথ পূবের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যুদ্ধের ভারি সরঞ্জাম পাক সৈন্যরা রেল পথেই নিচ্ছিল। এখন ওদের ভরসা শুধু বাস রুট।

–উইশ ইউ গুড লাক মিস চৌধুরী। চাকরিটা এখন ছেড়ো না। আসি।

রোহানা চুপ করে রইল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রোহানা। ওমরের কথা জিজ্ঞেস করেননি মেজর, উত্তেজনায় ভুলে গেছেন। এক রকম বাঁচোয়া। চাকরি সে ছাড়বেই। পত্রিকা নিয়েও হিমশিম খাচ্ছে রোহানা চৌধুরী। দেশের রেডিও–টেলিভিশন সরকার নিয়ন্ত্রিত। এসবের খবর থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্বল বি বি সি এবং ভোয়া। এতেও তৃপ্তি নেই। খবর সংগ্রহের জন্য জেলা প্রতিনিধি রাখবে, এমন আর্থিক সামর্থ নেই রোহানা চৌধুরীর। নিজের অপারেশন সাইটে যাওয়ার অনেক বিপত্তি। তাহলে? এদিকে ওমরের কথাও ভাবছে। আজ যদি সে নিজে ওমরের অবস্থায় পড়ত কি করত সে? বিয়ে হয়নি। তাহলে কি সে ওমর বাটের গলগ্রহ হতো? অভিমান চোখের পানিতে ধুয়ে গেল। সে বিছানা থেকে নামল। আলমারি খুলল। কাপড় বদলাবে, এমন সময় সাবিহা চৌধুরীর প্রবেশ, এই ভর দুপুরে কোথায় যাচ্ছিস মা?

–ওমরের ওখানে।

–ছেলেটা কতদিন আসে না।

–কাজে ব্যস্ত।

–কি এমন কাজ?

–ও একটা চাকরি নিয়েছে। কি চাকরি, জিজ্ঞেস করো না। মনে দুঃখ পাবে।

–বিয়ে করে তোরা দু'জনে বিদেশে চলে গেলেই পারিস, এত সমস্যা থাকে না।

–ওমর নিজের দেশেই চলে যেতে পারে, ওর বাবা–মার কাছে। একমাত্র ছেলে ওঁদের। কত আদরের।

–তাহলে তোরা পাকিস্তানেই চলে যা।

–রোহানা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল, তুমি এমন কথা বলতে পারলে মা? তুমি জান, নিজের দেশ ছেড়ে আমি কোথায়ও যাচ্ছি না।

–সাধে কি বলি মা? যুদ্ধ তীব্র হচ্ছে। কখন কি হয়?

–দশ জনের যা হয় আমারো তাই হবে। হিযরত করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়? এ দেশটা আমার। সমস্যাটাও আমার। আমি আমার নিজস্ব পথে এর সমাধান করব। পরের বুদ্ধিতে কি সব সমস্যার সমাধান হয়?

www.pathagar.com

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন সাবিহা।

ড্রেস শেষ হতেই সাবিহা বললেন, খেয়ে যা। টেবিলে খাবার দেয়া আছে।

–না মা, ইচ্ছে করছে না।

–কেন, রে?

–ওমর যে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে জানি না মা। দরজাটা তুমি লাগিয়ে দাও।

–ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আসিস। আমি অপেক্ষা করব।

রোহানা আধা ভেজানো দরজায় হাত রেখে বলল, ও আজ আসবে না। রাতে ওর ডিউটি আছে। তুমি খেয়ে নিয়ো। তোমাকে কথা দিচ্ছি, ওমরকে নিয়ে আমি যে কোন রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেব।

যা ভেবেছিল রোহানা তাই। গুদাম ঘর, রীম রীম কাগজ জমা আছে, ফেলে দেয়া ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো টাইপ, কাঠের র‍্যাক, ছেঁড়া কাগজ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছে ওমর। চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। খোলা দরজায় হাত রেখে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল রোহানা চৌধুরী। তার বুক ব্যথায় ভারি হয়ে যাচ্ছে, চোখ ঝাপসা। কিন্তু সে কাঁদবে না। কান্নাকাটি ওমর পছন্দ করে না। সোজাসুজি বলে, ছিঁচকাঁদুনে মেয়েদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু ভালবাসার পাত্রটিকে কষ্ট পেতে দেখলে মেয়েদের বুক ও চোখ ফেটে যে পানি আসে, সেই পানির লবণাক্ততা যদি টের পেত কোন পুরুষ প্রেমিক, তাহলে বোধ হয় ওমর এমন কথা বলত না। ওমরের মত তার হৃদয়ানুভূতিকে এমনভাবে আর কেউ উপলব্ধি করেনি। তবু সে কান্না পছন্দ করে না। ওমর বলে, কান্না দুঃখকে ভাসিয়ে নেয়। দুঃখ যত বুকের ভেতরে জমা হয়, তত গাঢ় হয় ভালবাসা।

ছেঁড়া কাগজে হয়তো খস খস শব্দ হয়ে থাকবে। ওমর চোখ না মেলেই জিজ্ঞেস করল, কে?

–আমি।

–আমি কে? আমি বলে আমার কেউ নেই।

–রোহানা।

বিছানায় উঠে বসল ওমর, তুমি!

রোহানা হাঁটু গেড়ে বসল ওমরের পাশে। ওমর আজ আর কোন বাধা মানল না। রোহানারকে তীব্রভাবে বুকে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিল। বারবার বলতে লাগল, আমার ভালবাসা যদি আমার ধর্মে পাপ হয়, তাহলে এ পাপ আমার। তুমি পবিত্র, শুভ্র, নির্মল। চিরদিন তুমি তাই ছিলে, আজো তুমি তাই আছো।

রোহানা ওমর বাটের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। দু'জনের চোখের পানিতে ভিজতে লাগল জীর্ণ মাদুর। আজ আর কেউ কাউকে ছিঁচকাঁদুনে বলে ঠাট্টা করল না।

www.pathagar.com

ওমরকে নিয়ে টিকাটুলির এক গলির রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেতে গেল রোহানা। পরিবেশ ভাল না, নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় ভাল রেস্টুরেন্ট খোঁজার উৎসাহ নেই কারোর। ওমর সান্ত্বনা দিল, রেস্টুরেন্টটা নতুন খোলা হয়েছে। রান্নাবান্না ভালই হবে।

ভাত, ডাল, খাসির গোস্তের অর্ডার দিল রোহানা। চিকেন শেষ হয়ে গেছে।

একজন পাকসেনা এসে ঢুকল রেস্টুরেন্টে। সঙ্গে রাইফেল। কাস্টমাররা সঙ্গে সঙ্গে চুপ। অস্বাভাবিক নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। সৈন্যটি চেয়ারে বসে টেবিলের এক পাশে রাইফেলটি খাড়া করে রাখল। খাবারের অর্ডার দিল, রোটি অওর মাটন।

সবার আগে তাকেই খাবার পরিবেশন করা হলো। সৈন্যটি খাবারে সবেমাত্র হাত লাগিয়েছে, ম্যানেজার চেঁচিয়ে বলল, রুই মাছের ল্যাজা সরিয়ে ফ্যাল। মুড়োটার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

জোয়ান তাগড়া এক বেয়ারার এক গ্লাস পানি এনে সৈন্যটির টেবিলে রাখল। চোখের পলকে রাইফেলটি হাতে তুলে নিয়ে তার বাট দিয়ে প্রচন্ড আঘাত হানল সৈন্যটির মাথায়। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তখনো তার হাতে ধরা রয়েছে গোস্তের ছোট একটা টুকরো। সৈন্যটির অচেতন দেহটাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে যোয়ান ছেলেটি ভেতরের দিকে নিয়ে গেল।

দুপুরের শেষের দিকে রেস্টুরেন্টে খুব কম কাস্টমার ছিল। সবাই আতঙ্কিত হয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। প্রত্যেক টেবিলে অভুক্ত খাবার। ম্যানেজার হাসতে হাসতে বলল, কাজটা বেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিস রমজান। হেড কোয়ার্টার্স থেকে তোর ইনাম প্রাপ্য। বাকী কাজটুকুও শেষ করে ফ্যাল।

–অলরেডি শ্যাষ কর্তা।

–সাবাশ বেটা। রাইফেলটা মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে জমা দিয়ে দিস। দেহটা ফেলার জন্য বুড়িগঙ্গা নদীই যথেষ্ট।

হতভম্ব রোহানা এবং ওমরের দিকে নজর পড়তেই ম্যানেজার চেঁচাল, এই যে এখনো ভাগেন নি কেন আপনারা? মতলব কি? কিছু ফাঁস করার ইচ্ছে থাকলে ল্যাজেগোবরে করে মারব আপনাদের, চর নয়তো?

রোহানার মুখ লাল, ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমরা তো বাঙ্গালীই। না জেনে শত্রুপক্ষ ভেবে যাচ্ছেতাই বলতে লজ্জা করছে না আপনার?

–তাহলে অত করে দেখছেন কি?

–সবাই কি ভয় পায়? ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছি। বিশেষ করে আপনার সাঙ্কেতিক কথাগুলো।

–আপনারা কে?

–দু'জনেই সাংবাদিক।

www.pathagar.com

–তা কিছু লেখার ইচ্ছে আছে?

–ঘটনাটা লেখার ইচ্ছে আছে। জড়িত ব্যক্তিদের নাম ধাম না।

–সাবাশ আপামনি।

ওমর মুখ খুলল, একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনি যে এমন কান্ড করলেন, অবস্থা সামলাবেন কেমন করে?

হো হো হাসি ম্যানেজারের, আরে সাদেকখান এত কাঁচা লোক না। এটা একটা টেম্পোরারি রেস্টুরেন্ট। বলতে পারেন, ইঁদুর ধরার কল। ইদুঁর ফাঁদে পড়েছে। কল এখন সরিয়ে ফেলব। এখুনি লাপাত্তা হয়ে যাব আমরা।

–তাই বলুন। আপনারা তাহলে মুক্তিযোদ্ধা?

–এত দেরিতে বুঝলেন? দেখুন না, আমাদের ছেলেদের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নেই। আদ্যিকালের দুনলা বন্দুক, আর ঘরে তৈরি বোমা। এই দিয়ে কয়দিন চালাব? তাই আমরা মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চাই। ওদের মেরে অস্ত্র হাতাতে চাই। আবার সেই অস্ত্র দিয়েই ওদের ঘায়েল করতে চাই। এভাবেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন না বাইরে থেকে সাহায্য পাচ্ছি।

–এবার তাহলে উঠি।

–হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করুন। ওরা এসে পড়ল বলে। ওর সঙ্গীসাথীরা নিশ্চয়ই ধারে কাছে আছে। এসে পড়লে যাকে সামনে পাবে তাকেই গুলী করে মারবে। সাংবাদিক বলে খাতির করবে না।

–জানি, বলে রোহানা এবং ওমর উঠে পড়ল। খাবারে হাতই লাগায়নি।

–অন্য কোন রেস্টুরেন্টে যাবে?

–না, রোহানার উত্তর।

তার তখনো অচেতন এবং আহত সৈন্যটির হাতে ধরা গোস্তের টুকরোর দৃশ্য মনে পড়ছে। হয়তো তাকে জবাই করা হয়েছে। তখনো তার হাতে গোস্তের টুকরোটি।

–ওমর, আমার কেমন গা গোলাচ্ছে। ঘরে চলো।

পথে বিষণ্ন ওমরের ইচ্ছে হলো, সেদিনের সেই বিহারী ছেলেটির অপমৃত্যুর ঘটনা খুলে বলে রোহানাকে। লাভ কি? শুধু মনে মনে বলল, তুমি তো তাজা রক্ত দেখোনি রোহানা। দ্যাখোনি কেমন করে একটা সুস্থ সবল দেহ মুহূর্তের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। অস্তিত্বের শেষ গগনবিদারী কান্না খাবি খেতে খেতে মিশে যায় বাতাসে। আর তার অনুরণন তোমার ওমরের দেহমনকে দিনরাত কুরে কুরে খায় দুঃসহ যন্ত্রণায়।

প্রেসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দূরাগত শব্দের ঢেউ ভেসে আসতে লাগল ওদের কানে। দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। ওদিকে তাকাতেই দেখল, আগুনের লেলিহান শিখা পিরামিডের চূড়ার মত উপরের দিকে উঠছে। তার সঙ্গে ধোঁয়া। ধোঁয়ার কুন্ডলির মধ্যে অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশিত করে তুলছে প্রজ্জলিত তীক্ষ্নতার

www.pathagar.com

মত, যার অবয়বে শুধু পিচকারির রংয়ের মত লাল আর লাল।

অস্পষ্ট কোলাহল, অগ্নিশিখার লোহিত রূপের ভয়াবহতার মধ্যে গুলীর প্রচন্ড শব্দ। রোহানা, ওমর দু'জনেই বুঝল, পাক সেনারা তাদের সাথীর হত্যাকান্ড টের পেয়েছে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রেস্টুরেন্টে। আর এলোপাতাড়ি গুলী করছে।

খবরটা খুব সাবধানে প্রকাশ করল রোহানা 'দর্শন' পত্রিকায়। একজন পাকসেনার মৃতদেহ পাওয়া গেছে আগমন রেস্টুরেন্টে। আগুনে ভষ্মীভূত হয়েছে রেস্টুরেন্ট। এলোপাতাড়ি গুলীর শব্দ শোনা গেছে। কিছু পথচারি আহত।

–ওমর, আমি বোধহয় পত্রিকাটা চালাতে পারব না।

রোহানার আক্ষেপ শুনল ওমর, কেন বল তো?

–ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, এভাবে খবর প্রকাশ করা যায় না। আমার বিবেকে বাঁধছে। জান, ওরা বোধ হয় মৃত দেহটা নদীতে ফেলার সময় পায়নি। তার আগেই আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে।

–আমারো তাই মনে হয়। অত কথা তোমার লেখার দরকার কি? তুমি দু'দলেরই টার্গেট হয়ে যাবে। পত্রিকাটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

–আমিও তাই ভাবি।

–তুমি বরং চাকরিটা মনোযোগ দিয়ে কর। পত্রিকার সাইড আমি দেখি।

–চাকরি আমি ছেড়ে দেবই।

–কেন বল তো?

–রোজ মিলিটারিরা আসবে, নানা রকম প্রশ্ন করবে, লোভ দেখাবে, এদিকে মুক্তিরাও শাসাবে স্কুল চলছে বলে, এসব আমার ভাল লাগে না ওমর। তা ছাড়া তোমার খরচ বহনের দায়িত্বও নেই।

–এতকাল কি সে জন্যই চাকরি করেছ?

–তা হয়তো নয়। কিন্তু কেউ আমাকে সন্দেহ করবে, এই ব্যাপারটাই আমি সহ্য করতে পারি না।

–সময়টা বড় সঙ্কটময়।

–ঠিক বলেছ ওমর। যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পড়েছি, চোখে দেখিনি। আজ যখন দেখছি, তখন এর বিচার বিশ্লেষণ করে আগামী প্রজন্মের জন্য ইতিহাস তৈরি করে যাওয়া উচিত। দেশের ভেতরে যারা থাকছে তাদের ভোগান্তি বেশি। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে উপলব্ধি যে অনেক বিস্তৃত, গভীর এবং গাঢ় হবে, একথা মিথ্যে না। তবে আমি আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করবে না। এই বাঙ্গালী জাতির জীবনে এত ভুল-ভ্রান্তি যে তার হিসেব-নিকেশ নেই। বারবার স্বাধীনতা পায়, বারবার স্বাধীনতা হারায়। ধরে রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

www.pathagar.com

রেজিগনেশন লেটার লেখা শেষ। উপরে পাঠাবে, এমন সময় একটা কান্ড ঘটে গেল। দিন দুপুরে বোমা ফাটল স্কুলে। ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল অনেক কক্ষ, আসবাবপত্র এবং মূল্যবান কাগজপত্র। কি করে যে সে নিজে বেঁচে গেল, সেও এক আশ্চর্য ঘটনা। ওমরের কিছু জিনিসপত্র পড়ে ছিল জয়নালের ঘরে। সেসবের খোঁজ নিতে গিয়েছিল। বেশ কিছু কাপড় চোপর, শেভিং সরঞ্জাম, ইত্যাদির অভাবে ওমর অসুবিধা পোয়াচ্ছে। রোহানা বলছিল জয়নালকে, জিনিসগুলো তুমি গুছিয়ে রেখো, স্কুল শেষ করে আমি বাড়ি ফেরার পথে নিয়ে যাব। এমন সময় বোমা বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ। তার অফিস কক্ষটিই টার্গেট ছিল। রোহানা চৌধুরীকেই মেরে ফেলা উদ্দেশ্য। পাশের দু'টো কক্ষও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। একটা সায়েন্স ল্যাবরেটরি, অন্যটি হোম ইকনোমিক্স রুম। উপরে মেয়েরা নিরাপদ। নিচ তলায় ক্লাস হয় না, তাই রক্ষে। খুব স্পষ্ট, মেয়েদের ক্ষতি করা উদ্দেশ্য না। স্কুল যাতে না চলে, তাই এই ভীতির সৃষ্টি।

রোহানা হতভম্ব। থানায় জি.ডি করা যাবে না। নিজের দেশের ছেলেদের বিরুদ্ধে কাজ করা যাবে না। ওরা ক্ষেপে আছে পাক সেনাদের উপর। অথচ স্কুলটা পাবলিক প্রপার্টি। প্রবীণ শিক্ষক আনসার সাহেব, তাকেই ডাকল রোহানা চৌধুরী।

–বলুন ম্যাডাম।

–ছাত্রীদের কিছু অভিভাবককে ডেকে আনুন। তাঁরা অন্তত সাক্ষী থাকুন এই ক্ষয়ক্ষতির। স্কুলটা জনসাধারণের দানে গড়ে উঠেছে। সরকারেরও অনুদান আছে। তাঁদের ব্যাপারটা জানা থাকা দরকার।

–ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, এখুনি যাচ্ছি।

অনেক অভিভাবক আসলেন, দেখলেন, কিছু বললেন না। একজন মধ্য বয়স্ক অভিভাবক বললেন, কোনো স্কুল কলেজে বোমা ফেলা হলো না, এ স্কুলে ফেলা হলো কেন?

–জানি না, রোহানার উত্তর।

–ম্যাডাম, আপনি পাক আর্মি অফিসারদের সঙ্গে বেশি রকম মাখামাখি করেছেন।

–কথাটা ঠিক নয় মতিলাল বাবু, ওরা সব স্কুল কলেজেই যান।

–যায় কিন্তু এতক্ষণ থাকে না।

–ওরা দশ মিনিটের বেশি এখানে কোনদিন থাকেন নি।

–ঘড়ি ধরে ইন্টারভিউ দেন ম্যাডাম?

–আপনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মতিলাল বাবু।

–সত্যি কথা বললে অভদ্রতা হয়? নীতি বিবর্জিত কাজ করলে অভদ্রতা হয় না?

–আমি কোন নীতি বিগর্হিত কাজ করিনি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, দশপ্রেম শুধু আপনার কাছেই ইজারা দেয়া হয়েছে। আমরা এ দেশের কেউ নই। এ দশে আমরা জন্মাইনি, এ দেশকে আমরা ভালোবাসি না? আমাকে দেশপ্রেম শেখাতে

www.pathagar.com

হবে না, আপনি এখন যান।

অন্যান্য অভিভাবকরা মুখ খুললেন, মতিলাল বাবু আপনি বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ম্যাডামকে আমরা চিনি। আপনার এখন চলে যাওয়াই ভাল।

মতিলাল বাবু গম্ভীর মুখে স্কুল কম্পাউন্ড ত্যাগ করলেন।

মহীউদ্দিন সাহেব বয়স্ক লোক, বললেন, মা, আমরা জানি, এ স্কুলটা আপনার হাতে তিল তিল করে তৈরি। এর প্রতি আপনার কত দরদ। আপনি কখনো এর ক্ষতি চাইতে পারেন না।

রোহানার চোখ ছলছল।

–আপনি ভাববেন না মা। যুদ্ধের সময় এমন হয়। আপনি প্রাণে বেঁচেছেন এই–ই ঢের। যুদ্ধ শেষ হোক। আমরা চাঁদা তুলে আপনার স্কুল ঠিক করে দেব।

–ধন্যবাদ।

–আপনি এখন বাসায় যান মা।

–পরে যাই। ধ্বংসস্তূপ থেকে যদি কিছু ইকুইপমেন্ট উদ্ধার করা যায়।

–তাহলে আমরা আসি মা।

–আসুন।

রোহানা চৌধুরী বাসায় যায়নি। পিয়ন–আয়াদের নিয়ে যতটুকু ইট–কাঠ সরানো যাচ্ছে, সরাচ্ছে, কোন জিনিস আস্ত নেই। পন্ডশ্রম। ক্লান্তভাবে বারান্দায় বসে রইল রোহানা। এমন সময়ে মিলিটারি জীপ এসে থামল স্কুলের গেটে। মেজর ওয়াসিম নামলেন। রোহানা উদ্বিগ্ন। এ যেন দু'মুখ ধারওয়ালা পরিস্থিতি।

–মিস চৌধুরী, তোমার স্কুলে নাকি বোমাবাজি হয়েছে?

–দেখতেই তো পাচ্ছ।

–কে এ কাজ করেছে বলে তোমার সন্দেহ হয়?

–জানি না।

–স্কুলে কাউকে ঢুকতে দেখেছ, কোন আউটসাইডারকে?

–না।

–তোমার স্টাফের মধ্যে কেউ এ কাজ করেছে বলে মনে হয়?

বিরক্ত রোহানা, কি যে বল? ওরা সবাই স্কুলটাকে ভালোবাসে।

–তার মানে তুমি কিছুই বলতে চাও না।

–সন্দেহ করে নিরপরাধ লোকের উপর দোষ চাপানো ঠিক না।

–ও কে লেডি, তোমার কথা মেনে নিলাম।

দু'পক্ষই কিছুক্ষণ চুপচাপ। মেজর ওয়াসিমের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর, তদন্তের ভার আমার ওপর ছিল। করে গেলাম। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

রোহানা চুপ।

www.pathagar.com

–কেন আসব না, জিজ্ঞেস করলে না?

–তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করা বিপজ্জনক। সবকিছুই সিক্রেট।

–আমি চলে যাচ্ছি।

–দেশে যাচ্ছ ভালই তো।

–আরে না। ফ্রন্টে যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। তোমাদের ভাইদের সঙ্গে এবার সামনা–সামনি মোকাবেলা হবে।

রোহানা চুপ।

–এই যে কিলিং মুসলিম্‌স্‌ বাই মুসলিম্‌স্‌, এটা দুঃখজনক।

রোহানা চৌধুরীর ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, দায়ী কে? কিছু না বলে চুপ করে রইল।

–তুমি ইতিহাসের নানা যুদ্ধের কথা পড়েছ?

–হ্যাঁ।

–যুদ্ধে যাওয়ার আগে পুত্র মা–বাবাকে সালাম করে দোয়া চাইত। স্বামী চাইত তার বঁধূর কাছে। এখানে আমাদের কেউ নেই। নিজের দেশে এখন পরদেশী। তাই তোমার কথা মনে হলো।

–ধন্যবাদ মেজর।

–আমাকে দোয়া করবে না?

–আমরা তো পরস্পর শত্রুপক্ষ। দোয়া চাইছ কেন?

হো হো করে হেসে উঠলেন মেজর ওয়াসিম, হাসি থামিয়ে বললেন, আমাকে দোয়া করলে তোমার বাঙ্গালী ভাইরা বেহেস্তে যাবে না?

রোহানা চুপ।

–জান, যে কোন মুসলমান যে কোন মুসলমানকে দোয়া করতে পারে। এতে কোন নিষেধ নেই।

–হবে হয়তো।

–মিস চৌধুরী, একটা কথা মনে রেখো, ইদুঁর আনার জন্য যদি কেউ নিজের ঘরে সিঁধ কেটে দেয়, সে ঘর বাঁচে না।

রোহানা নিরুত্তর, বিষয় অন্য দিকে টার্ন নিচ্ছে।

–ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য হলে মিটমাট হওয়ার একদিন না একদিন সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয় পক্ষকে নাক গলাতে দিলে তারা আগুনকে শুধু উস্কেই দেবে, থামতে দেবে না। মেজর ওয়াসিমের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। কিন্তু উত্তর দেয়া ঠিক না।

–দেখো, একদিন যুদ্ধ থেমে যাবে। দু'দেশের নেতারা আবার আসা যাওয়া করবে। শহীদদের প্রতি পরস্পর শ্রদ্ধা জানাবে। সেদিন তুমি আমাকে দোয়া করো।

–যুদ্ধে তুমি মারা যাবে, এমন ভাবছ কেন?

www.pathagar.com

বিষণ্ন হাসলেন মেজর ওয়াসিম, বললেন, এক পক্ষ খতম না হলে অন্য পক্ষের যে জয় হয় না মিস চৌধুরী। আসি তাহলে?

ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বর রোহানা চৌধুরীর, এসো।

ওমর বলল, তুমি এখনো স্কুলে ছুটোছুটি করছ কেন? মেয়েরা তো আর স্কুলে আসে না।

–স্কুলের ক্ষয়ক্ষতির একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করছি। উপরে পাঠাতে হবে। তারপর বিদায়। তবে স্কুলটা শুনছি চালাতেই হবে। অন্য কেউ হয়তো ভার নেবে।

–নিক। তুমি তো শান্তি পাবে।

–না ওমর, শান্তি পাব না। ঘটনাটার জন্য সবাই আমাকে দায়ী করছে।

–মিথ্যেমিথ্যি দায়ী করলে তুমি কি করবে?

–মিথ্যে দুর্নামের ভাগীদার হতে ভাল লাগে না। তাই ভাবছিলাম, আর কিছুদিন থেকে যাব কিনা।

–না, তুমি আর স্কুলে যেতে পারবে না, জোরের সঙ্গে বলল ওমর।

–তুমিই না একদিন স্কুলের কাজটা ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে ছিলে।

–ছিলাম। এখন নেই। তোমার জীবনের বিনিময়ে আমি তোমাকে কোন কাজ করতে দেব না।

–শান্ত হও ওমর। তুমি আমি জীবনের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যেখানে জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, কিংবা পারিবারিক বৃত্তেও সীমাবদ্ধ নয়। বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে যেমন আসে সুখ তেমনি আসে পদে পদে বিপদ।

–স্কুলের কাজটাকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি বলছ?

হেসে ফেলল রোহানা, কত দিন পরে তুমি আমাকে ঠাট্টা করলে। আমার ভাল লাগছে ওমর। আমার লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, আমার পত্রিকা সম্পাদনা, স্কুলের কাজ এসব কিছুই দেশ, জাতি এবং সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একজন মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়েই তার জীবন। সত্তাকে খন্ড খন্ড করে ভাগ করা যায় না। সেভাবে মানুষের বিচারও হয় না।

ওমর গম্ভীর, বলল, বুঝতে পারছি, আমি মরে গেলেও তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার কর্মকান্ড নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে, একথা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি।

–অভিমান করো না ওমর। স্কুলের হিসেব মিলিয়ে দিয়ে আমি ছুটি নেব। একটা কথা মনে রেখো ওমর, একটা কেন্দ্রবিন্দুতে কম্পাস ধরে যতবড় খুশি তুমি বৃত্ত আঁকতে পার। ওমর তোমার প্রেম আমার জীবনে সেই কেন্দ্রবিন্দু। এই বিন্দু যদি হারিয়ে যায়, আমিও হারিয়ে যাব। পৃথিবীর পরিমন্ডলে বৃহৎ বৃত্ত আঁকা আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

–কেন সম্ভব হবে না রোহানা? ঘর ভর্তি জিনিসের মধ্য থেকে একটা জিনিস

www.pathagar.com

হারিয়ে গেলেই কি অন্য জিনিসের অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায়?

–ওমর, ঘরে আলো না থাকলে কোন জিনিসের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। সব কিছুর উপযোগিতা হারিয়ে যায়। তুমি আমাকে ভালোবাস বলেই নিজেকে আমি সব কিছুর মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ ভালবাসা হারিয়ে ফেললে আমি নিজেই অন্ধ এবং অর্থহীন হয়ে যাব। ভালবাসা মানুষের জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি, এ কথা অস্বীকার করতে পার ওমর?

ওমর মাথা নাড়ল, আমি তোমার অনুভূতিকে বিস্ময়কর ভাবে শ্রদ্ধা করি রোহানা।

–রোহানা এখন গভীর আবেগে মগ্ন। চোখে পানি নিয়ে বলল, তুমি আমাকে ভালোবাস বলেই, সব কিছু আমার কাছে এত দীপ্তিময়। ওমর, যে নদীগর্ভে বালির চড়া পড়ে সে নদী কোন প্রান্তর এবং জনপদকে শস্য শ্যামল করে না।

ওমর আবেগপ্রবণ না। কিন্তু রোহানার গভীর ভালবাসা এত অন্তর্লীন যে তার চোখও শুষ্ক রইল না। রোহানার মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল। মনে হলো, এই মুখ যত সে দেখছে তত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মুগ্ধতার গভীর আর্কষণে। সারা জীবন এই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার পিপাসা মিটবে না।

রোহানা চৌধুরী রেজিগনেশন দিতে না দিতেই স্কুল সংলগ্ন বাড়িটায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল রাত্রে। স্কুলের দেয়ালের ওপাশে ছোট একতলা বাড়ি। খুব জমজমাট ছিল একদিন। এডভোকেট নাজমুল হকের বাড়ি। ভদ্রলোক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ইন্ডিয়া চলে গেছেন। বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। জয়নালের কাছে সব খবর শুনল রোহানা। তার রির্পোট অনুযায়ী প্রতি রাতে ঐ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শ সভা বসত। এখান থেকেই অপারেশন চালানো হতো আশেপাশে। পাক আর্মি একদিন খবর পেয়ে গেল। শেষ রাতের দিকে ওরা রেইড করল বাড়িটা। মুক্তিযোদ্ধারা অসতর্ক ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের দলপতি রেজা বলল অন্যান্যদের, তোরা বাইরে চলে যা, আমি একা থাকব ভেতরে।

–তুই কেন একা থাকবি ঘরে?

–বুঝতে পারছি না কেন, ওদের ফাঁদে ফেলে মারতে হবে।

–বুঝলাম না রে।

–আমি ভেতর থেকে গুলী করতে থাকব। ওরা ভাববে, সবাই আছে ঘরে। সুতরাং এদিকেই মনোযোগ দেবে বেশি। তোরা তখন একযোগে পিছন থেকে আক্রমণ করবি। হতচকিত হয়ে সবগুলো পাকসেনা খতম হবে।

–প্ল্যানটা মন্দ না, কিন্তু তুই তো জানে মারা পড়বি। বলল রতন।

–শালা, দেশের জন্যই তো জান দেব, এতে আফসোস কোথায়? পালা শীগগীর। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

–তোরাব বলল, আমি তোমার সঙ্গে থাকব রেজা ভাই।

www.pathagar.com

–বোকামী করিস নে।

–তুমি একা কয়টা গুলী ছুঁড়বে? ওরা টের পেয়ে যাবে। দু'জনে মিলে করলে ওরা কিছু বুঝতে পারবে না। মনে করবে, ঘরে অনেক লোক আছে।

–ঠিক বলেছিস তোরাব, গুলী ভরতেও তো সময় লাগে। এই সময়টা তুই সামলাতে পারবি। কিন্তু তোরাব, তোর মোটে পনের বছর বয়স, স্কুলের ছাত্র। সমস্ত জীবনটা তোর সামনেই পড়ে আছে।

–রেজা ভাই, সে জন্যই তো আফসোস নেই। আমার পিছনে মাকে বেশী পয়সা খরচ করতে হয় নি। বাবা নেই একথা সত্য। কিন্তু আমার আরো একটি ভাই আছে। তাকে নিয়ে মা জীবন কাটাতে পারবে। কিন্তু রেজা ভাই, বাপ-দাদার সব সম্পত্তি বিক্রি করে তোমার বাবা তোমাকে ভার্সিটিতে পড়িয়েছেন। এবার তোমার এম-এ ফাইনাল পরীক্ষা। বাড়ির শেষ দুধেল গাই বিক্রি করে তোমার পরীক্ষার ফিসের টাকা পাঠিয়েছেন। তোমার পরিবার সর্বস্বান্ত। তুমি মারা গেলে ওঁরা পথে বসবেন রেজা ভাই।

–এই যুদ্ধে অনেকেই পথে বসবে তোরাব। কতজনের প্রিয়জন মারা যাচ্ছে, আরো যাবে। কত জনের বাড়ি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের কথা ভাববি নে? মানুষ সুখে এক। দুঃখে দূরের। কিন্তু জাতির এই দুর্দিনে আমরা দুঃখে এক। সমব্যথী, পরমাত্মীয়। তোরাব, এখনো সময় আছে, পালা।

–না রেজা ভাই। তুমি আমি আজ একই পথের পথিক। দুঃখে এক, মৃত্যুতে এক।

মুহূর্তের জন্য তোরাবকে বুকে জড়িয়ে ধরল রেজা আলী খান। ততক্ষণে গোলাগুলী আরম্ভ হয়ে গেছে। গুরুতর আহত হয়ে যখন দু'জনেই মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, তখন শুনল একটার পর একটা হাত বোমা ফাটার শব্দ। ম্লান হাসি ফুটে উঠল রেজার ঠোঁটে। তোরাব অনেক আগেই মারা গেছে। অনেক কষ্টে ওকে বুকে টেনে নিল রেজা আলী। মৃত্যুতে তারা এক, এটা তোরাবেরই কথা।

রাত্রে মেজর শফি রোহানা চৌধুরীর বাসায় এসে উপস্থিত। ইনি আগেও দু'বার এসেছেন। রোহানা এই অফিসারকে একেবারেই দেখতে পারে না। কিন্তু এখন নিরুপায়। মেজর শফি অনুমতি নিয়ে সোফায় বসলেন।

–মিস চৌধুরী বৈঠ যাইয়ে। আপ্‌কা সাথ বাত হ্যায়।

–সে তো বুঝতেই পারছি। বিনা কারণে তুমি এখানে আসনি।

–তুমি আমার উপর এত নারাজ কেন বল তো? আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করেছি?

রোহানা চুপ।

–যখন তোমার কোন জবাব দেবার ইচ্ছে থাকে না, তখন তুমি চুপ করে থাক।

রোহানা তবু কথা বলল না।

www.pathagar.com

–শোন, তোমার ভালোর জন্যই আমি আজ এসেছি। অনেক আগেই তুমি এ্যারেস্ট হয়ে যেতে।

–কেন?

–গতকাল ভোর রাতে তোমার স্কুল সংলগ্ন বাসায় একটা বড় রকমের অপারেশন হয়েছে জান?

–শুনেছি।

–দুষ্কৃতকারীরা তোমার স্কুলের ভেতর থেকে আমাদের আর্মিদের বোমা এবং মর্টারের গোলা ছুঁড়েছে।

–কি করে জানব? আমি তখন স্কুলে ছিলাম না।

–তুমি স্কুলে থাক আর না থাক, স্কুলের দায়িত্ব তোমার।

–আমি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

–তুমি ওটা মৌখিক ভাবে উপরে জানিয়েছ। তোমার লিখিত রেজিগনেশন লেটার এখনো উপরে পৌছোয়নি।

রোহানা হতবাক। এত খবর এরা রাখে এবং জানে। কেন যে ওমরের কথা সে এতদিন শোনেনি।

–মেজর শফি, কেমন অসহায় শোনাল রোহানার কণ্ঠস্বর, আমি স্বীকার করছি, রেজিগনেশন লেটার ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে আমার পৌছে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু অপারেশনের জন্য আমি কেন দায়ী হতে যাব?

–কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি সন্দেহ করে, তোমার অনুমতি নিয়েই মুক্তিরা এ কাজ করেছে এবং সন্দেহ এড়াবার জন্য তুমি চাকরি ছাড়তে চাচ্ছ।

–দ্যাখো মেজর শফি, কাউকে শাস্তি দিতে হলে তোমাদের লেম এক্সকিউজের অভাব হয় না। বড় বড় যুদ্ধের ইতিহাসে পড়েছি, ফাঁসিতে ঝুলানোর আগে বন্দীদের তাদের দোষের কথা জানিয়ে দেয়া হতো। হয়তো ঐসব দোষের সঙ্গে বন্দীদের কোন সম্পৃক্তিই ছিল না। বিচারের রায়টাই মূখ্য। বন্দীদের দোষ সেখানে গৌণ।

–যুদ্ধের সময় চাক্ষুস সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না মিস চৌধুরী। অবস্থা, পরিবেশ, ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচনা করেই ট্রাইবুনালে বিচার করা হয়।

–তোমার শেষ কথাটা কি মেজর শফি? রোহানার কণ্ঠস্বর সবল এবং বলিষ্ঠ শোনাল।

মেজর শফি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর রোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খুব ভাগ্যবতী মিস চৌধুরী।

–বুঝলাম না।

কেমন উদাসীন কণ্ঠে বললেন মেজর শফি, মেজর ওয়াসিম যুদ্ধে মারা গেছেন।

বিষণ্ন দেখাল রোহানা চৌধুরীর নীরব মুখ।

www.pathagar.com

–কি নারে জাহান্নামা খালেদিনা ফিহান্দ পড়লে না মিস চৌধুরী?

–একজন মৃত মানুষকে নিয়ে তোমার এই পরিহাস খুব মর্মান্তিক মেজর শফি। মেজর ওয়াসিম একজন মুসলমান। তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন। যুদ্ধটা কে বাঁধিয়েছে তার বিচার একদিন ইতিহাস করবে। কিন্তু সত্যিকারের শহীদ কে, তার বিচার স্বয়ং আল্লাহর হাতে।

–বাঃ বেশ হিসেব করে কথা বলতে পার।

–এটা হিসাবের কথা নয়, বিবেকের কথা।

মেজর শফি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, তুমি সত্যি সুন্দর করে কথা বল। মেজর ওয়াসিম এজন্য বোধ হয় তোমাকে খুব পছন্দ করতেন। বলতেন, এ মেয়েটি অন্যদের মত না। এর মনে নীচতা এবং হিংসা নেই। তোমরা ওর কোন ক্ষতি করো না।

একটা নীরবতা বিরাজ করতে লাগল মেজর শফি এবং রোহানা চৌধুরীর মধ্যে।

–মিস রোহানা।

রোহানা তাকাল।

–তোমাকে একটা কথা বলছি। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমরা সবাই বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। কখন পুড়ে ছাই হয়ে যাব ঠিক নেই। এখন আমাদের দয়ামায়া দেখাবার সময় নেই। আজকের মিটিংয়ে তোমার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। অভিযোগ অনেক। তোমাকে শাস্তি দেয়ার কথা আলোচনা হয়েছে। মেজর ওয়াসিম বেঁচে থাকলে কথা ছিল। তিনি নেই। তাছাড়া মৃত মানুষের কথা কে কয়দিন মনে রাখে? কিন্তু আমি তার বন্ধু, কলীগ। তাই তোমাকে বলছি, আজকেই অন্য কোথায়ও চলে যাও। শত্রু ভেবে আমার কথাটা অবজ্ঞা করো না। সুসময় হলে তোমার মত মেয়েকে ভালবাসা যেত। এখন আমরা পরস্পর শত্রুপক্ষ। কিন্তু আমি তোমার হত্যাকারী হতে চাই না। বিদায়।

গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রোহানা। এখান থেকে চলে যেতে হলে মাকে কথাটা জানাতে হবে। ওমরকে তো বলতেই হবে। আজ রাতটা অন্তত সে চিন্তা–ভাবনার জন্য সময় নেবে। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, সেটাও তো প্রস্তুতির বিষয়। ঘরের জিনিসপত্রের কথা সে ভাবে না। কিন্তু বইগুলো তার বড় প্রিয়। নিজের লেখা বই, এবং বিশ্ব সাহিত্যের বাছাই বইগুলো। বাবার হাতের বইগুলো তার প্রিয় স্মৃতি।

সন্ধ্যা থেকে মার জ্বর। সর্দিকাঁশি। কিন্তু মাথা ধরা যন্ত্রণা দিচ্ছে বেশি। এই অবস্থায় মাকে কেমন করে কথাটা বলবে?

–মা আজ রাতে তোমার কাছে শুই?

–কেন মা, তুই তো কারো বিছানায় ঘুমুতে পারিস নে।

www.pathagar.com

–আজ তোমার কাছে শুতে খুব ইচ্ছে করছে মা। ছেলেবেলার মত। তাছাড়া তুমি অসুস্থ। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, তুমি ঘুমোবে।

–তোর কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগছে রে। যদিও আমি এত অসুস্থ নই যে তোর সেবা লাগবে। .... শেষ রাতে প্রচন্ড শব্দে মা মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রোজ রাতেই গুলীর শব্দ শোনে, কিন্তু দূর থেকে, এটা এত কাছের শব্দ যে কানের পর্দা আস্ত আছে কিনা সন্দেহ। রোহানা টর্চ হাতে নিয়ে উঠল।

সাবিহা বললেন, গোয়ার্তুমি করিস নে রোহানা।

–আমাদের বাড়ির কম্পাউন্ডেই বোমা ফেটেছে বলে মনে হচ্ছে। বারুদের ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। আমি সাবধানে যাব আর আসব।

বেশি দূর যেতে হলো না রোহানাকে। পাশের ঘর, যে ঘরে রোহানা শোয়, ধ্বংসস্তূপে পরিনত হয়েছে। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কটু গন্ধ।

–মা, ওঠো, দ্যাখো, ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর রোহানার।

সাবিহা স্তব্ধ। রোহানার শোবার ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। চূন সুরকি, ইট, কাঠ এবং ছাদের দুমড়ানো মোচড়ানো রড নিয়ে ধ্বংসের এক বিশাল স্তূপ। সাবিহা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

–মা এত আপসেট হচ্ছ কেন? কতজনের বাড়িঘর যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

–রোহানা, তুই শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যাচ্ছিস কেন? তোকে মেরে ফেলার জন্য এটা একটা ষড়যন্ত্র।

রোহানা চুপ। মা বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা সহজেই ধরে ফেলেছে। তবু তো স্কুলে বোমা ফেলার ঘটনা মাকে খুলে বলা হয়নি। মাকে সান্ত্বনা দেয়া দরকার। তিনি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। মা, রাখে আল্লাহ্ মারে কে? তা না হলে তোমার অসুখ হবে কেন? আমিই বা তোমার ঘরে শোব কেন?

সাবিহা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ পাক মিলিটারিগুলোর সঙ্গে তোর কিসের এত কথা? ওদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারিস না। ওরাই কি তোকে রেহাই দেবে?

দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলল রোহানা।

–মা, মিলিটারিরা এ কাজ করেনি, করেছে আমাদের ছেলেরাই।

–বলিস কি রে? তুই কি ওদের কোন ক্ষতি করেছিস?

–ছিঃ মা, এ কথা তুমি ভাবতে পারলে? আসল কথা হলো, আমার অবস্থাটা এখন শাঁখের করাতের মত। দু'ধারেই কাটছে। কোন দল আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

– কেন রে?

–মা আমি অন্যান্যদের মত গলা মিলিয়ে কথা বলতে জানি না। আমি আমার বিবেক বুদ্ধি মত নিজস্ব চিন্তাধারায় কথা বলি। এটা কারো পছন্দ নয় মা। চোখে ঠুলি বেঁধে কোন মুক্ত বিবেকের মানুষের কথা বলা উচিত না। ইতিহাস তাহলে আমাকে

www.pathagar.com

ক্ষমা করবে না। এমনকি স্বয়ং আল্লাহপাকও নয়। চল মা, আর কথা না। ঘরে চল।

–ঘর? কিসের ঘর? কোথায় ঘর?

–মা আমি তো বেঁচে আছি।

রোহানাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন সাবিহা। মাকে তৈরি হতে বলে নিকটবর্তী এক দোকানে রোহানা গেল ওমরকে ফোন করতে। ওমরকে পাওয়া গেল না। বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে এল রোহানা। মাকে দূর সম্পর্কের এক খালার বাসায় রেখে রোহানা চলে যাবে ওমরের ওখানে। আজ দুপুরে এখানে ওমরের আসার কথা। তারা থাকবে না। তাছাড়া এ বাড়িতে এলে ওরও বিপদ হতে পারে। বাসায় কোথায়ও মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভীত সন্ত্রস্ত রোহানা। মাকে কি কেউ হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল? শেষ পর্যন্ত মাকে পাওয়া গেল। বাড়ির যে অংশ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে সেখানে উপুড় হয়ে কি যেন খুঁজছেন মা।

–মা এখানে তুমি কি করছ?

বেশ শান্ত কণ্ঠস্বর রোহানার,

–তোর বাবার লেখা বইগুলো খুঁজছি। যদি দু'চারটে পাওয়া যায়।

দুঃখের মধ্যেও বিষণ্ন হাসি ফুটল রোহানার মুখে, মা, আমার বইগুলো খুঁজছ না? আমার লেখা সব বই–ই তো এঘরে ছিল।

–তুই আবার লিখতে পারবি।

রোহানার বলতে ইচ্ছে করল, যদি না বাঁচি? কিন্তু বলল না। দুঃখের উপর দুঃখ চাপিয়ে লাভ কি? তবু এই মুহূর্তে বাবার প্রতি মার ভালবাসার অকৃত্রিম প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হলো রোহানা। জানে, বইয়ের একটা পাতাও পাওয়া যাবে না। যদি পাওয়া যেত মা তা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঝেড়ে মুছে বুকে লুকিয়ে রাখতো।

–মা, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। রেবা খালার ওখানে তোমাকে রেখে আসি।

সাবিহার স্পষ্ট জবাব, আমি কোথায়ও যাব না। একটা ঘর আর বারান্দাটুকু তো অবশিষ্ট আছে।

–মা, অবশিষ্ট ঘর আর বারান্দাটুকুর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, দেয়ালে ফাটল, কড়ি–বর্গা আলগা হয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। তাছাড়া তোমার এখানে থাকার অর্থ কি জানো? আমারো থাকা। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাব না। বারবার দুর্ঘটনা এড়ানো যায় না মা।

সাবিহা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। একটু সময় চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাইতো মা, এতটা ভেবে দেখিনি। তুই–ই তো ওদের টার্গেট। চল তাহলে দেরি করিস না রোহানা, রেডি হয়ে নে, এবার মার তাগিদটাই বেশি।

–আমি রেডি। তুমি কাপড় চোপর কিছু গুছিয়ে নাও।

–সে কি রে, এই কুঁচকানো আটপৌরে শাড়ি পরে তুই বাইরে যাবি?

www.pathagar.com

–মা, আমার কাপড়-চোপর, জিনিসপত্র সব তো আমার শোবার ঘরেই ছিল।

–তাহলে আমার একটা শাড়ি পরে নে।

–তাই দাও।

শাড়ি বাছতে গিয়ে সাবিহার হিমশিম অবস্থা। সব চিকন পাড়ের সাদা জমিনের শাড়ি।

–কি হলো মা, এত দেরি করছ কেন?

–এসব শাড়িতে তোকে মানাবে না।

–এখন কি মানানো না মানানোর সময়?

–তাই বলে বিধবার সাজ সাজবি?

–হাসল রোহানা, কুমারী আর বিধবা প্রায় এক কথা মা।

–ষাট্ বালাই। কি সব বলছিস।

শেষ পর্যন্ত চিকন জড়ি পাড়ের সাদা টাঙ্গাইলের শাড়িই পরল রোহানা।

সাবিহা অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। হাসল রোহানা, মা এদিকে তাকাও। তোমার মেয়ে যদি সুন্দরী হতো, এই শাড়িতেই তাকে চমৎকার মানাত। কালো মেয়েকে যত সুন্দর সাজেই সাজাও না কেন, কালো কি ঘুচবে? অল্প বয়সে তোমাকে তো দেখেছি, সব শাড়িতেই তোমাকে কি চমৎকার মানাত।

–তুই বড় বেশি কথা বলিস, রেগে উঠলেন সাবিহা।

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রোহানা।

রেবা খালার মুখ অন্ধকার, আমরা কোথায় যাব, তাইতো ঠিক নেই রে রোহানা।

রোহানা ঝাঁজিয়ে উঠল, মা কি তোমাদের ঘাড়ে চিরকাল থাকবে? নাকি তাঁর খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে? দু' একটা রাত থাকতে দাও। পরে দেখা যাবে।

–তুই এমন ভাবে কথা বলছিস্ কেন। কোন দিন তো এমন ব্যবহার করিসনি।

–তোমরাও তো কোনদিন এমন ব্যবহার করনি। আমরা তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারিনি বলে কত অভিযোগ ছিল তোমাদের। মনে কর, দু'একদিনের জন্য আমরা বেড়াতেই এসেছি। খাবারটা আমি হোটেল থেকে কিনে নিয়ে আসব।

–এসব কি বলছিস রোহানা? আমরা যা খাব তোরাও তাই খাবি।

–তোমাদের খাওয়া আমাদের মুখে রুচবে না। আমরা ভাল খাব।

–বুঝেছি, তুই খুব রেগে গেছিস। যা ভাল বুঝিস তাই কর।

মাকে পাউরুটি, কলা ইত্যাদি কিনে দিয়ে রোহানা ওমরের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিছু নগদ টাকাও হাতে দিয়ে বলল, কিছু দরকার হলে কিনে নিয়ো। কারো দয়ার উপর নির্ভর করে বসে থেকো না।

www.pathagar.com

রেবা খালার মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে। বলল, এভাবে আমাদের অপমান না করলেও পারতিস।

রোহানা রেবা খালার কথার উত্তর দিল না।

ওমর সব কথা শুনে হতবাক। বলল, চাকরি সেই ছাড়লে, সময় মত ছাড়লেই ভাল হতো।

–জানো, আমি দ্বিধা–দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। ভাবতাম, এ দেশের সম্পদ আমার সম্পদ, দশজনের সম্পদ। এর ক্ষতি কেউ করবে না।

–যুদ্ধের সময় এসব নীতিকথা খাটে না রোহানা। স্কুলটা ওদের টার্গেট ছিল না, ছিলে তুমি। তোমাকে মারতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক কি ক্ষতি হলো না হলো তা কেউ দেখবে না। এটা যুদ্ধের স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট।

–যাক, যা হবার হয়েছে। ভাবছি এবার পত্রিকাটার দিকেই মনোযোগ দেব। তবে এক জায়গায় বোধহয় স্থির হয়ে বাস করা যাবে না। কারণ পাক মিলিটারিদের নেক নজরও আমার দিকে।

–ওমর বলল, তোমার অবস্থা এখন জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ।

–ঠিক বলেছ ওমর। এখন ওঠো, এক জায়গায় যেতে হবে।

–কোথায় যাবে? অভিসারে?

–সে ভাগ্য আর হলো কোথায়? ব্যাংকে যাব। টাকাটা উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাকে খরচা দিতে হবে। আমার নিজেরও তো খরচ আছে। এখন তো আর স্কুলের বেতনের টাকা নেই।

–টাকাটা এখনই খরচ করে ফেললে বিয়েতে কি খরচ করবে?

–আবার ঠাট্টা? দু'টাকায় বকুল ফুলের মালা পাওয়া যায়। দু'টো কিনে ফেলব।

–দু'টো না, একটা কিনবে।

–কেন?

–আমারটা আমি কিনব। আমি বেলি ফুলের মালা ভালোবাসি। তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে ওর গন্ধ আবার আমিই গ্রহণ করব।

–ইস্ তুমি যা বল না।

–কি করব বল? যা বাস্তবে পাওয়া যাচ্ছে না, তা অন্তত কল্পনায় পাই।

–বিয়েতে তোমার কত গরজ, দেখলাম তো।

–আপত্তি আমার ব্যক্তিগত কারণ না, যুদ্ধটাই কারণ।

–ওমর, এই যুদ্ধে জন্ম মৃত্যু কোনটাই বাদ যাবে না। শুধু আমাদের বিয়েটাই বাদ যাবে, কথা বলতে বলতে রোহানার চোখ ভিজে উঠল।

–রোহানা, তুমি কেন কষ্ট পাও। কেন বুঝতে চাও না, আমাদের বিয়েটা শুধু যৌন ব্যাপার না। তোমার ভালবাসা বুকে ধারণ করে আমি যে এই ভুবনটাকেই বদলে

www.pathagar.com

দিতে চেয়েছিলাম।

–ওমর, সাধারণ মানুষের মত ভালোবাসলে দোষ কি?

–দোষ নেই। কিন্তু আমি তোমাকে সেভাবে দেখিনি। ভালবাসার প্রোজ্জ্বল শিখাটা উস্কে দিয়ে আমি যদি জীবনের এক নতুন ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি তাহলে দু'দেশের মানুষের মিলন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

–ওমর, তুমি কি মনে কর এক দেশ সত্যি সত্যি দু'দেশ হয়ে যাবে?

–তুমি বিশ্বাস কর না?

একটু সময় চুপ করে থেকে রোহানা বলল, করি। কারণ মেজরিটি মাস্ট বী গ্রানটেড। মানুষ যখন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়, আল্লাহ তা পূরণ করেন। সেই চাওয়া কতটা যুক্তি'নির্ভর, নাকি শুধু ভাবাবেগ এই মুহূর্তে এসব বিচার করা যায় না। যদি পন্থা সঠিক হয় তার সুফল ভোগ করে জনগণ। যদি ভুল হয়, সেই ভুল প্রকৃতি ক্ষমা করে না, ইতিহাস ক্ষমা করে না, তার মাশুল আগামী প্রজন্মকে দিতে হয়।

ম্যানেজারের কাছে চেক জমা দিল রোহানা। সব টাকাটাই সে উঠিয়ে ফেলবে।

ম্যানেজার অবাক, আপনি কিছু জানেন না?

–কি ব্যাপার?

–এ ব্যাংকের সব টাকাই তো লুট হয়ে গেছে।

–ডাকাতি?

–আরে না। ক্ষমতাধররা ব্যাংকের সব টাঁকা নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। এই টাকা নাকি তারা ওখানে যুদ্ধ ফান্ডে জমা দেবে। আর তাই দিয়ে এদেশে পাক আর্মিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। লকারও সব খালি।

–বলেন কি? ব্যাংকের ম্যানেজার কিছু বলল না?

–বলেনি, তা কি করে ভাবলেন? সবকিছু বন্দুকের নলের মুখে হয়েছে। বেচারার জন্য দুঃখ হয়.। এত ভাল মানুষ ছিলেন ম্যানেজার। পালিয়ে গেলে প্রাণে বেঁচে যেতেন। তা না গিয়ে হেড অফিসে রির্পোট করলেন। তারা জানাল আর্মি হেড কোয়ার্টাসে। সঙ্গে সঙ্গে আর্মি এসে হাজির। বেচারা ম্যানেজারকে ধরে গুলী করে মেরে ফেলল। আর্মির ধারণা, ওদের সঙ্গে ম্যানেজারের যোগসাজস ছিল। সৎ হওয়ার এই তো পুরস্কার।

ওমর এবং রোহানা শূন্য দৃষ্টি নিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। ওমর জিজ্ঞেস করল, আমাদের টাকাটার তাহলে কি হবে?

–তাতো জানি না। ভোল্টে এক পয়সাও নেই।

–তাহলে আপনি এখানে বসে আছেন কেন?

দুঃখের হাসি হেসে জবাব দিল ম্যানেজার, হিসাব মেলাতে। কত টাকা খোয়া গেছে, কত টাকা ছিল, ওপেনিং ব্যালান্স, ক্লোজিং ব্যালান্স ইত্যাদি। কর্তৃপক্ষের হুকুম, কি করব বলুন। সংসারী মানুষ, চাকরি না করে উপায় নেই।

www.pathagar.com

প্রেসে ফিরে এল রোহানা ও ওমর। রোহানা হঠাৎ এক কান্ড করল। ওমরকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল, যা সে কোনদিন করেনি। ওমর বারবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, চুমু খেল, বলল, ছিঃ রোহানা, টাকার শোকে কাঁদতে হয়? তুমি তো কোনদিন এমন ছিলে না।

–ওমর, আমি টাকার শোকে কাঁদছি না, অপমানের ভয়ে কাঁদছি। মার থাকা–খাওয়ার খরচ আমি কিভাবে চালাব?

–রোহানা শান্ত হও। আমার দিকে তাকাও।

রোহানার অশ্রু সিক্ত মুখ ওমর মুছে দিল অনেক মমতা দিয়ে।

–রোহানা, বারবার ভালবাসার পরীক্ষা দেয়া লজ্জার ব্যাপার। আমার প্রেম প্রীতি শুভেচ্ছায় কি কোন ভেজাল আছে?

–ওমর এমন করে বলো না, আমার কষ্ট হয়।

–বেশ, তাহলে শোন, মার সব খরচা আমি দেব।

–কিন্তু তুমি তো আমার কাছ থেকে কোনদিন কোন টাকা পয়সা নাওনি।

–প্রয়োজন হয় নি তাই। মা আমাদের দু'জনের। দায়িত্বও দু'জনের।

–তোমার চলবে কি করে?

–ভালই চলবে। আমি অন্য একটা প্রেসেও শীগ্‌গীর কাজ পাচ্ছি। তোমার খরচার কথা বলতে সাহস পাচ্ছি না রোহানা। তোমার পত্রিকা যদি চলে, তোমার খরচা চলে যাবে। যদি না চলে, তাহলে বলো, ওমর তুমি আমার ভার নাও। সেদিন তোমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলব, তুমি এখানেই আছ, এখানেই থাকবে।

রোহানার চোখ অশ্রুসিক্ত। তবু এই মুহূর্তে বলতে পারল না, ওমর, বিয়েটা সেরে ফেল। কারণ কথাগুলো এখন স্বার্থপরের মত শোনাবে। ওমরের উপর নির্ভরশীলতার ইচ্ছেটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ওমর বারবার নিষেধ করল, টাকাটা যে ওমরের সে কথা মাকে না বলতে। মা শত হলেও প্রাচীনপন্থী মানুষ। ব্যবস্থাটা নাও মেনে নিতে পারেন।

মার হাতে কিছু টাকা দিয়ে রোহানা বলল, মা গয়নাগুলো আমাকে দেবে?

–কেন রে? ওগুলো ঠিকই আছে। তোর রেবা খালার কাছে রেখেছি।

–ছিঃ মা, তোমার লজ্জা করল না? তোমাকে একটু থাকতে দিতেই ওদের কত আপত্তি।

–এখনো তো থাকছি।

–আর থাকবে না। আমি অন্য বাসা ঠিক করেছি।

–কোথায়?

–আমার এক ছাত্রীর মার বাসায়। ভদ্রমহিলা খুব ভাল। সব শুনে বলল, আপনার মা আমারই মা। ওঁকে আমার এখানে নিয়ে আসুন। যত দিন খুশি থাকবেন। এটা

www.pathagar.com

অফিস কাম রেসিডেন্স। দিনে দারোয়ান পাহারায় থাকে, রাতে নাইটগার্ড। অনেকগুলো ঘর খালি। ইচ্ছে করলে আপনিও থাকতে পারেন।

–অনাত্মীয় লোকের বাসায় থাকা কি ঠিক হবে রোহানা?

–মা, ছাত্রীর বাবা একজন ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার। মা গ্রাজুয়েট। মা, রক্তের সম্পর্ক থাকলেই কি মানুষ আপন হয়? অনাত্মীয়ও সুসম্পর্কের জন্য আত্মীয় হতে পারে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন সাবিহা, কি যেন, যা ভাল বুঝিস।

ছাত্রী ঋতুর বাবা মা সাবিহা এবং রোহানাকে খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করল। প্রথম কয়দিন পৃথক রান্নার ব্যবস্থাই করতে দিল না। রোহানা ঘরের ভাড়া দিতে চাইলে ওরা অসন্তুষ্ট, সরকারি কোয়ার্টাসের আবার ভাড়া কি? কেন এটাকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারছেন না?

রাত্রে সাবিহা বললেন, এরা এত ভাল লোক যে চিন্তাই করা যায় না।

–হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ। ওদের মেয়ের টীচার হিসেবে আগেও আমাকে যথেষ্ট সমীহ করত। মা তোমার গয়নাগুলো কি আমাকে দেবে?

–ওগুলো তো তোর জন্যই, এখন নিবি কেন? বিয়ের সময় দেব।

–বিয়ে যদি আমার কোন দিন-না হয়?

–ছিঃ এসব বলতে নেই।

–এমন একটা সময় চলছে, সব ওলট পালট হয়ে গেছে।

–তাতো হয়েছেই। তবু মাথা স্থির রেখে কাজ করতে হবে।

–গয়নাগুলো আমার খুব দরকার মা।

–বুঝেছি, তুই ওগুলো বিক্রি করে দিবি। আমি তোকে তা করতে দেব না।

–বাবা মারা যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, আমি সাবালক হলে ওগুলো আমার হাতে তুলে দিতে।

–সেই অধিকারে তুই ওগুলো দাবি করছিস?

–ছিঃ মা। এমন করে ভাবলে?

–কেন ভাবব না ? ঔটুকুই তো সম্বল।

–বেশ, তুমি ওগুলো আগলে রাখ, আমি আর কোনদিন চাইব না।

–তুই যে আজকাল কি বিশ্রিভাবে কথা বলিস, বলতে বলতে সাবিহা কেঁদে ফেললেন।

রোহানা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, মা সময়টা এমন যে আমরা সেই পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে সেই ভাবেই কথা বলছি। ঠিক আছে মা, তুমি কেঁদোনা, আমি তোমার সেন্টিমেন্ট না বুঝি এমন না। গয়নাগুলো বাবার হাতের জিনিস। ওগুলো হাতছাড়া করতে তোমার মন চায়না। আমার মনে আছে বাবার বইয়ের আলমারিটা তুমি

www.pathagar.com

দু'বেলা ঝেড়েমুছে ঠিক করতে, যদিও তাতে ময়লা জমত না।

কোমল কণ্ঠস্বর সাবিহার, তোর দরকার হলে গয়নাগুলো নিস। ওগুলো নিয়ে তো আমি কবরে যাব না। কিন্তু আমার বড় সাধ, বিয়ের রাতে গয়নাগুলো তোকে পরিয়ে দেখব, তোকে কেমন লাগে দেখতে।

রোহানার ইচ্ছে হলো বলে, সেই রাত আমার জীবনে কি আসবে মা? কিন্তু এসব বলে মার কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি? একটু ম্লান হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে বলল, তোমার শ্যামলা মেয়েকে যতই তুমি সাজাও না কেন, সাধারণ চেহারার মেয়েকে অসাধারণ দেখাবে না মা, যেমন দেখিয়েছিল তোমাকে তোমার বিয়ের রাতে।

–আঃ কি সব বলছিস।

–বাবার কাছে আমি শুনেছি মা। তুমি যে কি সুন্দরী ছিলে।

–তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর রোহানা।

–তুমি আমাকে ভালোবাস বলে এমন মনে হয়।

–মা, তুমি এবং ওমর আমাকে যেভাবে ভালোবাস, এই পৃথিবীতে আর কেউ কোন দিন আমাকে তেমন ভাবে ভালোবাসবে না।

সাবিহা চোখ মুছলেন।

–আচ্ছা মা, পরকালে আবার যদি আমি তোমাকে এবং ওমরকে দেখতে চাই, পেতে চাই, আল্লাহ পাক তা কি মঞ্জুর করবেন?

–পূণ্য থাকলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোর প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। রোহানা, মা আমার, কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে ভুলে যাসনে। তাঁর হুকুম পালন করিস। আর অন্যায়ের সঙ্গে কখনো রফা করিস না, কোন লোভের বিনিময়েই নয়।

–আমি বাবার এবং তোমার উপদেশ কোন দিন ভুলব না মা। এমন কি এই ভয়াবহ যুদ্ধের সময়েও না।

পত্রিকার ভবিষ্যত অনিশ্চিত। অনেক সংখ্যা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। রোহানা চৌধুরীকে ওয়ার্নিংও দেয়া হয়েছে। এরপরে কোর্ট মার্শালে বিচার। হয় জেল, নয় ফাঁসি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতাকে সে খাটো করে দেখে না, এই তার বড় অপরাধ। একথা সত্যি যে পাক আর্মিরা এদেশের সম্পদ তেমন নষ্ট করছে না, কিছু বাড়িঘর পোড়ানো ছাড়া। কিন্তু ব্রীজ, কালভার্ট রেল লাইন ইত্যাদি ধ্বংস করছে মুক্তিযোদ্ধারা, যাতে পাক আর্মির কনভয় চলাচল না করতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের এটাই শ্রেষ্ঠতম কৌশল যে শত্রুদের ফাঁদে ফেলে মেরে ফেলা। যুদ্ধের বিবরণগুলো সে পক্ষপাতশূন্য হয়ে পরিবেশন করছে এটা কোন পক্ষেরই পছন্দ না। ওমর বারবার বলছে, তুমি তোমার দেশের পক্ষে চোখ বুঁজে কাজ করে যাও।

–অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাও।

www.pathagar.com

–তাইতো তোমার জন্য নিরাপদ।

–আমি ভীরু নই যে বিপদের মোকাবেলা করতে ভয় পাব।

–কি বলতে চাও তুমি রোহানা?

–দেশটা কেন ভেঙ্গে যাচ্ছ, কে দায়ী; কারা দায়ী একথা নিয়ে যদি নিরপেক্ষ ইতিহাস তৈরি করে না যাই তাহলে আমি শুধু আমার বিবেকের কাছে দায়ী থাকব না, আগামী প্রজন্মের কাছেও দায়ী থাকব। ওমর বাঙ্গালীদের এত ইতিহাস পড়েও বাঙ্গালী জাতটাকে বোঝা বড় দায়। জাতি হিসাবে বাঙ্গালীরা শঙ্কর। সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, নমঃশূদ্র, বাউরি, বাগদী, চন্ডাল, বৈদ্য, কায়স্থ এমনকি মঙ্গোলীয় এবং দ্রাবিড়দেরও রক্ত আছে বাঙ্গালী জাতির ধমনীতে। হাজার হাজার বছরের জনপ্রবাহের বিয়োজন এবং বিবর্তনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আজকের এই বাঙ্গালী জাতি। কিন্তু এতে হয়েছে কি? সমুদ্রে যখন অনেক নদীর প্রবাহ এসে মিশে তখন এসবের আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। সব মিলেমিশে নবপ্রবাহের বিশাল চেতনার সৃষ্টি করে। যেমন হয়েছে আমেরিকায়। ইউরোপের এমন কোন জাতি নেই যারা আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেনি। কিন্তু এক জাতীয়তাবাদের ঐক্যে তারা একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাদের পৃথক সত্তা, পৃথক সংস্কৃতি, পৃথক ভাষা, সব মিলেমিশে ইতিহাসের ধারায় এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। আমরা কেন তা পারছি না? কেন এত বিভক্তি, কেন এত বিভেদ, কোন্দল, আর কেনই বা বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারণ প্রয়াস নিয়ে এত মাথা ব্যথা?

ওমর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চয়ই তুমি পড়েছ। ভিয়েতনাম স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে দীর্ঘ সতেরো বছর। আলজেরিয়া করেছে চৌদ্দ বছর। তারা বাইরের নৈতিক সমর্থন পেয়েছে এ কথা সত্য। কিন্তু বিদেশী কোন রাষ্ট্র সরাসরি জড়িয়ে পড়েনি। অথচ এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভিন্ন এক রাষ্ট্র কেন সরাসরি নাক গলাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য বোঝা কি সত্যি কষ্টকর? আমাদের দেশের রাজনীতিকরা ভাবছেন, তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হোক শক্তিধরদের সাহায্যে। ক্ষমতার মসনদে তাড়াতাড়ি বসা যাক। কিন্তু পরিনামটা তাঁরা ভাবছেন না। মীর জাফর গদীতে টিকতে পারেনি। মীর কাসেমও না, যদিও তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল অপরিসীম। ওমর, সিঁধ কেটে চোর–ডাকাত ঘরে ঢোকালে তারা খালি হাতে ফিরে যাবে না। সর্বস্ব লুট করবে। এমন কি ভবিষ্যতের জন্যও থলে ভরে রাখার ব্যবস্থা করবে। ওমর, গরীবের ঘরে বড় লোক মেহমান এলে চর্বচূষ্য লেহ্য পেয় সব সে আস্বাদন করে। আর ঘরের ক্ষুধার্ত ন্যাংটো ছেলেগুলো এটো পাতের দিকে তাকিয়ে বুকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপে।

ওমর রোহানার কথাগুলো শুনল গভীর মনোযোগ দিয়ে। বলল, পৃথিবীর সব যুদ্ধবাজরাই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অন্ধ। তাদের দূরদর্শিতা নেই। তারা শুধু ক্ষমতা চায়না, চায় ক্ষমতার দর্প, চায় ক্ষমতার অহঙ্কার। সম্পদের পাহাড়। চায় সুনাম এবং যশ।

–আমার পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে আমি এই কথাগুলো লিখব,

www.pathagar.com

রোহানা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলল।

আঁৎকে উঠল ওমর, রোহানা এমন কাজ করো না। তোমার স্বদেশবাসীরাই তোমাকে পুড়িয়ে মারবে।

বিষণ্ন হাসি রোহানার ঠোঁটে, ওমর, জোয়ান অব আর্ককেও তো পুড়িয়ে মেরেছিল। তাই বলে কি সে সত্যভ্রষ্ট হয়েছিল?

রোহানাকে হঠাৎ বুকে টেনে নিল ওমর। এই স্পর্শ আবেগময় যন্ত্রণার, প্রবল অনুভূতিময় দুঃখের। কাতর কণ্ঠের আবেদন ওমরের, রোহানা, আমি তোমাকে হারাতে চাই না। আমার এদেশে পড়ে থাকার আকর্ষণ তুমি। এ দেশকে ভালবাসার প্রেরণা তুমি। এই যুদ্ধের অপরিসীম দুঃখ ভোগের সহ্যশক্তি তুমি।

রোহানার চোখের পানিতে ওমরের বুক ভিজতে লাগল। বলল রোহানা, ওমর আল্লাহ্ পাক ছাড়া কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। ওমর ভালবাসা কি কোনদিন মরে? ভালবাসা অমর। এই ভালবাসা নিয়েই আত্মা অবিনশ্বর। সে ঐশ্বরিক ভালবাসাই হোক, অথবা এই পৃথিবীর মানুষের ভালবাসাই হোক। ওমর, আমাকে বাধা দিয়ো না। আমার জাতির প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে, আমি তা পরিত্যাগ করতে পারি না। যুগে যুগে যারা মানবতার স্বপক্ষে কথা বলে তারাই নির্যাতিত হয়। তবু মানব দরদী কণ্ঠস্বর থেমে থাকে না। জাতির প্রতি আমার ভালবাসা, তোমার প্রতি ভালবাসা সব নিয়েই আমাকে উদারপন্থী বিপ্লবী হতে দাও।

রোহানাকে মুক্ত করে দিল ওমর। গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বের হয়ে বাইরের ঠান্ডা বাতাসকে উত্তপ্ত করে দিল। রোহানার প্রতি, এই দেশের প্রতি তার দরদ এবং মমতা এমন এক গ্রন্থি যে মৃত্যু ছাড়া এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই।

ঋতুর মা ডলি সরকার একদিন রোহানাকে বলল, এ বাসায় আমরা আর থাকছি না আপা।

–কোথায় যাবেন?

–দেশের বাড়িতে। ঢাকায় যে কোন সময়ে আক্রমণ আরম্ভ হতে পারে। ঋতুর বাবা আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ মনে করছেন না। তাই বলছিলাম ......।

–বুঝতে পেরেছি। আপনাকে আর বলতে হবে না। আমি শীগ্‌গির অন্য ব্যবস্থা করছি।

ওমরের সঙ্গে পরামর্শ করে মাকে তার ভাইয়ের বাড়ি ফরিদপুরে রেখে আসার সিদ্ধান্ত হলো। ওমর বলল, চল আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

–তোমার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

–আমি কি বন্দী এখানে? দেশটা কি আমার জন্য এখন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প?

–মনে কর তাই। সব সময় তোমার জন্য সুসময় হবে এমন ভাব কেন?

www.pathagar.com

রোহানার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরে ওমর বিস্মিত। পরমুহূর্তে গভীরভাবে নীরব। সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যুদ্ধের গতি দ্রুত এবং ভয়ঙ্কর হচ্ছে। এ সময়ে মানুষের মেজাজ-মর্জিও বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক।

-আমি দুঃখিত ওমর। কি পরিমাণে বিহারী এবং পাঞ্জাবী মারা হচ্ছে তুমি কি চোখে দেখতে পাও না? শুনতেও পাও না? সিভিলিয়ান যারা সুযোগ পাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। তুমি তো আমাকে ছেড়ে আবার কোথায়ও যাবে না।

-শুধু এইটুকুই দেখলে?

-তা ছাড়া কি? যে অঞ্চলের লোক তোমাকে আপন ভাবছে না, তুমি তাদের আপন ভাবছ কেন?

-এটা কি জেদাজেদির প্রশ্ন?

-হয়তো না। কিন্তু সময়টা এমন যে এ কথা না ভেবে পারছি না। তুমি যেমন আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছ আমিও তেমনি তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। এই বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিয়ে লাভ কি?

-তাহলে মাকে নিয়ে তুমি একাই যাচ্ছ?

-না, রবার্ট যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

-ভদ্রলোকটি কে?

-ভোয়ার সংবাদদাতা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটা কনফারেন্স ছিল। সব দেশের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। ওঁর সঙ্গে আলাপ হলো। পূরো নাম উইলিয়াম রবার্ট। খুব ভদ্র সজ্জন ব্যক্তিত্ব। কামারখালি মহাসড়কের কাছে পাক আর্মিরা বড় একটা ঘাঁটি করেছে। ওখানে নাকি প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। রবার্ট ওখানে যাবে খবর সংগ্রহ করতে।

-আগাম খবর ভদ্রলোক পেলেন কি করে?

-খবর সংগ্রহ এবং তা সারা পৃথিবীকে জানাবার জন্যই তো ওঁরা এ দেশে এসেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফ্রন্টে যাচ্ছে। ওরা এসব জানবে না?

-তা ঠিক।

-রবার্টের গাড়িতেই যাব। ওর গাড়িতে ওর দেশের পতাকা থাকবে। কিছুটা নিরাপত্তা থাকলেও থাকতে পারে।

-যা ভাল মনে কর।

-ওমর সব কিছুতেই মন খারাপ করো না। আল্লাহ্‌কে ডাক, ভাগ্যকে মেনে নাও।

ওমর নীরব। সে যেন চার দেয়ালে বন্দী। মনটাও দিনে দিনে বন্দী জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ কিছু করার নেই। শুধু ক্ষয়িষ্ণু পাহাড়ের আলগা মাটির মত ধ্বসের চিহ্ন বুকে বহন করছে। যন্ত্রণা যে কি অসীম তা কেউ বুঝবে না।

গাড়িতে ওঠার কিছু আগে রোহানা জিজ্ঞেস করল, মা গয়নাগুলো ঠিকমত

www.pathagar.com

নিয়েছ?

–এই তো, ডলির কাছে যাচ্ছি আনতে। ওর কাছে রেখেছি।

ডলির কাছে সাবিহা গয়নাগুলো চাইতেই বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সে বলল, কিসের গয়না খালাম্মা, বুঝতে পারছি না।

–ঐ যে কিছু দিন আগে আমার জড়োয়া গয়নাগুলো তোমার কাছে রাখতে দিলাম।

–সে কি খালাম্মা, আপনি ভুল করছেন না তো?

সাবিহার কণ্ঠস্বর কাঁপছে, এসব কি বলছ মা? এতগুলো দামী গয়না তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম, আর তুমি বলছ আমি ভুল করছি।

–আপনি কোথায় রেখেছেন খুঁজে দেখুন। অযথা আমাকে বিব্রত করছেন।

সাবিহা জোরেই কেঁদে উঠলেন, রোহানা, বিশ্বাস কর, গয়নাগুলো নিরাপদ থাকবে বলে ওর হাতে আমি তুলে দিয়েছিলাম।

–আপনি বুড়ো মানুষ হয়ে মিথ্যে বলছেন, ছিঃ।

রোহানা এগিয়ে এল, মিসেস সরকার, মাকে ছি নয়, আপনাকেই ছিঃ। আমার মা কখনো মিথ্যে বলেন না। সামান্য কয়টা গয়নার লোভ সামলাতে পারলেন না?

–আমার বাড়িতে বসে আমাকেই অপমান করছেন?

–সত্যি কথা বললে যদি অপমান হয় তবে তাই।

–উপকারীরে দেখছি বাঘে খায়।

–আপনার ব্যাপারে প্রবাদটা উল্টো হবে। ভন্ড উপকারী বিশ্বাসযোগ্য না। মা চলে এসো। গয়না এ ভদ্রমহিলা তোমাকে ফেরৎ দেবে না। কয়দিন এখানে থেকেছ, সেই দেনার ঋণ শোধ মনে কর।

–তাই বলে এতগুলো গয়না?

–মা, কথা বাড়িয়ো না, চলে এসো।

সাবিহার ফোঁপানির শব্দ গাড়ির শব্দকেও ছাপিয়ে উচ্চকিত হচ্ছিল। রবার্ট জিজ্ঞেস করল, হোয়াট ইজ রং উইথ হার?

–মন খারাপ।

–হোয়াই?

–চেনা পরিচিত জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে, তাই। মাই মাম ইজ ভেরি হোম সিক।

–রিয়েলি সো?

–ইয়েস।

রর্বাট নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। তার সব দিকে নজর। কোন পক্ষ যে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে?

www.pathagar.com

রোহানা বলল, মা চুপ কর। কান্না থামাও। রবার্ট কি মনে করছে।

–আমি তোকে পথের ভিখিরি করলাম। আমার দোষেই গয়নাগুলো গেল।

–তোমার দোষে নয় মা, আমার দোষে। রেবা খালার বাসা থেকে তোমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এলাম। আর যা হোক, রেবা খালা অন্তত গয়নাগুলো আত্মসাৎ করত না।

–কে জানত এমন হবে। এমন ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাল।

–অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। সময়টাও এমন যে ভাল মানুষ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মা, আমরা একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। ভালমন্দ এখন আর আগের মানদন্ডে বিচার করা যায় না।

আরিচা ঘাট হয়ে ফেরি পার হয়ে দৌলতদিয়া ঘাট থেকে ফরিদপুর যাওয়া কত সহজ। কিন্তু ও পথে যাবে না রবার্ট। একটা বিপজ্জনক রুট ধরে সে এগুচ্ছে। রোহানাকেও সাংবাদিক হিসেবেই চেনে রবার্ট। দু'জনেরই যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু মাকে নিয়েই রোহানার দুশ্চিন্তা। বেচারাকে এই সঙ্কটময় পথে নিয়ে আসা ঠিক হলো না। কামারখালি মহাসড়কের কাছেই ধোপা ডাঙ্গা চানপুরে পাক সেনাদের ঘাঁটি। যেখানে এদের অবস্থান, সে জায়গাটাই মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। দু' পাশে পাট ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে আধা কাঁচা আধা পাকা রাস্তা। অবস্থানটা মুক্তিযোদ্ধাদের এ্যামবুশ করার উপযুক্ত। একটা পাটগাছ দুলে উঠতে দেখলেও রোহানার বুকের মধ্যে ধরফড় শব্দ। কিন্তু মাকে কোন কিছুই বুঝতে দেয়া চলবে না। রবার্ট নিঃশঙ্কচিত্ত। খুব নিম্ন স্বরে রোহানার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছে। বলছে, তুমি পেছন দিকে খেয়াল রাখো। আমি সামনে দেখছি ব্যাক মিরর দিয়ে ডাইনে বায়ে খেয়াল রাখছি।

–হঠাৎ যদি কোন আর্মি জীপ দ্যাখো কি করবে?

–গাড়ি থামাব। আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে অপেক্ষা করব। তোমারো তো কার্ড আছে। আর্মিদের নিয়ে ভয় নেই, কিন্তু মুক্তিদের নিয়ে ভয় আছে।

–কেন বল তো?

–দেখে শুনে আক্রমণ চালাবে, এমন সময় ওদের হাতে নেই। লক্ষ্যস্থল পাক আর্মি হলেও আমরা গুলীর আওতায় পড়ে যেতে পারি। কথা বলতে বলতেই দূর থেকে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। জীপ অথবা আর্মি ভ্যানের কর্কশ শব্দ। রর্বাট দ্রুত গাড়ি সামনে এগিয়ে নিয়ে বলল, মিস চৌধুরী, তোমার মাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়। গাড়ির কাভার নিয়ে শুয়ে পড়।

–এত ভয় পাচ্ছ কেন, ওদের আসতে দাও।

–যা বলছি তাই কর মিস চৌধুরী, হারিআপ। আর্মি জীপ সামনে এগুতেই ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট আঘাত হানল জীপের উপর। প্রথম লক্ষ্যই ছিল ড্রাইভার। সে গুরুতর

www.pathagar.com

আহত হতেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে উল্টে পড়ে গেল।

বিরামহীন গুলী ঝাঁঝরা করে দিল উল্টে পড়া জীপটাকে। ভেতর থেকে আর্তনাদ, যন্ত্রণা–কাতর গোঙানীর শব্দ শোনা যেতে লাগল। এক সময় গোলাগুলী থামতেই রোহানা ফিস ফিস করে বলল, রর্বাট, এখনো কিছু লোক হয়তো বেঁচে আছে। আমরা কি ওদের সাহায্য করতে পারি? .

–আর ইউ ম্যাড? গুলী থামলেও আমরা জীপের কাছে গেলেই মুক্তিরা আবার গুলী করা আরম্ভ করবে। তাছাড়া পাক আর্মি এখন তোমাদের শত্রুপক্ষ। ওদের ধ্বংসই তো তোমরা চাও।

–রবার্ট যুদ্ধেরও একটা নিয়ম আছে। আহত লোকদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা যায় না। বড়জোর তাদের বন্দী করা যায়। বিচার করা যায়। ওরা শত্রু না মিত্র পরে বিবেচনা করা যাবে। ওরা হিউম্যান বিং সেই কথাটা আগে বিবেচনা করা যাক।

রবার্টকে বিব্রত দেখাল, ঠিক আছে, তুমি আর মা গাড়িতে থাক। আমি দেখে আসি কিছু করা সম্ভব কিনা।

রোহানা উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একটা গ্রেনেড প্রচন্ড শব্দে বিস্ফারিত হলো জীপের উপর।

রর্বাট জোর করে রোহানাকে শুইয়ে দিল। আর কোন শব্দ নেই। মুক্তিযোদ্ধারা বেরিয়ে এল পাট ক্ষেত থেকে। ক্রল করে এগিয়ে গেল জীপের সামনে। রোহানা এবং রর্বাটও এগিয়ে এল। সব কয়জন পাক আর্মি নিহত। দু'জন অফিসারও আছে। তাজা রক্ত পাহাড়ি নালার সঙ্কীর্ণ স্রোতের মত গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নিম্নমুখী হয়ে পাট ক্ষেতের দিকে। এত তাজা, এত লাল যে মনে হচ্ছে কেউ নববধূর পায়ের আলতার বোতল উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে নালার উপর। এও মনে হচ্ছে, কেউ পিচকারি দিয়ে লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে সবুজ ঘাসের উপর। মুক্তিযোদ্ধারা পা দিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল শায়িত এবং ছিন্নভিন্ন দেহগুলো। কেউ বেঁচে নেই, এটা যখন নিশ্চিত হলো তখন তারা উল্লাসে মত্ত।

রর্বাট এবং রোহানার পরিচয় জিজ্ঞেস করল ওরা। সাংবাদিক শুনে আশ্বস্ত হলো। বলল, আপনারা আমাদের একটা উপকার করতে পারেন?

–বলুন।

–আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছে ওদের পাল্টা গুলীতে। ওকে আপনারা আপনাদের গাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফরিদপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেবেন।

রোহানা বলল, অবশ্যই।

হঠাৎ রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, গাড়ি তোমার রবার্ট। এদের কথা দেয়ার আগে তোমার পারমিশন নেয়া উচিত ছিল। স্যরি।

–ঠিক আছে। আহত মানুষটিকে ব্যাক সীটে তুলে দিতে বল। তুমি এবং মাম

www.pathagar.com

সামনে এসে বস।

–ধন্যবাদ রবার্ট।

ছেলেটি অল্পবয়সী। বড়জোর ষোল সতেরো বছর বয়স। ক্ষতস্থানে কোনমতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। রোহানা পরিচ্ছন্ন করে রক্ত মুছে দিয়ে আবার নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর রবার্টের পাশে এসে বসল।

রর্বাট ফিস ফিস করে বলল, মিস চৌধুরী, তুমি কতটা বিপজ্জনক কাজ করলে বুঝতে পারছ না। এতক্ষণে হয়তো পাক আর্মি ঘাঁটিতে এ্যাটাকের খবর পৌঁছে গেছে। ওরা এখনই ধেয়ে আসবে এদিকে। একজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে যদি এই গাড়িতে দেখে, আমাদের সবাইকে কলেবরেটার হিসাবে গুলী করে মারবে।

–তোমার কথাটা ঠিক রবার্ট। কিন্তু একজন আহত যোদ্ধাকে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধারা এখন দ্রুতবেগে উল্টোদিকে পালাবে। ততক্ষণে ছেলেটি মারা যাবে। প্লীজ রবার্ট, প্লীজ, যত তাড়াতাড়ি পার গাড়ি চালাও। আর একটি কথাও না।

স্পীডোমিটারের কাঁটায় রবার্ট স্পীড তুলল একশ'র ঘরে।

রোহানার মামা কাসেম সাহেব বললেন, কিরে মা, এতদিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল? তোরা তো ঢাকাবাসীই হয়ে গেছিস।

–মামা, সবাই গ্রামের দিকে পালাচ্ছে বোমা পড়ার ভয়ে। কিন্তু গ্রামে আমাদের কেউ নেই। এখন আত্মীয় বলতে শুধু তুমি।

–বেশ থাক।

–মামা ভেবো না, মা তার বাবার সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে। যুদ্ধ বন্ধ হলেই মাকে ঢাকায় নিয়ে যাব।

–এসব কথা তুলছিস কেন?

রোহানার গলা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, মামা, এই যুদ্ধে সবারই মানসিক এবং কাজকর্মের জগতে পরিবর্তন এসেছে। তুমি আবার অন্য কিছু ভাব, তাই বললাম। কিছু মনে করো না। মাকে যুদ্ধের কয়েকটা দিন রাখো।

–তুই থাকবি না?

–না মামা। আমি ঢাকা ফিরে যাব।

–তুইও থাক না। যুদ্ধ কতদিন চলে ঠিক আছে?

–বেশি দিন চলবে না মামা। ইন্ডিয়ার মত বড় শক্তি প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। মামা, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসা পাক সেনারা এ যুদ্ধে জিততে পারবে না, বিশেষ করে এ দেশের লোকই যখন ওদের বৈরী।

–বলিস কিরে? আমি তো আবার শান্তি কমিটির মেম্বার হয়েছি। দেখি দু'দলের

www.pathagar.com

একটা মিটমাট করে দিতে পারি কিনা।

দুঃখের হাসি ফুটল রোহানার ঠোঁটে, মামা যুদ্ধ আর সেই পর্যায়ে নেই। তোমার শান্তি কমিটি তোমার জন্য অশান্তি ডেকে আনবে। মামা, এখন কেউ উদ্দেশ্য দেখবে না, দেখবে শুধু জয়-পরাজয়। সেভাবেই প্রতিশোধ নেবে।

–বলিস কিরে?

–মামা তুমি চিরকালের সাধাসিধে লোক। ঘোরপ্যাঁচ বোঝ না। কিন্তু প্রত্যেকটি লোক এখন ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে গেছে। পার তো এসব ছেড়ে দাও।

–উপায় নেই রে। এখন দেখছি ফাঁদে পড়ে গেছি। পাক আর্মিরা আমাকে খুব বিশ্বাস করে। ওরা আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু আমি যে কত মুক্তিযোদ্ধাদের ওদের ক্যাম্প থেকে দরবার করে ছাড়িয়ে এনেছি, কত বাঙ্গালীকে ওদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে এনেছি, এসব কেউ দেখবে না?

–না মামা, দেখবে না।

–তুই বাড়িয়ে বলছিস রোহানা। তুই ছেলে মানুষ, কতটুকু বুঝিস।

–মামা, জানি তুমি বিশ্বাস করবে না। বেশ, বুঝে শুনে সাবধানে কাজ করো। আমি চলি।

–কিরে, একটা দিনও থাকবি না মা আমাদের কাছে?

রোহানার চোখ ভিজে। কতদিন পরে এমন স্নেহের ডাক শুনল। বাবা মারা যাওয়ার পর এত আদর করে কেউ তাকে কথা বলে নি। বলল, মামা একজন বিদেশীর গাড়িতে এসেছি। সে আজকেই ঢাকা ফিরে যাবে। আমিও ফিরব তার সঙ্গে।

–সাবধানে থাকিস মা। তোর ওখানে দেখাশোনা করার কেউ রইল না।

আশ্চর্য, রোহানা ভাবছে মামার নিরাপত্তার কথা। আর মামা ভাবছে তার নিরাপত্তার কথা। এই হয়তো রক্তের সম্পর্ক।

–মামা, মাকে দেখো। পার তো শান্তিকমিটি থেকে নিজের নাম কাটিয়ে নিয়ো।

–নারে, সে আর সম্ভব না। আমাদের এ পাড়াটা যে আজো অক্ষত আছে, সে তো আমার জন্যই। নইলে কবে পাক আর্মি এ পাড়া পুড়িয়ে দিত। লোকজন মেরে একাকার করত। নজিবরের ছেলেটা মুক্তিযোদ্ধা। তোর নজিবর মামার কথা মনে আছে?

–তা আর থাকবে না। তোমরা তো দুটিতে মানিক জোড়। দিনরাত দাবা খেলা আর রাজনীতি আলোচনা। ওদের বাড়িতে অনেক রাত কাটিয়ে মামীর চোখের অনেক পানি ঝরিয়েছ মামা।

–ঠিক বলেছিস। নজিবর এখন ভিন্ন সুরে গান গাইছে। আগে পাকিস্তানের গুণগান গাইত। বলত, পাকিস্তান না হলে এখনো মুসলমানরা হিন্দু জমিদারদের জুতো বরদার আর হুকো বরদার হয়ে জীবন কাটাত, আর খাজনা না দেয়ার দায়ে জুতোর বাড়ি খেত। এখন বলছে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া না বাঁধলে নাকি বাঙ্গালী জাতির উপায়

www.pathagar.com

নেই। এসব তার ছেলের গুণের প্রভাব। ইন্ডিয়া থেকে ব্রেন ওয়াশড হয়ে এসেছে।

–এসব কথা থাক মামা। এক দল লোক আছে, যারা যেদিকে বৃষ্টি পড়ে সেইদিকে ছাতা ধরে। এরা সুবিধেবাদী লোক। তোমরা ভাল থেকো মামা। আমি আসি।

রর্বাট বলল, মিস চৌধুরী, গাড়িতে এবার তোমার মা নেই। আমি আরো বিপজ্জনক পথে ঢাকা ফিরব। তুমি ইচ্ছে করলে অন্য পথে যেতে পার।

কথাটা লাগল রোহানার, বলল, রর্বাট, আমিও একজন সাংবাদিক, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

–ভুলিনি। তবে একথাও ভুলিনি, তুমি একজন মহিলা।

–তোমাদের দেশের মহিলারা কি লবঙ্গ লতিকা।

–হোয়াট ডু ইউ মীন?

ইংরজিতে কথাটা বুঝিয়ে বলল রোহানা। সঙ্গে সঙ্গে রর্বাটের প্রতিবাদ, ওহ নো নো, দে আর এ্যাজ কারেজাস এ্যাজ মেন।

–তুমি আমার মধ্যে কারেজের অভাব দেখলে কখন?

–দেখিনি। বরং তুমি বাঙ্গালী মেয়েদের সম্পর্কে আমার অনেক ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছ।

–বড় বেশি বাড়িয়ে বলছ রবার্ট।

–ওহ নো, আই এ্যাম নট এক্সাজারেটিং। রিয়েলি আই এ্যাপ্রেশিয়েট ইউ মিস চৌধুরী।

–থ্যাংক ইউ রবার্ট।

বাজার থেকে কিছু বিস্কুট এবং ফল–ফলান্তি কিনে নিয়ে রবার্ট গাড়ি ছাড়ল। রোহানা চুপচাপ। খারাপ লাগছিল তার। নিজে মামাবাড়ি থেকে পেট পূরে ভাত খেয়ে রওয়ানা হয়েছে। রবার্টকে সে দাওয়াত করতে পারে নি। মামার অবস্থা ভাল নয়। তার নিজের হাতেও তেমন টাকা নেই। এমনিতেই মার বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে এল।

ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, আম, আনারস, কেনার ইচ্ছে ছিল রোহানার। কিন্তু পথে কাটাকাটি সম্ভব না। ফলের দাম কিছুতেই রবার্টকে দিতে দিল না রোহানা। রবার্ট অবাক, আমাকে অন্তত কিছু শেয়ার করতে দাও।

–ওসব শেয়ার টেয়ারের নিয়ম এদেশে নেই রবার্ট। আমি এমনিই লজ্জিত যে তুমি আমার মামার বাড়ি এলে অথচ আমরা তোমাকে হসপিটালিটি দেখাতে পারলাম না।

–ডোন্ট ওরি ফর মী। আমি হোটেলে মাটন আর পরোটা খেয়ে নিয়েছি।

–ওহ গড, তুমি করেছ কি? গাড়ি থামাও রবার্ট। কিছু ডিসেন্ট্রির ওষুধ কিনে নাও। নইলে তোমার অসুবিধে হবে।

www.pathagar.com

ভয় পেল রবার্ট, এনিথিং পয়জোনাস?

–নো রবার্ট। তবে এরা খুব পরিস্কার–পরিচ্ছন্নভাবে খাবার প্রিজার্ভ করে না।

রোহানা কিছু ওষুধ এবং কয়েকটা ডাব কিনল। মুখ ছিলিয়ে নিয়ে গাড়িতে রাখল। একটা ডাব খেতে দিল রবার্টকে। বলল, মুখ লাগিয়ে এভাবে খাও।

খেতে গিয়ে অর্ধেক পানি ফেলে দিল রবার্ট নিজের শার্টে আর প্যান্টে। রোহানা হেসে অস্থির, ভেবো না, শুকিয়ে যাবে।

–সিপ করার জন্য একটা স্ট্র দিলে ভাল হতো, রবার্ট হতাশভাবে বলল।

–ওসব ব্যাপার স্যাপার এখানে নেই। এদেশের লোক মুখ লাগিয়ে এমনিভাবেই খায়।

–আই সী!

আলীমুজ্জামান ব্রীজের কাছে এসে দু'জনেই অবাক। ব্রীজ উড়িয়ে না দিলেও অকেজো করে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। এখন উপায়? পাক সেনাদের অনেকগুলো জীপ এবং ভ্যানও অপেক্ষা করছে ওপারে যাওয়ার জন্য। এরই মধ্যে কুমার নদী পার হওয়ার জন্য ফেরী জাতীয় নৌকা চালু করা হয়েছে। রবার্ট ভয় পাচ্ছে। রোহানা বলল, ফেরীতে পার হও। আমাদের গাড়ি হাল্কা পাতলা, ডুববে না।

রবার্ট বারবার মাথা নাড়ছে।

–এখানে বসে থেকে লাভ আছে রবার্ট? তোমাকে খবর পাঠাতে হবে ভোয়াতে। আমাকে খবর ছাপতে হবে আমার পত্রিকায়।

ভীত হয়ে বলল রবার্ট, কি করতে হবে?

–আগে গাড়িটা ওপারে পাঠিয়ে দাও। আমরা এপারে অপেক্ষা করি। গাড়িটা নির্বিঘ্নে পার হলে পরে আমরা পার হবো।

–গাড়ি থামাতে উঠাতে হলে স্টার্ট দিতে হবে। আমাকে গাড়িতে উঠতেই হবে।

–তোমাকে উঠতে হবে না। আমি একজন পেশাদার ড্রাইভার ঠিক করে দিই। কিছু টাকা দিলেই চলবে।

–ফাইন।

খুব অল্প সময়ে রোহানা একজন ড্রাইভার ঠিক করে ফেলল। গাড়ি নির্বিঘ্নে ওপারে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রোহানা এবং রবার্ট একটা ছোট নৌকায় চড়ে নদী পার হলো।

রবার্ট রোহানার উচ্ছসিত প্রশংসায় মুখর। রোহানা বলল, থাম তো রবার্ট, এ দেশটা নদীবহুল দেশ। আমাদের এভাবে বুদ্ধি খাটিয়েই বাঁচতে হয়।

এরই মধ্যে বড় রকমের একটা কান্ড ঘটে গেল। রবার্ট এপারে এসে গাড়ি চেক করতে লেগে গেছে। রোহানা নদীর পারে তাকিয়ে গাড়ি এবং মানুষের পারাপারের দৃশ্য দেখছে। পাক সেনাদের একটা জীপ এখন ফেরী নৌকার উপর। আর জন বিশেক পাক

www.pathagar.com

সেনা বড় একটা নৌকায় উঠে এপারে আসছে। গোয়ালচামটে উঠে এরাও বোধহয় দৌলতদিয়া হয়ে ঢাকায় আসবে। নৌকো নদীর মাঝামাঝি আসতেই সেই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। মাঝি দু'জন নৌকা কাত করে ডুবিয়ে দিল। পাক সেনারা ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এপারে দাঁড়িয়ে থাকা পাক সেনারা রাইফেল তাক করে গুলী ছুঁড়ল মাঝিদের উদ্দেশ্যে। একজন দম নেওয়ার জন্য মাথাটা উঠিয়েছিল পানির উপর। গুলী তার মাথায় লাগল। রক্তের স্রোত মিশে যেতে লাগল কুমার নদীর শান্ত নীরব সফেদ পানিতে। অন্যজন ডুব সাঁতার দিয়ে কোথায় চলে গেছে হদিশ পাওয়া গেল না। দড়ি, জাল কত কিছু ফেলা হলো নদীতে। রোহানা দাঁড়িয়ে থেকে দেখল এই লোমহর্ষক দৃশ্য। এই নদীতে তারা ভাই-বোন সাঁতার শিখেছে। এপার ওপার হয়েছে। পানি ছিটিয়েছে এ ওর গায়ে। এই নদীর বুকে আনন্দ আর হুল্লোড়ের উৎসবই দেখেছে তারা। কোন করুণাঘন বিষাদময় দৃশ্য দেখেনি কোনদিন। জীবনে এই প্রথম। কুমার নদী তার সৌন্দর্য আর নীরবতা নিয়ে অক্ষত রইল না। হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেল রোহানার মন। মনে হলো, যুদ্ধ কোনদিনই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোন ভাল দিকনির্দেশনা নয়। শুধু হত্যা, নিষ্ঠুরতা এবং রক্তপিপাসু আর্তি। পৃথিবীতে দয়া-মায়া এবং ভালবাসা কম নেই। অথচ যুদ্ধের সময় মানুষ এসব মানবিক গুণ বিসর্জন দেয়। কে কত লোক হত্যা করতে পারল কৌশলে, কতটুকু অন্যের ভূমি দখল করতে পারল, এই-ই হলো যুদ্ধের গৌরব এবং কৃতিত্ব।

-মিস চৌধুরী, কি ভাবছ?

উত্তর দিল না রোহানা।

-বুঝেছি মিস চৌধুরী, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চোখের সামনে দেখেছি। নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু দেখেছি, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ছে এমন আহত লোক দেখেছি অনেক। সেই তুলনায় এসব কিছু না।

-রর্বাট, তোমার বিবেক কি তখন আহত হয়নি? তুমি কি মনে কষ্ট পাওনি?

-মিস চৌধুরী, সত্যি বলছি তোমাকে, সেদিন কষ্টের চেয়ে জয়ের আনন্দ বেশি ছিল মনে। আমরা শত্রু নিধন করতে পেরেছি, তাদের শক্তি এবং গর্ব খর্ব করেছি, আমরা জয়ী হয়েছি, এই কৃতিত্বের উৎফুল্লতা আমাদের আর সব গ্লানিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

-তাহলে যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব এবং হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) এ পৃথিবীতে ভালবাসা এবং ক্ষমার কথা প্রচার করে কি লাভ হলো?

-একেবারে লাভ হয়নি, বলবে কি করে? পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকে আছে তাঁদের জন্যই।

গোয়ালন্দ ঘাট, এখন যার নাম দৌলতদিয়া ঘাট, প্রতি বছর সরে আসে নদীর ভাঙ্গনের ফলে। আগে স্টীমার ছাড়ত এখান থেকে। নারায়নগঞ্জ এসে থামত। এখন পদ্মা

www.pathagar.com

পার হতে হয় ফেরীতে। লঞ্চেরও অভাব নেই। এই নদী পথ দিয়ে লরী, বাস, মানুষজন পারাপার হয় অসংখ্য। গোয়ালচামটের চৌমাথার রাস্তা থেকে বাসগুলো চলাচল করে দক্ষিণের জেলা যশোর, খুলনা ইত্যাদি। নওয়াপাড়া হয়ে যায়। আর ওদিকের যানবাহন, মানুষজন এই রাস্তা ধরেই দৌলতদিয়া হয়ে আরিচা আসে ফেরী পার হয়ে। তারপর ঢাকা। রাস্তা খারাপ না। কিন্তু দু'পাশে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত। আর মাঝে মাঝে বাবলা গাছ। মামা বাড়ি আসতে হলে এই সব সবুজ দৃশ্য দেখতে দেখতে রোহানা দু'চোখ ভরিয়ে তুলত।

ছেলেবেলা থেকেই রোহানা বিশাল, প্রসারিত প্রকৃতির ভক্ত। দিনরাত ঘোরাঘুরি এবং ছোটাছুটি করাই ছিল একমাত্র কাজ। মা শাসন করতে চাইতেন, মামা দিতেন না। বলতেন, ও রুশোর এমিলি। স্বাধীন মুক্ত এবং উন্মুক্ত। ওকে ওর মত থাকতে দাও।

–মেয়েমানুষের অত স্বাধীন থাকা ভাল না।

–স্বাধীনতা মেয়ে-ছেলে উভয়ের জন্যই দরকার, মাস্টার মামা বললেন। দেখো, তোমার এই মেয়ে একদিন কি চমৎকারভাবে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে। ও হবে উদার, সংস্কারমুক্ত এবং ব্যাপ্তিময়।

–ছাই হবে, মা রাগ করে বলত, গোঁয়ার, উচ্ছৃংখল এবং বেপরোয়া মেয়ে। তোমার আদরেই ও এমনটি হয়েছে।

মামা হাসতেন, না রে, দেখিস, বড় হলে ও একেবারে বদলে যাবে।

মামার কথা সর্বাংশে সত্যি হয়নি। সে কোন কেউকেটা হয়নি। তবে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা, প্রথা, অনুদার রাজনীতি এবং সংকীর্ণ অর্থনীতি ব্যবস্থার সে ঘোর বিরোধী। দশজনের একটা কথা বলেছে বলে সেই ছকে সেও ভাববে, কথা বলবে, তেমন সে নয়। এমনকি এই যুদ্ধের ব্যাপারেও না। তার নিজস্ব ভাবনা, চিন্তা, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার একটা আলাদা জগৎ আছে। সেই জগতে তার চলার সঙ্গী বেশি নেই। তবু সে ভীত এবং সন্ত্রস্ত না। একলা চলার নীতিই সে অনুসরণ করবে।

কিন্তু আজকের ধান ক্ষেত, পাটক্ষেত, ঝোপঝাড়, গাছপালা সবই অন্যরকম। সৌন্দর্য হারিয়ে ভীতির মুখোশ পড়েছে। বাতাসে ধান ক্ষেত এবং পাটক্ষেত দুলে উঠলেই সতর্ক এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে রবার্টের চোখ। অনুসন্ধানী কণ্ঠস্বর নিয়ে বলে, এসব জায়গা এ্যামবুশ করার জন্য চমৎকার। কোথায় যে লুকিয়ে থাকবে মুক্তিযোদ্ধারা কেউ টের পাবে না। বড় বড় মিলিটারি ভ্যান, লরী এবং জীপ চলাচল করছে একই পথ ধরে। রবার্টের গাড়ির সামনে আমেরিকান ছোট পতাকা লাগানো। মিলিটারি ভ্যানগুলো এই পতাকার দিকে তাকিয়ে সোঁ সোঁ করে চলে যায়। রোহানা মৃদু ঠাট্টা করে, তোমাকে দেখে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু আমার গায়ের রং কালো। কেমন সন্দেহের দৃষ্টি ফেলে আমার দিকে।

www.pathagar.com

–ওটা তোমার মনের ভুল। তুমি ব্ল্যাকি নও, তোমার গায়ের রং চমৎকার, ব্রাউন।

–তাই বলে ওরা আমাকে আমেরিকান বা ইউরোপীয়ান ভাববে না।

–তুমি সত্যি তা নও।

–আমি ওসব ভাবছি না। আমি ভাবছি তোমার কথা। আমার জন্য তুমি অসুবিধেয় না পড়।

–তেমন কিছু জিজ্ঞেস করলে বলব, তুমি আমার গার্ল ফ্রেন্ড, রর্বাটের চোখে দুষ্টুমির হাসি, আপত্তি নেই তো?

–আপত্তি? এই যুদ্ধ তোমাকে আমার কত কাছে এনে দিয়েছে। সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি।

–থ্যাংকস মিস চৌধুরী।

রাস্তায় হাসির খোরাক যোগাল রবার্ট, তার স্টমাক ট্র্যাবল আরম্ভ হলো। রেস্টরুম দরকার। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল রোহানা, গাড়ি থামাও। আপাততঃ ধান ক্ষেতকে রেস্টরুম মনে করে কাজ সেরে এসো।

–হাউ?

কিভাবে বসতে হবে, বারবার বোঝাতে লাগল রোহানা। কিছুতেই বোঝে না রবার্ট। ফরিদপুর শহরে সার্কিট হাউজে ছিল রবার্ট, অসুবিধে হয়নি। এখন? মনে মনে রোহানা হাসি চাপে, হোটেলে পরোটা এবং মাটন খাওয়ার মজা বোঝ। দুঃখও হয়। দুটো বেলা যদি ওকে খাওয়াতে পারত মামার বাসায়, তাহলে বেচারা এমন অসুবিধেয় পড়ত না। গাড়ি থামিয়ে শেষ পর্যন্ত ধান ক্ষেতেই যেতে হলো রবার্টকে।

–টয়লেট পেপার নিয়ে যাও সঙ্গে।

–এই যাঃ আমি তো আনিনি।

আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল রোহানার ঠোঁটে, ধানপাতা ব্যবহার করলে তোমাকে আর আস্ত ফিরতে হবে না। রোহানা ব্যাগ থেকে ছোট দুটো রুমাল বের করে দিয়ে বলল, এগুলো দিয়ে ওয়াশ করো। ফেলে দিয়ে এসো কিন্তু।

–ওহ গড, শেষ পর্যন্ত লেডিজ রুমাল।

–আরে নাও। ওসব সংস্কার রাখো। এখন লজ্জা নিবারণ কর।

–হোয়াট?

–কিছু না। নেসেসিটি নোজ নো ল।

–থ্যাংকস মিস চৌধুরী।

রবার্ট ফিরে এসে নিজেই হাসতে লাগল, জান কত রকম ভাবে বসতে চেষ্টা করেছি, ইন্ডিয়ান যোগীদের মত, যোগ ব্যায়ামের মত, ধ্যানী ঋষী এবং দরবেশদের মত। কিছুতেই সুবিধে হয় না। শেষ পর্যন্ত তুমি যেভাবে বলেছ, সেইভাবে বারবার চেষ্টা করে সাক্‌সেসুফুল।

www.pathagar.com

রোহানা বলল, জান, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, বিদেশে নিয়ম নাস্তি। অর্থাৎ যে দেশে যাও সেই দেশের আচরণ অনুসরণ কর। এবার ওষুধ খেয়ে নাও তো।

বিনা প্রতিবাদে দুটো ফ্লাজিল ট্যাবলেট খেয়ে নিল রবার্ট। ডাবের পানিও খেল। এবার পানি একটুও গড়াল না। বারবার বলতে লাগল, –থ্যাংকস মিস চৌধুরী, থ্যাংকস। আমি বেশ কমফরটেবল ফীল করছি।

–একটু নসিয়ার ভাব হতে পারে। স্টিয়ারিংয়ে তুমি থাকবে না আমি বসব?

–তুমি গাড়ি চালাতে পার?

– তেমন ভাল না। সবে শিখতে আরম্ভ করেছিলাম।

–তাহলে থাক, আমিই চালাই। দেখছ না মিলিটারি ভ্যানগুলো কিভাবে ওভারটেক করছে গাড়ি। স্পীড তুলছে একশোর কাঁটায়।

রোহানা আর কথা বলল না। দৌলতদিয়া ঘাটে এসে দেখল রোহানা, ফেরিতে সব মিলিটারি ভ্যান সারি দিয়ে উঠছে। পারে দাঁড়িয়ে আছে ইনটার ডিস্ট্রিক সার্ভিস বাস এবং ট্রাকগুলো।

রবার্ট বলল, চল এই ফেরিতে উঠি। ওদের রিকুয়েস্ট করলে আমাদের গাড়ি নিয়ে উঠতে দেবে।

–বিদেশীদের খাতির সবাই করে, ওরা না করবে না। কিন্তু আমার মতে না উঠাই গল।

–কেন?

–তুমি বুঝতে পারছ না কেন রবার্ট, এই ফেরিতে শুধু পাক আর্মিদের ভ্যান উঠছে। পাবলিক ভ্যান একটাও নেই। যে কোন মুহূর্তে যে কোন অপারেশন আরম্ভ হতে পারে। আমাদের জন্য এই ট্রিপ নিরাপদ না।

–শান্ত্রীরা রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া দিনের বেলায় মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশন চালাতে সাহস পাবে না।

–সাহস পাবে না, এটা বলো না। মুক্তিযোদ্ধারা দুর্ধষ্য। মনে কর গান বোটে এসে দূর থেকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করল, তখন?

–রবার্ট বিরক্ত, তাহলে কি করতে হবে?

–ঘন্টা আড়াই পরে আরেকটা ফেরী আসবে। ওটায় উঠব।

–ওহ গড! এই আড়াই ঘন্টা বালুর চড়ায় কাটাব?

–অসুবিধে কি? জীবনের ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে একটু অপেক্ষা করা ভাল।

রবার্ট কথা বলল না। তাকে বিমর্ষ দেখাল। সময়ের অপচয় তার পছন্দ না। ফেরি ছেড়ে গেল ঘাট থেকে। বোধহয় পনের মিনিট সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি, দৃষ্টিসীমার মধ্যেই রয়েছে ফেরি, এমন সময় প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আগুন এবং ধোঁয়া দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফেরী ডুবে গেল পদ্মার অতল গহ্বরে।

www.pathagar.com

রবার্ট আঁৎকে উঠল, ওহ্ গড, হোয়াট হ্যাপেন্ড্। মিস চৌধুরী, তোমার জন প্রাণে বেঁচে গেলাম।

–এমন করে বলো না, আল্লাহ মালিক আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন।

–ইয়েস। থ্যাংক্স গড, হী ইজ সো মার্সিফুল।

অনেকক্ষণ পদ্মার গভীর বুকের দিকে নির্মিমেষে তাকিয়ে রইল রোহানা। একটু আগেও ফেরির চাকার ঘর্ষণে উচ্ছ্বসিত ছিল ঢেউ। এখন নীরব। শুধু জলজ বিষণ্ন দৃষ্টি নিয়ে পদ্মা তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে।

অনেক বেলা। রোহানা বলল, এসো, রবার্ট, লাঞ্চ করি।

–লাঞ্চ? এখানে??

–কেন, কলা আর মুড়ি খাব, দুটো ইনোসেন্ট খাবার আইটেম। ডাবতো আছেই। ঐ যে দূরে টিনের ঘরটা দেখছ, ওখানে বাঙ্গালী প্যাটার্নে রেস্টরুম আছে। ইচ্ছে করলে যেতে পার, গম্ভীর হয়েই বলল রোহানা।

–নো নীড, থ্যাংকস।

খেতে খেতে রবার্ট বলল, ফেরিটা দিন দুপুরে ডুবল কি করে?

–কমান্ডোরা ফেরিতে আগেই লিমপেট মাইন লাগিয়ে রেখেছিল। ওদের জানা ছিল, অনেকগুলো লরীতে অস্ত্রশস্ত্র, গোলা–বারুদ আছে। দেখলে না, ত্রিপল দিয়ে কি সুন্দরভাবে ঢাকা। এ ভ্যানগুলো যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এদিকে এসেছিল। রেকীরা নিশ্চয়ই এ খবর আগে ভাগে কমান্ডোদের জানিয়েছে।

–মে বী। তোমার অনুমান সত্য হতে পারে। পরের ফেরিতেও যদি এমন ঘটে।

–সম্ভাবনা কম। যেসব ট্রাক, লরী বাস দাঁড়িয়ে আছে এগুলো বেসামরিক যান। অনেক লোক পারাপার হবে। জেনেশুনে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের লোক মারবে না।

–রাইট। আমি শীগগীর ভোয়ায় খবর পাঠাতে পারব।

–আমিও ডায়রিতে লিখে রাখছি। রবার্ট, তথ্য লেখা যায়, বেদনা লেখা যায় না। তা শুধু অন্তরে থকে।

–তা ঠিক।

ঢাকা ফিরে আসতে রোহানাদের আর কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো না। মনের গুমোট ভাব এড়ানোর জন্য দু'জনেই কথা বলল। প্রসঙ্গ উঠিয়েছিল রবার্ট আগে, মিস চৌধুরী, এই যুদ্ধ নিয়ে তুমি এত বেশি ভাব কেন? যতই তুমি পৃথিবীকে অহিংসার বাণী শোনাও না কেন, দ্বন্দ্ব, কলহ, যুদ্ধ এবং রক্তপাত থাকবেই। এর মূলে আছে শক্তি পরীক্ষা এবং তা থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাংখা।

–রবার্ট তুমি লোভ কথাটা সব সময় এড়িয়ে যাও। লোভ থেকেই তো আসে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাংখা। ওমুকে বড় হচ্ছে, আমি কেন তার উপর দিয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাব না, এই হিংসা থেকে আসে ঐ মনোভাব।

www.pathagar.com

–ওহ নো, মিস চৌধুরী। এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ। তুমি থেমে থাকলেও অন্যে এগিয়ে যাবে। অতএব তোমাকে এগুতেই হবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়েই জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই পৃথিবীকে দান করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্যের অমর অবদান। আমেরিকান জাতির গৌরব এটাই যে সে নিজ চেষ্টায় এগিয়ে গিয়ে বড় হয়েছে, মহান হয়েছে।

–স্বীকার করছি রবার্ট। কিন্তু শক্তি এবং সমৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আসে মনে অহংকার। তখন ঐ জাতি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশের উপর প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে।

–রবার্ট প্রতিবাদ করল, আমরা অন্য দেশের উপর কিন্তু প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করছি না। কিন্তু অন্যান্য দেশ আমাদের কাছে হাত না পেতে পারছে না, এটা আমদের দোষ না।

–কিন্তু সম্পদ যদি বড় দেশগুলো কুক্ষিগত করে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরীব দেশগুলো কি করবে? হাত তাদের পাততেই হবে।

–দ্যাখো মিস চৌধুরী, জাতি সম্পদ অর্জন করে তা বিনা লাভে বিকিয়ে দেয়ার জন্য না। কিছু দিলে কিছু নিতেও তো হয়।

–রবার্ট, তুমি এবার সত্যি কথা বলেছ। কিছু দিচ্ছ বলে কিছু নিচ্ছ, তা টাকা পয়সা না হতে পারে, তবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার তো বটেই।

–তুমি দেখছি দরবেশ আওলিয়াদের মত বিনা স্বার্থে মহান হওয়ার স্বপ্ন দেখছ। সেটা কি সম্ভব এ যুগে? এই শতাব্দীতে, অথবা আগামীতেও?

–তাহলে স্বীকার করছ, বিনা স্বার্থে কেউ কিছু করে না।

–করে। যেখানে মানুষ নির্যাতিত সেখানেই আমরা, গণতন্ত্রের জন্য অন্য জাতিকে উৎসাহিত করি আমরা, মানবাধিকার লংঘিত হলে সোচ্চার হই আমরা। কোথায় নেই আমরা?

রোহানার তর্ক করতে ইচ্ছে হলো না। শুধু বলল, রবার্ট, বিধাতা তোমাদের অযাচিতভাবে বিরাট এক সমৃদ্ধশালী দেশ দান করেছেন। করতে চাইলে তোমরা অনেক কিছু করতে পার। কিন্তু সব দেশ তা পারে না। সীমিত সম্পদ তাদের প্রয়োজন মেটায় না। ফলে অস্ত্রের জন্যই হোক, প্রযুক্তির জন্যই হোক, তোমাদের কাছে তাদের হাত পাততে হয়। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, শতাব্দীব্যাপী তোমাদের অক্লান্ত নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং মেধাকে কাজে লাগিয়েই তোমরা বড় হয়েছ।

রবার্ট খুব খুশি। মিস চৌধুরী যেভাবে দোষের বিশ্লেষণ করতে পারে, গুণের প্রশংসা করে তার চেয়ে বেশি। তার দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ মন্তব্যে রবার্ট শ্রদ্ধাশীল। ফেরি ঘাটে এসেছিল। আলোচনাও বন্ধ। বাকী পথটায় গাড়িতে আর কথা হয়নি।

গয়না খোয়ানোর কথা রোহানা ওমরকে বলেনি। ও তাহলে এত কষ্ট পাবে যে

www.pathagar.com

বলার নয়। মার মত ওমরেরও একটা কল্পনা আছে গয়নাগুলো ঘিরে। ওমর কতবার বলেছে, রোহানা, এই গয়নাগুলো বিয়ের রাতে পরলে তোমাকে যা মানাবে।

–তুমি না বল, শুধু বেলী আর বকুল ফুলের মালা পরিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করবে।

–কথাটা কি মিথ্যে? গয়নাগুলো আমার দেয়া নয়।

–তুমি কি ভাব, ওগুলোর শেয়ার তোমাকে না দিয়ে আমি একাই ভোগ করব?

–বেশ সীথি পাটি আর ঝাপটা আমাকে দিয়ো। যা মানাবে আমাকে।

–যা অসভ্য, খিলখিল করে হেসে উঠল রোহানা, এমন বাজে ঠাট্টা তুমি করতে পার। ঝাপটা ভেঙ্গে আমি তোমাকে সোনার বোতাম গড়িয়ে দেব। আর এমন সুন্দর একটা পাথরের আংটি দেব যে তোমার তাক লেগে যাবে।

–আংটির পাথরে তোমার লাভলী মুখ দেখা যাবে তো?

–ইস্ যা একটা কালো পেত্নীর মুখ।

–এমন বললে আমি তোমার কিছুই নেব না।

–আচ্ছা ভাই মাপ চাচ্ছি। আর বলব না। তোমার দেহ–মনের সান্নিধ্যেই আমি সুন্দর হয়ে উঠব।

–রোহানা, আমি তোমাকে কোনদিন বোঝাতে পারব না, সব মিলিয়ে তোমাকে আমি কত সুন্দর দেখি।

হাল্কাভাবে কথা আরম্ভ করেছিল। এরপর দু'জনেই গম্ভীর। এত গভীর যে ভালবাসার বেদনায় দু'জনেই কষ্ট পেতে থাকে।

ওমরকে খুব কৃশ দেখাচ্ছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শেভ করেনি অনেকদিন। কাপড়চোপর ময়লা।

–তোমার এ দশা কেন ওমর?

–ভালই তো আছি।

–শরীরের অযত্ন করছ কেন? এমন করলে কয়দিন টিকবে?

–যত্ন করলেই এ যুদ্ধের সময়ে কয়দিন যে টিকবো তা কে জানে?

–তাই বলে আগেই সন্ন্যাসী বনবে?

–ওসব থাক। তোমাদের কথা বল। মা কেমন আছেন? মামা–মামী তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন তো?

–যুদ্ধের সময়ে আদর আর অনাদর? তবে মামা–মামী রানু খালার মত মুখ ভার করেননি।

–ব্যস তবেই তো হয়েছে।

রোহানা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, ওমর, আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে

www.pathagar.com

পার?

ওমর অবাক। টাকা ধার চাওয়া তো দূরের ব্যাপার, দিতে চাইলেও রোহানা কোনদিন নেয়নি। কারণ জিজ্ঞেস করলে রোহানা হয়ত টাকা আর নেবেই না। ওমর চিন্তান্বিত। রোহানার কত টাকা দরকার কে জানে? ওমরের নুর প্রেসের চাকরিটা নেই। আজকাল পত্রিকা বিশেষ কেউ পড়ে না। খবরের জন্য ভোয়া এবং বিবিসির উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ লুকিয়ে স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের খবর শোনে। অতএব সব কাগজেরই কাটতি কম। রোহানার দর্শন পত্রিকার বিক্রি আরো কম। তবে সে নিজে বিলি করে বলে খরচটা উঠে আসে মাত্র। রোহানা একটা নীতিগত আদর্শের উপর পত্রিকা চালায়। ওকে বাণিজ্যিক দিকটা বিবেচনা করতে বললেও ও শুনবে না। সুতরাং সীমিত আয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ওমর বলল, তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নাও। কিছু খাও, যাওয়ার সময় টাকা নিয়ে যেয়ো।

যাওয়ার কথা শুনে হুশ ফিরে এল রোহানার। প্রেসে বসে কথা বলছিল। এক সময় উঠতেই হবে। কোথায় যাবে সে? রানু খালার বাসা স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে। স্কুলের দায়িত্বও নেই যে সেখানে একটা ঘর নিয়ে থাকবে। হঠাৎ জয়নালের কথা মনে হলো। তার একটা ঘর আছে। স্কুলের সম্পত্তি হলেও ওটা দারোয়ানের জন্য নির্দিষ্ট। ওখানেই উঠবে আপাতত। পরে ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে। রাস্তায় বের হলো রোহানা। ওমরও বের হলো।

–তুমি কেন আবার এলে?

–তোমাকে রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে আসি।

–উঠিয়ে দিতে হবে না।

–আহা ওমন করছ কেন?

–ওমর, সব সময় কথা কাটাকাটি ভাল লাগে না।

ওমর থেমে পড়ল। তারপর উল্টো দিকে হাঁটা আরম্ভ করল। চোখ মুছল রোহানা। সে চায় না, সে কোথায় যাচ্ছে ওমর জানুক।

জয়নাল বলল, মা আপনি? একি চেহারা হয়েছে আপনার?

–জয়নাল আমি তোমার এখানে থাকতে এসেছি।

–মা আপনি কি বলছেন?

–ঢাকায় আমার কোথায়ও থাকার জায়গা নেই। আমি এখানে কয়টা দিন থাকব। ঘর ভাড়া করে থাকব, এমন পয়সাও হাতে নেই।

–এসব বলতে হবে না মা। রাজরানী পথের ভিখারী হলে কি অবস্থা হয় তা আমি জানি।

–রাজরানী কোনদিন ছিলাম না। তবে পথের ভিখারিও ছিলাম না। থাক ওসব

www.pathagar.com

কথা। ঘরের মাঝখানে একটা পর্দা টানিয়ে দিলেই চলবে।

–কি যে বলেন মা। আমি স্কুলের বারান্দায় থাকব।

–না জয়নাল. এ নিয়ে কথা উঠতে পারে। রাতে স্কুল নাইট গার্ডের জিম্মায় থাকবে। কিছু চুরি চামারি হলে তুমি দায়ী হবে।

–ঠিক বলেছেন মা। আমি উঠোনেই শোব।

–দরকার নেই। দিনকাল ভাল না। গুলীটুলী এসে লাগতে পারে। তুমি আমাকে মা ডেকেছ। মায়ের কাছে ছেলের এত লজ্জা কিসের। তুমি ঘরের মেঝেয় শুয়ো। দিনে আমি ঘরে থাকব না। রাতটুকুর ব্যাপার।

–দিনে তুমি কোথায় থাকবে মা?

–বাইরে আমার কত কাজ, এর বেশি বলে না রোহানা।

–মা একমুঠো চাল চড়িয়ে দেব? বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে তোমার মুখ।

–দাও।

–আলু ছাড়া আর কিছু ঘরে নেই মা। ডিম নিয়ে আসব কিনে?

–না। দুটো আলু ভাতে ফেলে দাও। ওতেই চলবে। রোহানার কষ্ট হতে লাগল। ওমর কিছু খায়নি। দুপুরটা কথা বলে মাটি করে দিয়েছে। সঙ্গে আসতে না দিয়ে রাগিয়ে দিয়েছে। ও আর দুপুরে কিছু খাবে বলে মনে হয় না। রোহানা নামমাত্র খেল। তারপর ঘুমে অচেতন।

রাত্রে এক শিক্ষিকা এসে হাজির, আচ্ছা আপা, আমরা থাকতে আপনি কেন দারোয়ানের ঘরে অতিথি হয়ে এলেন?

রোহানা বলল, ও গরীব মানুষ হলেও ওর আতিথ্য কিন্তু গরীবি নয়। ও চমৎকার মানুষ।

–আমরা কি মন্দ মানুষ আপা?

–তা কেন, আমার চোখে সবাই আপনারা ভাল।

কথাগুলোয় খুশি হলো না রাশেদা বেগম।

–আনসার সাহেব কোথায়? কেমন আছেন?

স্কুলের চার্জ আনসার সহেবকেই বুঝিয়ে দিয়েছিল রোহানা, সায়েন্স টীচার, সৎ এবং নীরিহ মানুষ। এও পছন্দ ছিল না রাশেদা বেগমের, আপত্তি করে বলেছিল, আমি আনসার সাহেবের সিনিয়র। চার্জ আমার পাওয়ার কথা। রোহানা চৌধুরী কোন উত্তর দেয়নি। কার হাতে স্কুলের সম্পদ নিরাপদ থাকবে, সে ভাল জানে। রাশেদা বেগমের আকস্মিক আবির্ভাবে এসব কথা মনে পড়ছিল রোহানার।

–ওমা, আপনি কিছু জানেন না? উনি হাসপাতালে। অসুস্থ।

–কি হয়েছে ওঁর?

–ছেলেরা সায়েন্স লেবরেটরি আর হোম ইকোনোমিক্স রুম লুট করতে এসেছিল।

www.pathagar.com

কি সব এসিড ফেসিড দরকার। হাত বোমা বানাবে। যুদ্ধে কাজে লাগাবে। আনসার সাহেব ওদের যুক্তি শুনলেন না, বাধা দিলেন। ছেলেরা ওঁকে তখন মারধোর করল। উনি যখন অচেতন, এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমিই তাঁকে হাসপাতালে পাঠালাম।

–ভাল করেছেন। স্কুলের চার্জে এখন কে?

–আমিই।

–ভাল, কাজ করে যান।

–আপনি কি স্কুলে জয়েন করবেন?

–না, মহিলাকে আশ্বস্ত করল রোহানা।

–কিছু লাগলে বলবেন।

–ঠিক আছে।

–আসি।

–আসুন।

রোহান চৌধুরী চিন্তামগ্ন । মহিলাকে স্কুলের কেউ পছন্দ করে না। নিজের স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। আনসার সাহেবের মত ভাল মানুষকেই বা কারা মারল? কিন্তু এসব সে ভাবছেই বা কেন? স্কুলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো এইটুকুই সম্পর্ক, নিজের হাতে গড়া জিনিসের উপর থেকে মমতা কোনদিন মিলিয়ে যায় না।

সন্ধ্যায় মেডিকেল হাসপাতালে এসে উপস্থিত রোহানা। সাতাশ নম্বর বেড খুঁজে পেতে দেরি হলো না। আনসার সাহেবের ক্ষত গভীর না হলেও বড় দুর্বল তিনি। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, রাশেদা বেগমকে প্রথমেই চার্জ না দিয়ে আপনি বড় ভুল করেছেন আপা।

–আমি কোন ভুল করিনি। স্কুলের স্বার্থ আগে দেখেছি।

–উনিই ছেলেদের আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন কিনা কে জানে?

–নাও হতে পারে। ছেলেরা নিজেরাই সেন্‌সেটিভ হয়ে আছে।

–মৌলানা রশিদকে এই ভদ্রমহিলা মতান্তর হওয়ায় রাজাকার বলে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁর খোঁজ নেই।

রোহানা চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আনসার সাহেব, স্কুলের ভাবনা ছেড়ে দিন। নিজের ভাবনা ভাবুন। আপনি বড় দুর্বল।

–কি করে নিজের কথা ভাবব? ঘরে টাকা পয়সা নেই। ছেলেপুলে অনাহারে। আমি তবু হাসপাতালের ভাত খাচ্ছি। বড় আপা, কেন আপনি চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। কেন সবাইকে দুর্দশায় ফেললেন? স্কুলের কেউ আজ পর্যন্ত বেতন পায়নি।

–বিশ্বাস করুন আনসার সাহেব, স্কুলের চাকরি না ছেড়ে উপায় ছিল না।

কিন্তু মুখ ফুটে কোন আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারল না তাঁকে। সাহায্যের ব্যাপারেও না। আনসার সাহেবের অবস্থার চেয়ে তার নিজের অবস্থা খুব একটা ভাল

www.pathagar.com

না। তাদের বিধ্বস্ত বাড়িতে এখন অনেক উড়ো লোকের বাস। তাদের উঠিয়ে দেবে এমন সাধ্য রোহানা চৌধুরীর নেই। পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ নেই। তারা নিজেরাই বিপর্যস্ত। মিলিটারিদের কছে যাওয়া সম্ভব না। কলেবরেটর হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর এই উড়ো লোকগুলোই তাকে সেইভাবে চিহ্নিত করে একদিন প্রতিশোধ তুলবে। কিছু ফল কিনে এনেছিল রোহানা। তাই আনসার সাহেবকে দিয়ে, আবার আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিল। নিউমার্কেটের কাছে আসতেই রবার্টের সঙ্গে রোহানা চৌধুরীর দেখা, বাঙ্গালীদের মত চিৎকার করে ডাকল, মিস চৌধুরী।

রিক্সা থেকে নেমে এল রোহানা, মুখ উজ্জ্বল, হাউ আর ইউ রবার্ট?

–ফাইন, তুমি কেমন?

–ফাইন। এদিকে কোথায় এসেছিলে।

–নিউ মার্কেটে যাব। কিছু কেনাকাটা করব। মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম। তুমি তোমার এ্যাড্রেস আমাকে দিয়ে যাওনি।

থাকলে তো দেব, ভাবল রোহানা। বলল, কেন আমাকে খুঁজছিলে, বল।

–তোমার হোম ডিস্ট্রিক টাঙ্গাইল না?

–হ্যাঁ।

–সেখানে দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। চল না সেখানে যাওয়া যাক। তাজা খবর সংগ্রহ করা যাবে।

–যুদ্ধের সব খবরই তাজা রবার্ট।

–হ্যাঁ। পাক বাহিনী ময়মনসিংহের ভালুকায় সাংঘাতিকভাবে মার খেয়ে টাঙ্গাইলের দিকে চলে এসেছে। এখানে দারুণ যুদ্ধ হবে। টাঙ্গাইলে জিতলে ঢাকার দিকে ওদের প্লাটুন এগিয়ে আসবে। আর টাঙ্গাইলে হেরে গেলে ঢাকাও রক্ষা পাবে না।

–তুমি দেখছি যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খুব ভাব।

–হ্যাঁ। আমি ম্যাপ এঁকে ওদের রুট ঠিক করছি। চাটগাঁও, রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা ও ঢাকা বিভাগকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারা বিভিন্ন জোনে ভাগ করেছে। যেমন দক্ষিণ–পূর্ব জোন, পশ্চিম জোন, দক্ষিণ–পশ্চিম জোন, ইত্যাদি নিয়ে দশটি জোনে ভাগ করা হয়েছে সারা দেশটাকে। সব জোনেই ঘোরতর যুদ্ধ হবে। তারপর মুক্তিযোদ্ধারা জিতলে একত্রে ঢাকার দিকে এগুবে। ঠিক এই সময়ে ইন্ডিয়ান ফোর্স আসবে। একত্রে আক্রমণ করলে পাক আর্মিরা হারবেই।

–ইন্ডিয়ান ফোর্সদের আসার সম্ভাবনা কখন?

–নভেম্বরের শেষ দিকে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম দিকে।

–আশ্চর্য, রবার্ট এত খবর রাখে, মনে মনে ভাবল রোহানা। পরমূহূর্তে মনে হলো, সি,আই,এ কাজ করছে এখানে। কোন্ দেশের গোয়েন্দা বিভাগ নেই এখানে? রবার্টের পক্ষে এসব তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন না। কিন্তু তাদের পক্ষে কঠিন।

www.pathagar.com

টাঙ্গাইল যাওয়ার জন্য মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল রোহানা। রবার্ট খোলামেলা বিশ্বস্ত লোক, তার উপর নির্ভর না করলেও সে শুধু সঙ্গে থাকলেও কাজ অনেক সহজ হবে রোহানার জন্য।

–আমি রাজি রবার্ট। কবে নাগাদ রওয়ানা হচ্ছো?

–আগামীকাল ভোরে। দি সুনার দি বেটার।

–থ্যাংকস রবার্ট। শেষ রাতের দিকে কি?

–অন্ধকার থাকতে না। ঐ সময় মুক্তিরা যেমন সতর্ক , পাক আর্মিরাও তেমনি। দু'দলের ভেতরে পড়ে স্যান্ডউইচড্ হতে চাইতে না। সকাল আটটা নাগাদ রওয়ানা হবো। তুমি গুছিয়ে নিতে সময় পাবে।

–ঠিক আছে, তাই হবে। চলি তাহলে?

–মীরপুরের দিকে যাবে? হাতে সময় আছে অনেকটা।

–কেন বলতো।

–ওদিকে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

–আমি কিছু শুনিনি। তুমিও বলনি কিছু।

–কি করে বলব? তুমি গাড়ি থেকে নেমেই চলে গেলে। ঠিকানা দিয়ে যাওনি।

–আই এ্যাম সরি রবার্ট।

–গতকাল সন্ধ্যায় বিহারী কলোনীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। সবাই তখন ঘরে। শিশু–মহিলা–পুরুষ অনেকেই জীবন্ত দগ্ধ। যে বেরুতে চেষ্টা করেছে তাকেই গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। একজন বিহারী যুবককে ওরা আমার সামনেই জবাই করল।

–তুমি মীরপুরে কেন গিয়েছিলে?

–দশ নম্বর মীরপুরে সেভেন্‌থ্ ডে হসপিটালের মেইন অফিস। ওখানে আমার কাজ ছিল।

–ব্যাপারটা সত্যি লোমহর্ষক।

–আচ্ছা মিস চৌধুরী, বিহারীরা মুসলমান?

–হ্যাঁ।

–আমারো তাই মনে হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা, একজন আযান দিচ্ছিল কাঁচা মসজিদ ঘরে। তার পিছনে অন্যেরা জমায়েত হচ্ছিল। বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদেও আগুন ধরে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। দরজার সামনে মুক্তিরা রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে। যে বেরুতে চেষ্টা করল তাকেই গুলী করা হলো। ওরা তো অনেকদিন থেকে এ দেশেই সেটল্‌ড্। ওদের মারা হলো কেন?

–রবার্ট, তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ধর্মে এক হলেই মানুষ মিত্র হয় না। দেখছ না, পশ্চিম পাকিস্তানীরাও মুসলমান। তবু ওদের সঙ্গে আমাদের বনিবনা হলো না। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বেঁধে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আক্রমণকারী জার্মানরাও তো

www.pathagar.com

খৃস্টান। তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করলে কেন?

–একজাক্টলি। জার্মানরা প্রথমে আক্রমণ করেছিল। আমরা তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু বিহারীরা প্রথম আক্রমণকারী না। প্রথম আক্রমণকারী পশ্চিম পাকিস্তানীরা। কিন্তু বিহারীদের বিরুদ্ধে তোমাদের এই ব্যাপক প্রতিশোধস্পৃহা কেন?

–কারণটা আমিও বলতে পারব না রবার্ট। শুধু এইটুকু বলব, ওরা বাংলাভাষাভাষী না, উর্দুতে কথা বলে।

–তাতে কি? অরিজিনালি ওরা ইন্ডিয়ান ছিল। এদের ভাষা আগে থেকেই উর্দু।

–বিহারীরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সগোত্র ভাবে, আপন ভাবে। ওদের ভাবাগত আদর্শ ঐদিকেই।

–সে জন্য কি ওদের বধ করা চলে?

–আমার প্রশ্ন তোমার মতই রবার্ট। কিন্তু আজো উত্তর খুঁজে পাইনি।

–তারপর কি হলো জান মিস চৌধুরী।

–বল।

–পাক আর্মিরা ধেয়ে এল স্পটে। যারা সত্যিকারের দোষী তারা আগেই ভেগেছে। পাক আর্মিরা যে কয় ঘর বাঙ্গালী ছিল তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। ব্যাস খতম।

–যুদ্ধে কম মানুষেরই কান্ডজ্ঞান থাকে। তাই নিরপরাধরাই দুঃখ যন্ত্রণা এবং হতাহতের শিকার হয় বেশি। অসহায় মানুষদের মেরে যুদ্ধবাজরা প্রমাণ করে, দ্যাখো আমরা কত শক্তিধর। অতএব চটজলদি নতি স্বীকার কর। রবার্ট তুমি ক্যামেরায় কিছু ধরে রেখেছ।

–ধরেছিলাম, রাখতে পারিনি। একজন পাক অফিসার আমার উপর নজর রাখছিল। ফিল্ম বের করে নিয়ে ক্যামেরা ফেরত দিল।

–আজ তাহলে কি করতে যাবে ওখানে?

–পরবর্তী প্রতিক্রিয়া দেখে আসি। এই তো শেষ না।

–সেটা কি সুখের হবে? দু'পক্ষই তেতে আছে।

–তা থাক, আমি যাব।

–চল আমিও যাই।

–তোমার না যাওয়াই ভাল। বাঙ্গালী দেখলে বিহারীরা তেড়ে আসতে পারে।

–নাও আসতে পারে। সবাই সমান না। এদেশের অনেক বাঙ্গালীই বিহারীদের সঙ্গে একত্রে থেকেছে, মিশেছে, বন্ধুত্ব করেছে। সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছে।

–ফ্যাক্টরগুলো বড় নাজুক মিস চৌধুরী। তোমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছ। বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হয়েছ। তাতেই কি যুদ্ধ ঠেকাতে পারলে? ইউরোপেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। তবু দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

গেল।

–তুমি আমার সেই কথাতেই ফিরে এলে রবার্ট। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাংখাই মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। এর থেকেই আসে হিংসা, লোভ, মারামারি এবং রক্তপাত।

রবার্ট কথার উত্তর দিল না। ভ্রু কুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, তোমার মতামত একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সবটা আবার গ্রহণ করাও যায় না। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ বিভিন্ন কারণে হয়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

–কিন্তু মূল কারণ একটাই রবার্ট। আক্রমণকারী পররাজ্য গ্রাস করার লোভ নিয়ে এগিয়ে না এলে তো বাধা দেয়ার প্রশ্ন আসত না, যুদ্ধও বাঁধত না।

–মিস চৌধুরী, ইতিহাস বিশ্লেষকরা যুদ্ধের কারণগুলো বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তোমার কারণগুলো ওদের শতাধিক মতবাদের অন্যতম। থাক এ ব্যাপারগুলো। চল এবার যাওয়া যাক।

পথে রবার্টের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলল রোহানা, টাঙ্গাইলে কোথায় থাকবে?

–রেস্ট হাউজ রিজার্ভ করেছি।

–তুমি নাহয় একটা রুম রিজার্ভ করেছ, আমার উপায়?

–আমি পুরো রেস্ট হাউজ রিজার্ভ করেছি। অন্য কেউ এসে বিরক্ত করবে এটা আমি চাইনে। তুমি ওখানেই থাকবে। রুমের অভাব নেই।

ভেতরে ভেতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রোহানা। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা যা হোক না কেন, থাকার সমস্যা তো মিটল। তার জন্য এও কম না।

সমস্ত মীরপুর জুড়ে কাঁচা, পাকা, সেমি–পাকা বাড়িঘর। অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মোহাজের ভাবটা ওদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। হয়তো এই জন্যেই যে, আবার কোনদিন না কোনদিন ওদের উপর অশনিপাত হতে পারে। ভবিতব্য এভাবে ফলে যাবে তাই বা কে ভেবেছিল? অবশ্য মোহাম্মদপুরের ছবি আলাদা। ওখানে বিহারীদের দালানকোঠা উঠেছে। কঠিন শ্রমের বিনিময়ে অনেক বিহারী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এদেশে। রোহানা ছাত্রী অবস্থায় ঢাকার যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে। নতুন ঢাকা যেমন দেখেছে তেমনি দেখেছে পুরোনা ঢাকা। কোথায়ও বিহারীদের ভিক্ষে করতে দেখেনি। কিন্তু আজ সাংবাদিকের দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করছে এরা ভিখারীর দৈন্য–দশায় পৌছল বলে। বার বার ওরা কেন ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে এর কারণ হয়তো ওরা নিজেরাও জানে না।

মীরপুরে অসম্পূর্ণ বাড়িঘর অনেক। ঘন–ঘিঞ্জি বসতি। ছোট ছোট সংকীর্ণ অন্ধকার এবং জীর্ণ ঘর। এরা যে কোন মতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করেছে কষ্টসাধ্য

www.pathagar.com

পরিশ্রমে, তা এই বাড়িঘরগুলোর নমুনা দেখলেই বোঝা যায়। কতগুলো বাড়ি এখন অর্ধদগ্ধ, কতগুলো পুরোপুরি ভষ্মীভূত। কপাল থাপড়ে, বুক চাপড়ে এখনো অনেক মহিলা দুঃখের মাতম করছে। এত বেলাতেও কারো খাওয়া হয়নি। সবাই অনাহারে, শিশুরা তারস্বরে কাঁদছে। কিছু পুরুষ মানুষ খোলা আকাশের নিচে কপালে হাত রেখে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে।

রবার্ট অগ্নিদগ্ধ বাসগৃহ এবং শোকাহত মানুষগুলোর স্ন্যাপ নিচ্ছে। রোহানা চৌধুরী ক্যামেরায় হাত লাগায়নি। মানুষ যখন চরমভাবে নির্যাতিত হয় তখন সেই দুঃখের ধ্বংসস্তুপের উপর বসে শান্তির ললিতবাণী শোনানো পরিহাস মাত্র।

তবু অনেক খবর সংগৃহীত হলো। হাফ ডজন বিহারী ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বাঙ্গালীরা। এখন পর্যন্ত তাদের কোন হদিশ মেলেনি। কিছু শিশুকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধ্বংসস্তুপে খোঁজা হচ্ছে। এক মা তাড়াহুড়ো করে তার শিশুকে ঘরে ফেলে রেখেই চলে এসেছিল বাইরে। তার দুঃখ যেমন গগণবিদারী তেমনি মর্মস্পর্শী। হৃদয় নিংড়ানো বিলাপে সবার চক্ষু অশ্রুসজল, হ্যায় খোদা, ম্যায় কিয়া কিয়া। ম্যায় ক্যায়সে আপনা বাচ্চাকো ভুল গিয়া থা। হ্যায় মেরা বদনসিব, হ্যায় খোদা, মেরাপর গজব ঢাল দেও।

মাথার চুল ছিঁড়ছে ভদ্র মহিলা। বুক থাপড়াচ্ছে। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে রেখেছিল বিছানায়। নিরুপদ্রব আরামে ঘুমুচ্ছে আড়াই বছরের শিশু। কলোনী আক্রান্ত হতেই শোরগোল, আগুন আগুন। গন্ডগোল শুনে মা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ঘটনা বোঝার জন্য। ইতিমধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছে সমস্ত এলাকা।

রবার্ট ইশারা করল, মিস চৌধুরী, এদিকে এসো। পোড়া ধ্বংসস্তুপের নিচে আমি একটা শিশুর দেহ দেখছি।

–চল তো দেখি বেঁচে আছে কিনা।

–পাগলামি করো না। পুড়ে চারকোল হয়ে আছে। তাই ওরা চিনতে পারে নি।

–তুমি চিনলে কি করে?

–একজনের হাতে প্লাসটিকের পুতুল দেখেছি। আমার চিনতে ভুল হয়নি।

–মৃত দেহটা পেলেও বাবা–মা সান্ত্বনা পেতে পারে।

–না মিস চৌধুরী। ওতে আরো দুঃখ বাড়বে।

–যে ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে তাদের খোঁজ পেলেও এরা কিছুটা সান্ত্বনা পেত।

–কল্পনা বিলাসী হয়ো না মিস চৌধুরী। ওদের অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে। কারো উপর রাগ থাকলে তিল তিল যন্ত্রণা দিয়ে মারে। শট্ করলে মনের ঝাল মেটে না।

রবার্টের যুক্তি এবং সাইকো এনালাইসিস উড়িয়ে দিতে পারল না রোহানা। কিন্তু এই দুঃসময়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যত গভীর দুঃখ তত মর্মভেদী। রোহানা চৌধুরী নীরব শ্রোতা।

www.pathagar.com

–চল ফেরা যাক।

রবার্টের গাড়ি পথে আটকে গেল। পথে বেরিকেড। একটা বাস থেমে আছে। যাত্রীদের নামিয়ে রাস্তার ঢালে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনা কি ঘটবে মুহূর্তে অনুমান করে ফেলল রবার্ট। রোহানাও বুঝতে পারল। যশোর খুলনা হয়ে আরিচা ঘাট থেকে বাসটি ঢাকার দিকে আসছে। যাত্রী বেশির ভাগ চাকুরীজীবী এবং ব্যবসায়ী। মহিলা এবং শিশুও আছে।

একটু পরেই গুলীর শব্দ।

–শুয়ে পড় মিস চৌধুরী, রবার্ট তাকে টেনে এনে গাড়ির আড়ালে শুইয়ে দিল।

–এসব কি হচ্ছে রর্বাট?

–পাল্টা প্রতিশোধ। বিহারীরা বাঙ্গালীদের গুলী করে মারছে।

–নিরপরাধ লোক হত্যা?

–বিহারীরাও নিরপরাধ ছিল, ফিসফিস কণ্ঠস্বর রবার্টের। প্রতিশোধ আসল অপরাধীঁদের উপর নেয়া যায় না। তারা সতর্ক থাকে। গা ঢাকা দিয়ে থাকে। সুতরাং প্রতিশোধ নেয়া হয় নিরপরাধ জ্ঞাতি–গুষ্টির উপর। রক্তের স্রোত বইছে। লাশগুলো দুমড়ে মুচড়ে আছে। শিশু ও মহিলারা কাঁদছে। তাদের মারা হয়নি।

–তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠ মিস চৌধুরী। গ্রামবাসীরা এসে পড়ল বলে। আরো সাংঘাতিক কান্ড ঘটে যেতে পারে।

–মহিলা–শিশু, এদের কি হবে?

–আমি পুলিশ বক্সে খবর দিয়ে যাব।

–কিন্তু সামনে যে বেরিকেড।

–আমি ডাইভার্সন বের করে নেব। ঢাল বেয়ে নেমে যাব। এ ছাড়া কোন উপায় নেই। তুমি বেল্ট বেঁধে নাও।

গাড়ি স্টার্ট দিতে না দিতেই দূরাগত কোলাহলের শব্দ ভেসে এল কানে। মনে হলো, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ বিকট গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে বেলাভূমির দিকে। উন্মত্ততার আক্রোশে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু। হঠাৎ ওমর বাটের কথা মনে পড়ল রোহানার। তার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। মনে হলো তার অন্তরের পানিটুকু এই মুহূর্তে কে শুষে নিল। ওমর বাট পিতৃপুরুষ সূত্রে বিহারী। জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী। ওর কি হবে এদেশে? কি করে ও এখানে বাঁচবে?

–এমন করছ কেন মিস চৌধুরী?

–কিছু না, মাথাটা ধরেছে।

–ওষুধ খাবে? আছে আমার কাছে।

–না।

রবার্ট কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। চিন্তিত কণ্ঠস্বর তার, বুঝেছি, এসব দুর্ঘটনা দেখা

www.pathagar.com

তোমার অভ্যেস নেই। খুব বিচলিত হয়েছ। তুমি বরং আমার সঙ্গে আর এসো না।

–তা হয় না রবার্ট। এসব ঘটনা আমার দেশেই ঘটছে, আমাদের দ্বারাই ঘটছে। অতএব আমি বা আমরা দেখবনা তো দেখবে কে? তোমরা অতিথি, কয়দিন পরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ভাল ফল ভোগ করলে আমরাই করবো, মন্দ হলেও আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

রবার্ট চুপ করে রইল। এই মেয়েটিকে সে যতদূর চিনেছে, সহজ, সরল স্পষ্টবাদী। এই ধরনের মেয়েরাই আত্মপ্রত্যয়ী হয়। সে যা মুখে বলছে কাজেও তাই করবে। দু'জনেই চুপ। আশি মাইল স্পীড দিয়েছে রবার্ট তার গাড়ির স্পীডমিটারের কাঁটায়। পুলিশ বক্সে একটা খবর দিতে হবে।

রাত দশটায় রোহানাকে দেখে চমকে উঠল ওমর বাট, রোহানা তুমি?

–আসতে হলো।

–কেন আসতে হবে এত রাতে? তুমি যে একজন মহিলা সে কথা কি ভুলে যাও? খিঁচিয়ে উঠল ওমর বাট।

রোহানা অবাক। এমনভাবে কখনো কথা বলে না ওমর। ওর কাপড় চোপরে কালি। ও মেশিন চালাচ্ছিল। চুল উস্কোখুস্কো। চোখের কোলে কালি পড়েছে অনেক আগেই।

–আমার ঘরে গিয়ে বস। কাজ শেষ করে আমি আসব, ওমরের কথাগুলো কর্কশ এবং বিরক্তিতে ভরা।

ওমর যখন কাজ শেষ করে এল তখন রাত বারোটা। বলল, কমপোজিটররা যে ঘরে গ্যালিতে কাজ করছে ওই ঘরে চল।

–কেন, এখানে কথা হয় না?

–না হয় না। এত রাতে বেডরুমে বসে মেয়েমানুষ নিয়ে গালগল্প করছি এটা কারো চোখেই সম্মানজনক ব্যাপার না।

চোখ ফেটে পানি এল রোহানার। ওমর দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো মিথ্যে না হলেও কি বিশ্রি ভাবে বলল ও।

রোকন সাহেব একটা টুল ছেড়ে দিল।

–বসুন মা। আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন ওমর সাহেব। মা ততক্ষণে এখানে অপেক্ষা করুন।

ওমর চলে যেতেই রোহানা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রোকন সাহেব বয়স্ক মানুষ, কণ্ঠস্বর বড়ই স্নেহপূর্ণ, ছিঃ মা কাঁদে না। ওমর সাহেবের কি দোষ, রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা খাটলে কোন মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে?

চোখ মুছে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল রোহানা, চব্বিশ ঘন্টা খাটে কেন?

www.pathagar.com

–ঐ যে আপনার পত্রিকা, এখান থেকেই ছাপা হয়, এই শর্তে যে ওমর সাহেব দুই শিফটে কাজ করে পুষিয়ে দেবেন। প্রিন্টিং চার্জ দেয়ার মত তো তার হাতে নগদ টাকা নেই। মানুষটা দুটো টাকা খরচ করে পেট পুরে খায় না পর্যন্ত।

দুঃখে কষ্টে বুক ফেটে যেতে লাগল রোহানার। ওমরকে সে নিজেই তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, ছি!

ওমর ততক্ষণে ফিরে এসেছে, কি বলবে বল।

রোহানা চুপ, মুখে কথা নেই।

–মা, আপনি ওমর সাহেবের ঘরে গিয়ে বসুন গে, নিরিবিলিতে কথা বলতে পারবেন।

–না, আপনার এখানেই বলব।

ওমর বুঝল, রোহানা রাগ করেছে। মনে মনে হেসে বলল, বেশ এখানেই বল।

–আমি আর পত্রিকা ছাপাব না।

–ওমর জানে, রোহানা এ কথা বলার জন্য এত দূর ছুটে আসেনি। এটা ওর মনের কথাও না। বর্তমান মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। গুরুতর কিছু বলবে বলেই ছুটে এসেছে।

মুখে সেও রাগ দেখাল, একথা আগামীকাল ফোনে বললেও পারতে।

–আগামীকাল আমি ঢাকায় থাকব না।

–কোথায় যাবে?

–টাঙ্গাইল।

–কেন যাবে জানতে পারি?

–ওখানে ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে।

–পত্রিকাই যখন ছাপাবে না তখন যুদ্ধের খবরের দরকার কি?

থতমত খেল রোহানা। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এমনিই।

বিষণ্ন হাসি ওমরের ঠোঁটে, বেশ এখন আমার ঘরে যাও। ঘর না বলে খুপরি বলাই ভাল। তবু তো একটা আশ্রয়। আমি এখন প্রেসে কাজ করব।

–আমি বাসায় ফিরে যাব।

–পাগলামি করো না, এখন অনেক রাত। তোমার বাসার গেট এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলের গেট এত রাতে কেউ খোলা রাখবে না। রাখা উচিতও না।

রোহানা বিস্মিত, তার আস্তানার খবর ওমর তাহলে জানে। কোনদিন মুখ খুলেনি। রোকন সাহেব বললেন, মা, বুড়ো মানুষটার কথা শুননু। ওমর সাহেবের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। উনি সারারাত প্রেসেই কাজ করবেন। আপনি রাগ করে ছেলে মানুষি করতে চাইলেই কি আমরা তা করতে দেব?

সকালে রোহানা কখন চলে গেছে ওমর জানে না। বিছানার তেমন নড়চড় হয়নি। শুধু বালিশ ভেজা। মেয়েটা সারা রাত কেঁদেছে। প্রেসে ফিরে এল ওমর। রোকন সাহেব

www.pathagar.com

ডাক দিলেন, ওমর সাহেব এদিকে আসুন। কথা আছে।

ওমর কাছে এল।

–মা যাওয়ার সময়ে আমাকে বলে গেলেন, আপনি যেন পত্রিকা বিক্রি করতে বাইরে না যান।

ওমরের দৃষ্টিতে সবিস্ময় প্রশ্ন। রোকন সাহেবের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, মা আরো বললেন, বাইরে বাঙ্গালী–বিহারীতে খুনোখুনি বেঁধেছে। যে যাকে পারছে মারছে, ত্রিমুখী লড়াই, পাঞ্জাবী–বিহারী–বাঙ্গালী। দেশটার অবস্থা কি হবে!

ওমর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে যে অবাঙ্গালী, এ চিহ্নগুলো স্বয়ং বিধাতা তার দেহে ঢেলে দিয়েছেন। গায়ের রং অতিরিক্ত ফর্সা, চুল কটা, চোখের রং নীল। জয়নালের ঘরে থাকতে ওমর একদিন বলেছিল, রোহানা আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দাও।

রোহানার বিস্ময়ভরা প্রশ্ন, কেন?

–চুলের রং ঢাকতে পারি, চোখের রং বদলাতে পারি না। আমার জন্য তুমি কোনদিন না বিপদে পড়।

রোহানার দু'চোখ অশ্রুতে ভরা, ওমর তার আগে আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে যাক। তোমার চোখ দু'টোকে যে আমি বড় ভালোবাসি ওমর। সমুদ্র গভীর বলেই তার পানি নীল। তোমার দু'চোখ ভালবাসায় আপ্লুত বলেই অত নীল। তোমার চোখের তারাতে আবেগের নীল সুখ। ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি ওমর।

ওমর আর কোনদিন এ কথা বলেনি। অনেকদিন পরে আজ আবার মনে হলো, হে বিধাতা আমার চোখ দু'টো অন্ধ করে দাও। রোহানাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো, আমার সুখের জন্য না, এ দেশের মঙ্গলের জন্য।

অনেকক্ষণ কথা নেই ওমরের মুখে। সে বিমূঢ়, বিচলিত। রোকন সাহেব বললেন, মা মিথ্যে বলেননি। বিহারী বাঙ্গালীতে দাঙ্গা বেঁধেছে।

ওমর দৃঢ়তা নিয়ে কথা বলল, রোকন চাচা, পত্রিকাগুলো বাইরে গিয়ে আমাকে বিক্রি করে আসতেই হবে। এইটুকু ছাড়া আর কোন সম্বল নেই রোহানার।

–বুঝলাম না ওমর সাহেব।

–পত্রিকার আয় ছাড়া রোহানার কোন আয় নেই।

–বলেন কি?

–সত্যি বলছি।

–মা কি চাইবেন, আপনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার জন্য পয়সা উপার্জন করুন।

–তা হয়তো ও চায় না। কিন্তু আমি চাই না ও আর কারো কাছে হাত পাতুক। তাছাড়া আপনি হয়তো জানেন না, ওর একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ আছে এই জাতি, দেশ এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে। ওর চিন্তাধারায় ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসায় না। এই

www.pathagar.com

পত্রিকার মারফত ও ওর নিজের ফিলোসফি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চায়।

–এই যুদ্ধের সময়ে ভিন্ন মতাদর্শ প্রচারের সুযোগ কি আছে ওমর সাহেব?

–রোহানাকে আপনি চেনেন না রোকন সাহেব। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যাঁদের কাছে জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়। ও তেমন একজন মানুষ। মেয়ে বলে হয়তো তেমনভাবে ও কারো চোখে পড়ে না।

এরপর অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। হঠাৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল রোকন সাহেবের, ওমর সাহেব, আমি বুড়ো হয়েছি। হয়তো আজকালের ছেলেমেয়েদের তেমনভাবে চিনি না। কিন্তু আপনাদের দু'জনকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। আজকালের ছেলেমেয়েদের ভালবাসা সম্পর্কেও আমার কেমন একটা বিশ্রী ধারণা ছিল। মনে হতো, ফাজলামো, খুনসুটি এবং উত্তেজনা ছাড়া এগুলো আর কিছুই না। কিন্তু মা এবং আপনার ভালবাসা দেখে আমার এ ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। স্বার্থহীন এমন গভীর ভালবাসা আমি আর কখনো দেখিনি।

ওমর চুপ। গভীর মনোযোগ দিয়েই সে শুনল এই শুভার্থী বৃদ্ধের কথা। ভালও লাগল। কিন্তু তার বুকের ভেতরে তপ্ত নিঃশ্বাসের অন্তহীন জ্বালা। মনে হয়, বুকটা আগ্নেয়গিরির এক জ্বালামুখ।

পত্রিকা বিক্রি করতে গিয়ে আজ সত্যি সত্যি ওমরের ভয় করতে লাগল। চোখে রঙিন সানগ্লাস। চুল কালো করেছে ডাইং করে। গায়ের রং বদলানো যায় না। তবু ময়লা কাপড় চোপড় পরেছে। বাধা-ধরা গ্রাহক মোটে ডজন খানেক। আজকাল তারাও আমতা আমতা করে পত্রিকা কিনতে। প্রচ্ছদের ডিজাইন সুন্দর করে আঁকাতে পারে না আর্টিস্ট দিয়ে পয়সার অভাবে। ক্যাপশন ভাল দেয়, যার জন্য পত্রিকা তবু কেউ কেউ কেনে। কেউ কেউ হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ। আসলে পত্রিকার মান যাচাই করতে গিয়ে তারা পড়েই ফেলে। অতএব পয়সা খরচ করে পত্রিকা কেনার দরকার মনে করে না।

আজ হাফ ছুটি। সপ্তাহে এই আধা দিন তার ছুটি মেলে। এইটুকু সময়ের মধ্যে তাকে তাড়াহুড়ো করে পত্রিকা বিক্রি করে ফেলতে হয়। গুলিস্তান থেকে বাস ছাড়তেই বাসযাত্রীদের হাতে পত্রিকা এগিয়ে দিল ওমর। হঠাৎ এক সুবেশধারী যুবক পত্রিকা হাতে নিয়ে বলে উঠল, আরে! আপনি ওমর বাট না?

ওমরের বুকের মধ্যে ভূমিকম্পের কম্পন। মনে হলো সে এক্ষুণি পড়ে যাবে বাসের জনতার মধ্যে। মুহূর্তে ধানমন্ডির আট নম্বর রাস্তার মোড়ের সেই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একজন বিহারী যুবক, জনতার ভিড়, মুহূর্তে যুবকের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, রক্তস্রোত। একজন রাস্তার ইট দিয়ে মাথা ঠুকছে, পাছে হতভাগ্য বেঁচে যায়। মাথা ফাঁক হয়ে গেল। মগজ বেরুল, তারপর ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিক। ওমর

www.pathagar.com

ঘামছে।

–আরে কথা বলছেন না কেন? আপনি ওমর বাট না?

ওমরের থমমত কণ্ঠস্বর, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।

মুহূর্তে ভদ্রলোকের ভদ্র মেজাজ অন্তর্হিত, তা পারবেন কেন? এতকাল একসঙ্গে পত্রিকা অফিসে কাজ করলাম, এখন তো আপনার বাবারা দেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, ডান্ডা ঘুরিয়ে শাসন করছে, তাই এত জোর। তা জোর কয়দিন টিকবে?

বাসযাত্রীরা নীরব। মনে হচ্ছে, তাদের ভেতরে উত্তেজনা বাড়ছে।

ওমরের বিনীত কণ্ঠস্বর, হাত জোড় করে বলল, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি চিনি না। আমি একজন হকার, এই দেখুন, হাতে কত পত্রিকা, এই করেই জীবিকা অর্জন করি। আমার মত গরীব এবং অশিক্ষিত মানুষ পত্রিকা অফিসে কাজ করবে কি করে? পত্রিকা আনতে যাই বিভিন্ন কাগজের অফিসে। তাই হয়তো আমাকে দেখে থাকবেন।

যাত্রীরা এখন অনেকেই দ্বিধান্বিত। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস কণ্ঠস্বর। ভাগ্য ভাল ওমরের। বাস থামল স্টপে। ওমর তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ল। নেমে পড়ার আগে ভদ্রলোককে সালাম জানাল।

–শালা, অভিনয় করে বেঁচে গেলি। তবে কয়দিন?

জনতার মধ্যে মিশে গেল ওমর। বুক ভরে তাজা নিঃশ্বাস নিল। বাতাস এতক্ষণ রুদ্ধ হয়ে ছিল তার শ্বাসনালীতে। আঁশফাস লাগছিল। মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়ে আছে বাসের পেটের ভেতরে।

পথে নেমে ভাবল ওমর, আনসার সাহেবকে দেখে যাওয়া যাক। রোহানা বার বার বলেছে ভদ্রলোকের একটু খোঁজ-খবর রাখতে। সময় হয় না, পত্রিকা বিক্রি হয়নি। মন খারাপ। তবু যখন শ্বাস ততক্ষণ আশা। জীবন নামক ঠেলাগাড়িকে পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। তিন নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকতেই এক অপরিচিত ডাক্তারের কণ্ঠস্বর, ওমর সাহেব না?

নিজের পরিচয় ঢাকার মত লজ্জা এবং আত্ম অবমাননা আর নেই। ওমরের নিঃসংকোচ উত্তর, হ্যাঁ।

–এখানে কেন এসেছেন?

–এক পরিচিত ব্যক্তি অসুস্থ, তাঁকে দেখতে।

–আরে আপনার হাতে অত বড় বান্ডিল কিসের?

–পত্রিকার।

–তা এতগুলো?

–বিক্রির জন্য এনেছিলাম, হয়নি।

–আসুন আমার সঙ্গে।

www.pathagar.com

ইতস্তত ভাব ওমরের।

–আমাকে চিনতে পারছেন ?

–না ভাই।

–আমি আলী রেজা।

ওমর নীরব।

–বুঝতে পারছি, এখনো আমাকে চিনতে পারেননি।

এক বছর আগের কথা মনে করুন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সোহেলকে নিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন। সোহেল আমার বন্ধু। ও আমাকে দেখতে এসেছিল। আপনি ছিলেন সঙ্গে। মনে পড়ছে?

–হ্যাঁ।

–আমি তখন সুটকেস গোছাচ্ছি দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য, সোহেলের জিজ্ঞাসা, এই সামনে না তোর ফাইনাল পরীক্ষা, এখন বাড়ি যাচ্ছিস উজবুকের মত? আমার উত্তর, পরীক্ষার ফরম ফীলাপ করতে পারলাম না, তা আবার পরীক্ষা?

–কেন রে?

–আজকে ফরম সাবমিট করার লাস্ট ডেট। অথচ বাবা টাকা পাঠাতে পারেননি।

–বলিস কিরে? এতগুলো বছর কষ্ট করে পড়লি, আর তীরে এসে ডুবল তরী?

–কি করব ভাই। গরীবের লাঞ্ছনা পদে পদে।

আপনি তখন সোহেলের পাশে দাঁড়িয়ে। আপনাকে আমি চিনি না, আপনি আমাকে চেনেন না। তবু কথা বলে উঠলেন, কত টাকা দরকার আপনার?

–অন্ততঃ শ' পাঁচেক।

–ফরম জমা দেয়ার সময় আছে?

–বেলা দু'টো পর্যন্ত। এখন তো মোটে এগারোটা বাজে।

আপনি পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন, বললেন, টাকাটা নিন। কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। এখুনি যান অফিসে। এইটুকু মনে রাখবেন, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকের বন্ধু হতে কোন বাধা নেই। মানুষ সামাজিক জীব তাই পরস্পরের হৃদয়ের বন্ধন সহজাত।

আপনার কথার উত্তর দেয়ার সময় ছিল না আমার। টাকা এবং ফরম নিয়ে ছুটলাম অফিস মুখে। মনে পড়ে এসব?

–হ্যাঁ।

–আজ আমি পুরোপুরি ডাক্তার। আপনি কিন্তু কোনদিন টাকাটা ফেরৎ নিতে আসেননি।

ওমর নীরব।

–চলুন আমার অফিসে।

www.pathagar.com

–আমার হাতে সময় খুব কম।

–কোন অজুহাত শুনছিনে। আপনাকে অনেক খুঁজেছি, পাইনি। আজ পেয়ে ছাড়ছি নে।

আলী রেজা ওমরের হাত ধরে নিয়ে গেল তার অফিস রুমে। চেয়ারে বসিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিল।

–এবার বুলন কি ব্যাপার।

–ওমর বলল, কিছু বলার নেই, চলছে কোনমতে।

–তা বুঝতেই পারছি। এককালের ডাকসাইটে সাংবাদিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বিক্রি করছে।

ওমর নীরব। ডাঃ আলী রেজা একটা পত্রিকা খুলে সবিস্ময়ে বলল, আরে এযে দেখছি রোহানা চৌধুরীর দর্শন। আজকাল এই পত্রিকার বিষয়বস্তু নিয়ে ইনটেলেকচুয়াল মহলে বেশ তোলপাড় চলছে। প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলছে না অবশ্য। আপনি এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত?

–হ্যাঁ।

–এডিটোরিয়াল আপনি লেখেন?

–প্রতিবেদন বাদে আমিই সব লিখি।

–প্রতিবেদন কে লেখেন?

–রোহানা চৌধুরী নিজে।

–আপনি বাঙ্গালী না হয়েও বাঙ্গালীদের এত ভালোবাসলেন কি করে?

ওমর হাসল। জবাব দিল না। ডাঃ আলী রেজা পত্রিকার সংখ্যা গুনল। দাম হিসেব করে চারশ টাকা টেবিলের উপর রেখে বলল, এগুলো আমি কিনলাম। দামটা নিন।

–পাগলামি করবেন না। এতগুলো পত্রিকা নিয়ে আপনি কি গুলে খাবেন?

–ডাক্তার পাগল হলে পাগলের চিকিৎসা করবে কি করে? আমার হিসেব ঠিক আছে। পত্রিকাগুলো আমি বিভিন্ন জনের কাছে বিক্রি করে দেব। ডাক্তার, নার্স, স্টাফ, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী সবাই কিনবে।

–বলেন কি?

–আপনার পত্রিকা, অথচ আপনি এর গুনাগুণ জানেন না। পত্রিকার গল্প, টিকাটিপ্পনী, তথ্য পরিবেশন সব চমৎকার। শুধু রোহানা চৌধুরীর রাজনৈতিক মতবাদগুলো বিতর্কিত ব্যাপার। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহল এটাই পছন্দ করে বেশি। মুখ খোলা সম্ভব নয় বলেই খোলে না। প্রতিবেদনের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। চলতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রোহানা চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। অর্থাৎ আমাদের পাঁঠা আমরা লেজের দিকেই কাটি অথবা মাথার দিকেই কাটি, তাতে অন্যের কি? অর্থাৎ এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া কেন জড়িয়ে পড়ছে, তার স্বার্থ কোথায়, এটাই এভাবে সেভাবে বিশ্লেষণ করছে প্রতিবেদক। স্বার্থান্বেষী মহল এটা বরদাস্ত করতে চাইছে না। তারা বাই হুক অর ক্রুক যুদ্ধে জিততে চাইছে। এতে রক্তক্ষয় কম হবে, এই তাদের ভাষ্য। কিন্তু প্রতিবেদক বলছে, এই প্রজন্ম এবং আসছে প্রজন্মকে এর দায় শোধ করতে হবে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। কয়েক যুগ হয়তো বা শতাব্দীব্যাপী। তাতে যে জানমাল, সম্পদ এবং সম্মানের ক্ষতি হবে তার তুলনা মেলা ভার। জাতির মরেল ধ্বংস হবে। অবক্ষয়জনিত এই মুল্যবোধ হ্রাসের বেদনা বহন করতে হবে সমস্ত জাতিকে। এগুলো ভেবে দেখার মত বিষয় ওমর সাহেব।

–কে ভাববে? হু উইল বেল দা ক্যাট?

–ঠিক বলেছেন ওমর সাহেব। কেউ যুদ্ধ উন্মাদনায় জড়িয়ে পড়েছে, কেউ আপনজনকে হারিয়ে কাঁদছে, কেউ সহায়–সম্বলহীন হয়ে পথে পথে ঘুরছে। কে ভাববে রোহানা চৌধুরীর ফিলোসফি নিয়ে?

একটু চুপ থেকে ডাঃ আলী রেজা বলল, এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কের দরকার ছিল। তার বড় অভাব।

ওমর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি রোহানাকে মাঝে মাঝে বলি, অরণ্যে রোদন করো না, কেউ তোমার কথা শুনবে না। শুধু নিজের বিপদই বাড়াবে।

–আপনার কথা আংশিক ঠিক। লেখাগুলো বিপজ্জনক হলেও জীবনের দিক নির্দেশনায় মুক্ত বিবেকের পথ খুলে দেয়। আজ না হয় আগামী শতাব্দীতেও কেউ যদি এই কথাগুলো নিয়ে ভাবে, তবু জাতির জন্য তা মঙ্গলজনক। গায়ে পড়ে অন্য দেশের উপকার করতে আসাটা কিন্তু দূরভিসন্ধিমূলক।

–আশ্চর্য, আপনি ডাক্তার হয়েও এত কিছু ভাবেন?

–ডাক্তার হলেও আমি এই সমাজের, এই দেশেরই একজন। এর ভালমন্দ আমাকেও ভাবতে হবে।

–আলী রেজা সাহেব, আপনার কথা শুনে আপনার উপর আমার ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু টাকাগুলো এভাবে না দিলেও পারতেন।

–সেদিন আপনি আমাকে কথা বলার অবসর দেননি, আজকে আমি আপনাকে দেব না।

–আপনাকে কিছু নিয়মিত গ্রাহক ঠিক করে দেব এই মেডিকেল কলেজে। আপনি শুধু তাদের হাতে পত্রিকা পৌছে দেবেন।

কৃতজ্ঞতায় ওমরের চোখ পানিতে ভরে উঠতে চাচ্ছে। ওমর তা ঠেকিয়ে রাখছে যেমন বালির চড়া ঠেকিয়ে রাখে বহমান নদীর স্রোতকে।

–চলুন, আপনার রোগীকে দেখে আসা যাক, বলে আলী রেজা উঠে দাঁড়াল। ওমর চমকাল আনসার সাহেবকে দেখে। একটা কংকাল যেন ফেলে রাখা হয়েছে বিছানায়।

www.pathagar.com

মুখ ছেয়ে গেছে দাড়ি গোঁফে। অথচ ভদ্রলোক সুদর্শন ছিলেন। আলী রেজা ভাল করে পরীক্ষা করল রোগীকে, রিপোর্ট দেখল। বলল, এমন কোন সিরিয়াস কমপ্লেন নেই। যত্ন এবং পুষ্টির অভাব। ওঁকে রিলিজ করার অর্ডার দেখি দিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওমরের সসংকোচ অনুরোধ, আরো কিছুদিন রাখা যায় না?

–দেখি চেষ্টা করে।

ওমর পকেট থেকে একশ' টাকার একটা নোট আনসার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, ওষুধ এবং পথ্য খাবেন।

ডাঃ আলী রেজা হাসল, কথা বলল না। গেটের কাছে বিদায় দেয়ার সময়ে ওমরের হাত ধরে ডাঃ আলী রেজা বলল, মনে করবেন না, আপনার দেনা শোধ করলাম। টাকা ফেরৎ দেয়া যায়, ভালবাসার দেনা শোধ করা যায় না। আমি আপনার বন্ধু হয়ে রইলাম। প্রয়োজন হলে স্মরণ করবেন আমাকে।

ওমরের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ, রোহানা ছাড়া এদেশে আমার কেউ আপনজন আছে তাই জানতাম না। আজ যে জানলাম এটাই আমার জীবনের দুর্লভ আনন্দ

ডাঃ আলী রেজার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন, আচ্ছা আসুন তাহলে, যতটা পারবেন সাবধানে চলবেন।

ডাঃ আলী রেজাও জানে, সে বাঙ্গালী না। তবু তো মানুষ হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দিল।

আমরা যখন মানুষকে গাল দেই, তখন ভাবা উচিত, সেই গালের উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নিজে। যখন উদারতা দেখাই তখন ভাবা উচিত যাকে দান করছি সেই ব্যক্তিই দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। সে দান গ্রহণ না করলে আমার উদার হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যেত, ওমর মনে মনে কথাগুলো আওড়াল।

চান মিয়ার প্রেস থেকে রোহানা চৌধুরী সরাসরি হোটেল ইন্টারকনটিনেন্টালে এসে হাজির। মিঃ উইলিয়াম রবার্ট সকাল সকাল এখান থেকে টাঙ্গাইল রওয়ানা হবে এই ছিল কথা। কাপড়-চোপরের দিকে তকিয়ে রোহানা নিজেই লজ্জিত। ওমরের ওখান থেকে সরাসরি চলে এসেছে এখানে। পোষাক বদলানো বা পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ পায়নি। ব্রেক ফাস্ট খাওয়া তো দূরের কথা।

– এনিথিং রং মিস চৌধুরী, হোয়াই ইউ লুক সো পেইন?

–আই এ্যাম ফাইন, রবার্ট। ডোন্ট ওরি ফর মী। রাতে ঘুম হয়নি, এই আর কি?

–তাহলে সোফায় বসে কিছুক্ষণ রিলাক্স কর। আমি বাইরে লাউঞ্জে গিয়ে বসি।

–দরকার নেই রবার্ট। গাড়ির ব্যাক সীটে বসে আমি ঘুমিয়ে নেব।

একটু পরেই হোটেল স্যুটে বেয়ারার দু'জনের মত ব্রেক ফাস্ট নিয়ে হাজির।

–বস, খাও।

www.pathagar.com

রোহানা ইতস্তত না করে ন্যাপকিন তুলে নিল হাতে।

মনে মনে আয়াতুল কুর্সি পড়ে নিল রোহানা যাত্রার আগে। মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। মৃত্যুর ভয় পেয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে না বিদেশী সাংবাদিকরাও। কিন্তু ঝামেলা সবাই এড়াতে চায়। এড়াতে চায় মৃত্যুকে। বিনা প্রয়োজনে মৃত্যু গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়াটাও বোকামী। তবে বিপদের মোকাবিলা করে সব সাংবাদিকরাই। রবার্টকে মনে হলো নিরুদ্বিগ্ন এবং উৎসাহী।

মাইল কয়েক যেতে না যেতেই দেখল পথের উপর কালভার্ট ভেঙ্গে দিয়ে বেরিকেড সৃষ্টি করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। এখানে ডাইভার্সন বেছে নেয়া বিপজ্জনক। সাহেবের গাড়ি দেখে একজন দু'জন করে অনেকেই ভিড় করছে। রোহানাকেও দেখছে। সাহেবের সঙ্গে কালো মেম সাহেব। চোখে কৌতুহল কিন্তু অশোভনীয়তা নেই। বিরূপ মন্তব্যও নেই।

একজন এগিয়ে এল, সাহেব তোমাদের সাহায্য করতে পারি?

–হাউ ইজ ইট পসিবল?

–চিন্তা করো না, গ্রাম থেকে আরো লোক ডেকে আনছি। অপেক্ষা কর।

রোহানা অনুবাদ করে দিচ্ছে কথাগুলো।

–কিভাবে সাহায্য করবে?

–দেখোই না। জান রবার্ট, এই যুদ্ধে কি লাভ হয়েছে?

রবার্ট কথা না বলে তাকাল।

–মানুষ এক মন এক প্রাণ হয়ে গেছে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করছে। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে বেশি তৎপর।

রবার্ট এবারও কথা বলল না। মনোযোগ দিয়ে শুধু শুনল। মিনিট বিশেকের মধ্যে হৈ হৈ করে অনেক লোকের আগমন। একজনের হাতে মোটা রশি।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই রবার্ট বলল, আমি গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছি। পেছন থেকে ওরা ঠেলতে থাকুক। সামনে রশি বেঁধে কিছু লোক টানতে থাকুক। তুমি নেমে যাও মিস চৌধুরী। গাড়ি এতে অনেক হাল্কা হবে। গাড়ি উল্টে যেতে পারে, দেখছ না ডাইভার্সন কেমন খাড়া।

–তাতে তোমারও বিপদ হবে রবার্ট।

–তা হোক, আমি স্বার্থপরের মত কাজ করতে পারব না।

–তুমি বুঝতে পারছ না রবার্ট, তুমি নেমে এলে গাড়ি আরো হাল্কা হবে। আমাদের দেশের এইসব লোক অশিক্ষিত হলেও বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। চমৎকার ভাবে কাজটা শেষ করতে পারবে।

–সরি মিস চৌধুরী, বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল রবার্ট।

www.pathagar.com

রেহানা নেমে পড়েছিল। আবার গাড়িতে উঠে বসল। রবার্ট হাসল। কথা বলল না। সব দেশের মেয়েরাই এক রকম। অভিমানী, জেদী, কিন্তু ভালবাসায় স্নিগ্ধ মধুর। সে রবার্টকে বিপদের মধ্যে একলা রাখবে না।

আস্তে আস্তে রশি টানছে সামনের লোকগুলো। পিছনের শক্ত সমর্থ লোকগুলো ব্যালান্স ঠিক রেখে গাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে ঢালে। চমৎকারভাবে গাড়ি চলে এল এপারে।

–থ্যাংকস গড। মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বারবার বলতে লাগল রবার্ট, মেনি থ্যাংকস। তারপর পকেট থেকে বিশটি ডলার বের করে ওদের একজনের হাতে দিল, ভাগ করে নিয়ো তোমরা।

মুরুব্বি গোছের একজন লোক ছো মেরে টাকাটা তুলে নিয়ে রবার্টের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, সাহেব আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু মেহমানদারিত্বে কম না। তা সাহেব যাচ্ছ কোথায়?

–টাঙ্গাইল।

–কেন?

–যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে।

–আমাদের জয়ের খবর এনো।

রবার্ট বিস্মিত। মানুষগুলো গেঁয়ো, অশিক্ষিত। কিন্তু বিজয়ের গৌরবে সবাই উন্মুখ। এ একটা ভিন্ন চেতনা, ভিন্ন দৃষ্টিভংগী। এই হয়তো ওদের দেশপ্রেম।

রোহানা বলল, দেখছ ওরা মুর্খ হলেও যুদ্ধ বিষয়ে কেমন সচেতন?

–হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত উত্তর রবার্টের।

রবার্ট হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, তুমি নিজে কি চাও?

–অবশ্যই “ভি”।

–তোমার পত্রিকায় কি লিখছ?

–যুদ্ধ কেন হচ্ছে তার বিশ্লেষণ। একটু থেমে বলল রোহানা, যুদ্ধ যখন বেঁধে গেছেই তখন জয় তো চাইবই। তুমি চাইতে না?

–চাইতাম, তবে এটা আদর্শিক হলো না।

–কিন্তু মেজরিটি মাস্ট বী গ্রান্টেড, এটাও তো গণতন্ত্রের আদর্শ।

–তা ঠিক। তবে গণতন্ত্রের সব আদর্শ আদর্শ না। গলদ আছে।

–যত গলদই থাকুক সেটা শাসনতন্ত্রের সংশোধনের ব্যাপার। জনসাধারণ তার জন্য দায়ী নয়। গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে জনসাধারণ যা চায় সেটা ন্যায্য। রবার্ট, প্রাসাদের ভিত মজবুত না হলেও প্রাসাদ ওঠে। এর অস্তিত্ব মিথ্যা না।

–তোমার ফিলসফি ঠিক, কিন্তু মানুষ তোমার জটিলতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

–পৃথিবীতে কোন বিবেকবান মানুষই যুদ্ধ চায় না। ধ্বংস, রক্তপাত, হত্যা, অত্যাচার এসব কিছুই চায় না রবার্ট।

www.pathagar.com

–যদি চাপিয়ে দেয়া হয়?

–আমার প্রশ্নটা ওখানেই। যাতে কেউ না চাপাতে পারে সেই চেষ্টা কর যুদ্ধবিরোধী সংগঠন মজবুত কর।

–ওটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

–আজই তার সূত্রপাত হোক। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বলে দীর্ঘদিন ফেলে রাখ যায় না।

–হু উইল বেল দা ক্যাট?

–আমি, তুমি, যে কেউ।

–তুমি তাহলে আরম্ভ করলে?

–হ্যাঁ।

–বিপদের কথা ভেবেছ?

–যে কোনদিন যে কেউ আরম্ভ করুক বিপদ তো আসবেই।

–তুমি খুব সাহসী মেয়ে।

–সাহস দেখাব বলে করছি না। মানব জাতির জন্য এটা আমার কর্তব্য। বলতে পার দিক–নির্দেশনা। আমি মহারথী নই বলে বিবেক অনুযায়ী কথা বলতে পারব না?

–সাধারণ মানুষরাই একদিন অসাধারণ হয়ে যায় তাদের বিবেকের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে।

–আমি তেমন কিছু হতে চাইনা। সারা জীবন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকতে চাই।

–কেমন করে? তোমার দৃষ্টিভংগী, আদর্শ, ভাবধারা সবই তো আলাদা।

–রবার্ট, সব পাখীর চেহারা, কণ্ঠস্বর এক না। তবু তারা একে অপরকে গান শোনায়।

–মিস চৌধুরী, তুমি চমৎকার করে কথা বল।

–থ্যাংকস রবার্ট, আমি আমার অন্তরের কথা বলি, বিশ্বাসের কথা বলি।

এরপর দু'পক্ষই নীরব। মনোযোগ দিয়েই গাড়ি চালাচ্ছিল রবার্ট। মাইল পনের গিয়ে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

–কি হলো?

রবার্ট কথা না বলে বায়নোকুলার রোহানার হাতে তুলে দিল। আজব কান্ড। পাক সেনারা বাঁশের সেতু তৈরী করছে। ব্রিজ রীতিমত উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিচে সরু খাল, পানি আছে, পাক আর্মিদের অনেক জীপ এপারে অপেক্ষা করছে। সেতু তৈরী হলে পার হয়ে টাঙ্গাইলের দিকে যাবে। শোনা যাচ্ছে কালিহাতীতে প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছে। বায়নোকুলার রবার্টের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এখন উপায়?

–আমিও তাই ভাবছি। কথা হলো, ওরা এই সেতুর উপর দিয়ে পার হলে

www.pathagar.com

আমরাও পার হবো।

–দেবে?

–তা দেবে। ফরেনারদের দু'দলই সহযোগিতা করে।

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো রোহানার, কিন্তু কিছু বলল না। রবার্টকে নিরুৎসাহিত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া টাঙ্গাইল তো পৌছতেই হবে। নিকটবর্তী গ্রাম থেকেই পাক সেনারা বাঁশ, কাঠ, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করছে। দু'জন অফিসার নির্দেশ দিচ্ছে, অন্যেরা তড়িৎ গতিতে কাজ করছে। ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত। কারো মুখে কথা নেই। লাঞ্চের সময়। উসখুস করছে রবার্ট। এক সময় ডাক দিল, মিস চৌধুরী।

–বল।

–আমি যদি ড্রিঙ্ক করি, তুমি কিছু মনে করবে?

–নো নো, জোরের সঙ্গে বলল রোহানা।

একটা চীপসের প্যাকেট রবার্ট তুলে দিল রোহানার হাতে, নিজে অন্য একটা প্যাকেট থেকে চীপস মুখে ফেলতে ফেলতে মদের গ্লাসে চুমুক দিল। হঠাৎ গ্লাস থেকে মদ ফেলে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল রর্বাট। রোহানা অবাক। কিছু জিজ্ঞেস করার সময় পেল না। সেতুর কাছে গিয়ে একজন অফিসারকে কি যেন জিজ্ঞেস করল রবার্ট। তারপর ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বাঁশের সেতু কেমন এক রকম আওয়াজ তুলছে। থর থর করে কাঁপছে। রোহানার বুকের ভেতরে ধড়ফড় শব্দ। কিন্তু সে বাক্যহীন।

সেতু পার হয়ে রবার্ট উচ্চারণ করল, থ্যাংকস গড।

এই প্রথম সে সৃষ্টিকর্তার নাম উল্লেখ করল। গাড়ির গতি এখন শ্লথ। হঠাৎ প্রচন্ড গোলাগুলীর আওয়াজ। মাথা নিচু করল রোহানা। রবার্টের মুখে মৃদু হাসি, আমরা গুলীর রেঞ্জের বাইরে। কিছু অনুমান করতে পারছ মিস চৌধুরী?

–পারছি। ওরা সেতুর উপর উঠতেই মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেছে। জান রবার্ট তোমাকে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। তুমি ভয় পাবে বলে শেষ পর্যন্ত বলিনি।

–মিস চৌধুরী, আমি এরকম আগেই অনুমান করেছিলাম, তাই সাত তাড়াতাড়ি পার হলাম ওদের আগেই।

–আশ্চর্য!

–আশ্চর্য হবার মত কিছু নেই। খুব স্বাভাবিক ঘটনা। পাক সেনারা গ্রামে গিয়ে যখন বাঁশ কাঠ ইত্যাদি যোগাড় করে, তখন গ্রামবাসীরাই মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পৌছে দেয়। তারাও তৈরী হয়ে যায়। বাঁশের সেতুর উপর কনভয় উঠলেই ওদের এক নাজুক অবস্থার সৃষ্টির হবে। ওরা পাল্টা আক্রমণে অপরাগ হবে। এই অবস্থার মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা।

www.pathagar.com

গম্ভীর শোনাল রবার্টের কণ্ঠস্বর, বেচারারা খালের পানিতে আহত অবস্থায় হাবুডুবু খেতে খেতে মারা যাচ্ছে। কারো বাঁচার কোন আশা নেই। মাথা উঁচু করলেই গুলী। তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ মিস চৌধুরী, গম্ভীর যে।

–সব মৃত্যুই তো দুঃখের। আমি শুধু ভাবি, পৃথিবী জুড়ে কেন এই যুদ্ধ, কেন এই রক্তপাত? কেন পরিহার করা যাচ্ছে না যুদ্ধ। কোন উপায় নেই?

–উপায় আছে, যেদিন তোমাদের কেয়ামত আর আমাদের ডে অব রিসারেকশন হবে।

–ঠাট্টা করছ রবার্ট?

–কি করব বল? মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ থেকে প্রতিযোগিতা আসে। প্রতিযোগিতা থেকে আসে অন্ধ আবেগের বিরোধিতা। বিরোধিতা জন্ম দেয় সংঘর্ষের। অতএব, পৃথিবীর অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের জীবন তাগিদের এক অনিবার্য সম্পর্কের ফলশ্রুতি এই যুদ্ধ।

–তাহলে সুস্থ প্রতিযোগিতা বলে কোন কথা নেই?

–ওটা আনুমানিক কল্পনা। ধর, একটা লোভনীয় পুরস্কার। রেসে অংশ নিল অনেকে। একজন জিতল, অন্যেরা হারল। যে জিতল সে সৌভাগ্যবান, কিন্তু যারা হারল তাদের বঞ্চনার দুঃখ যাবে কোথায়? ঐ পুরস্কারের তারাওতো ছিল ভাগীদার। পৃথিবীর সম্পদে সবারই সমান অধিকার। অথচ কেউ বেশি ভোগ করছে, কেউ বঞ্চিত হচ্ছে, কেউ সর্বহারা, লাঞ্ছিত। তাদের অংশীদারিত্ব হারানোর ক্ষোভ বাতাসে মিলিয়ে যাবে, এমন ভাবছ কেন? অথবা নিজের হক অন্যকে ছেড়ে দিয়ে নিজে নিঃস্বতার উদারতায় ভুগবে এটাও এক অবাস্তব কল্পনা।

রাস্তায় আর কোন বেরিকেডের সম্মুখীন হতে হলো না, বিপত্তিও হলো না। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল শহরে। রেস্ট হাউজ দু'জনেরই মোটামুটি পছন্দ হলো। নিরিবিলি জায়গা, পরিবেশ ভাল। দু'তলা ছোট্ট দালান। উপর তলার তিনটে ঘর বেছে নিল ওরা। পূর্বের ঘরটা রবার্টকে ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমের ছোট ঘরটা বেছে নিল রোহানা চৌধুরী। রবার্টের প্রবল আপত্তি, তুমি মাঝের ঘরটা নাও মিস চৌধুরী। মঝের ঘর এবং পূর্বের ঘরের মাঝখানে দরজা। খুলতে এবং বন্ধ করতে উভয়ই অসুবিধে। কিন্তু কথাটা রবার্টকে খুলে বললে সে কি ভাববে? রোহানা বলল, মাঝের ঘরটা সিটিং রুম হিসেবে ব্যবহার করলেই ভাল হয়। তোমার কাছে কত লোকজন আসবে।

–লোকজন এলে আমি নিচে চলে যাব। ওখানে ড্রইং রুম আছে।

রোহানা অসন্তুষ্ট হয়েই রুম বদল করল। সে জিনিসপত্র পশ্চিমের ঘরে গুছিয়েই বসেছিল। ভাবল, রবার্ট তার হোস্ট, সে নিজে গেস্ট। তার কথা শোনা দরকার, মনের সায় থাক বা না থাক। কিন্তু বরার্টের জেদেরও কোন কারণ খুঁজে পেল না। পরে এক সময় ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোণার ঘরটায় চলে আসবে। বাবুর্চি দুপুরের লাঞ্চ দিয়ে

www.pathagar.com

গেল। রবার্ট ডাক দিল, এসো মিস চৌধুরী, লাঞ্চ খাও।

–রবার্ট আমি বাইরে খেয়ে নেব।

–মিস চৌধুরী, আমি দু'জনের খানার অর্ডার দিয়েছি। যতদিন আমরা এখানে থাকব, তুমি আমার গেস্ট হয়ে থাকবে।

–আতিথেয়তার বাড়াবাড়ি হবে না রবার্ট?

–মিস চৌধুরী, তুমি যেমন বল, যুদ্ধ হচ্ছে মানবতা লংঘনের বাড়াবাড়ি, আমার এই আতিথেয়তার উষ্ণতাও তেমনি বাড়াবাড়ি, কি বল?

–সরি রবার্ট, তোমাকে দুঃখ দেয়ার জন্য কথাটা বলিনি। বলেছি তোমার উপর অতিরিক্ত দায় চাপছে বলে।

–আমার কোন অসুবিধে হবে না।

–বেশ চল।

বুকের উপর থেকে ভারি পাথর নেমে গেল রোহানা চৌধুরীর। তার টাকার ব্যাগ প্রায় শূন্য। অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হতো। বাইরে খেতে যাচ্ছে বলে খাওয়ার প্রহসন করতে হতো। তবু এর একটা স্বাধীনতা ছিল। বাধ্য হয়ে খাওয়ার মধ্যে যে লজ্জার দীনতা তা মুছে ফেলা যায় না। তবু এই আন্তরিক আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে রবার্টকে সে নতুনভাবে চিনল। পৃথিবীতে কিছু ভাল মানুষ আছে, চিরকাল থাকবে। তা না হলে পৃথিবীময় রক্তারক্তি হয়ে এর অস্তিত্ব একদিন লোপ পাবে। আমেরিকার উইলিয়াম রবার্ট এই ভাল মানুষদের একজন।

দুপুরে দু'জনেই লম্বা ঘুম দিল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় দরজায় করাঘাত। ধড়মড় কর উঠে বসল রোহানা, কাপড় ঠিক করে দরজা খুলতেই দেখল রবার্ট।

–রবার্ট তুমি?

–তুমি উঠছ না বলে মনে করলাম, তোমার শরীর খারাপ কিনা জেনে যাই।

–শরীর ঠিক আছে। কোথায় যাবে?

–বাইরে। যুদ্ধের খবরাখবর নেব। আমরা কোন্ ফ্রন্টে যাব সেটা জেনে যাওয়াই ভাল।

–আমি তোমার সঙ্গে যাব। এখানে একা থাকতে আমার ভাল লাগবে না।

–বেশ তো চল।

এই অবসরে রোহানা দুই রুমের মধ্যবর্তী দরজার দিকে তাকাল। ওটা বন্ধ। অর্থাৎ রবার্ট বারান্দা ঘুরে এসে তার দরজায় নক করেছে। 'বেঁচে থাক রবার্ট', মনে মনে বলল রোহানা।

–রবার্ট তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি সান্ধ্য নামাজ সেরে আসি।

–আমি নিচে অপেক্ষা করব।

রবার্ট ঘুরে দাঁড়াতেই রোহানা হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা রবার্ট, তুমি কখনো ঈশ্বরের

www.pathagar.com

কাছে প্রার্থনা কর না?

–আমার গ্রান্ড ফাদার গ্রান্ড মাদার করতেন।

–তুমি কর না কেন? এত মৃত্যু দেখছ চোখের সামনে।

–মিস চৌধুরী, জেনেরেশন টু জেনেরেশন প্রার্থনা কমে যাচ্ছে।

–কেন রবার্ট, ঈশ্বর তো একই রকম আছেন।

–মিস চৌধুরী, প্রার্থনা মৃত্যু ভয়ের জন্য। পৃথিবীতে মানুষ যত বাড়ছে জন্ম-মৃত্যুর হারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওগুলো দেখতে দেখতে সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। এদিকে পৃথিবীতে সংঘাত যত বাড়ছে ঈশ্বর তত দূরে সরে যাচ্ছেন।

–রবার্ট, ঈশ্বর দূরে সরে যাচ্ছেন না, আমরা দূরে সরে আসছি। তাঁকে পেতে হলে তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতে হবে, তাঁকে ভালবেসে প্রার্থনা করতে হবে।

–তাহলে তো পৃথিবীতে সংঘাত থাকবে না মিস চৌধুরী।

–তুমি কি চাও সংঘাত টিকে থাকুক?

–আমি চাই না, বিধাতা চান দুটো কারণে। এক. সংঘাতের মধ্য দিয়ে পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়ত মানুষের দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের উপর মানুষের বিশ্বাস এবং ভালবাসার পরীক্ষা হবে।

–আশ্চর্য রবার্ট, তুমি আমাদের ধর্মের মর্মবাণীই শুনাচ্ছ। পৃথিবী যেদিন পাপাচারে পূর্ণ হবে সেদিন কেয়ামত হবে। আর দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই আল্লাহর উপর তাঁর বান্দার ঈমান পরীক্ষিত হয়।

–ইস্ তোমাকে কত দেরি করিয়ে দিলাম। তুমি নিচে যাও। আমি নামায আদায় করে আসছি।

রবার্টের ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ শুনল রোহনা চৌধুরী। ভাবল, মানুষে মানুষে তাহলে পার্থক্য কোথায়? রবার্ট এবং সে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও আদর্শে, ধ্যান-ধারণায় কত মিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। আসলে স্বার্থান্ধতা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। একজন আরেকজন থেকে তখন দূরে সরে যায়।

এস,ডি,ও ভদ্রলোক দু'জনকেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, যুদ্ধের খবরতো শুনবেনই, রাতের ডিনারটাও খেয়ে যাবেন।

–আমরা কিন্তু আপনাকে কষ্ট দিতে আসিনি, রোহানা বলল।

–কষ্ট কিসের? আপনারা আমার মেহমান। কোন অবস্থাতেই বাঙ্গালীরা কিন্তু মেহমানদারি ভুলে যায় না।

রবার্ট মুচকি মুচকি হাসতে লাগল, বলল, রাজি হয়ে যাও মিস চৌধুরী। রেস্ট হাউজের খাবারের কোয়ালিটি ভুলে যেয়োনা।

www.pathagar.com

এস,ডি,ও ভদ্রলোক জানালেন, বল্লায়, বাশাইল, নাগরপুর, কালিহাতী ইত্যাদি জায়গায় ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে। জামুর্কি, এলাসিন, ঘাটাইল ইত্যাদি জায়গাতেও খন্ড যুদ্ধ হচ্ছে। বলতে গেলে সারা টাঙ্গাইলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক একটা ম্যাপও দিলেন রর্বাটের হাতে। এতে টাঙ্গাইলের বিভিন্ন যুদ্ধ ফ্রন্টগুলো দেখানো হয়েছে।

রবার্ট এক নজর ম্যাপ দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমরা ভেবে-চিন্তে কোথায় যাব বের করে নেব। আপনি কি আমাদের আরো একটা খবর দিতে পারেন?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে উঠল প্রশাসকের চোখে।

-পাবনা এই জেলার পশ্চিম দিকে। সিরাজগঞ্জে দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছে। ওখানে যে পথ দিয়ে পাক আর্মি ঢুকবে সেই সব রাস্তায় বিহারীদের মেরে তাদের খন্ড খন্ড টুকরো পথে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মেয়েরাও নাকি এই নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। ঘটনাটা দাবানলের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাক আর্মিও এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। দু'পাশের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে দিতে আর নিরীহ লোকদের গুলী করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল। তারপর খোঁজ করেছিল এস,ডি,ওর। ভদ্রলোক লাপাত্তা। কথাটা কতদূর সত্যি?

ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে ভীতি এবং সংশয় এক সঙ্গে ফুটে উঠল। বিনীতভাবে বলল, আমি নিজের মহকুমার এ্যাডমিনিসট্রেশন নিয়ে ব্যস্ত। অন্য মহকুমার খবরের সত্যতা যাচাই করব কি করে?

-রবার্টের মন্তব্য শোনা গেল, খবরটা সত্যি হলে তা হবে অমানবিক। পাক আর্মি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ভদ্রলোক এই শহরেই আত্মগোপন করে আছেন।

এস,ডি,ও রায়হান খান বললেন, খুঁজে বের করুক। আমি কি করব?

-শহর কিন্তু পাক আর্মিরা লন্ডভন্ড করে ছাড়বে।

মিঃ খানের চোখে আত্মবিশ্বাস, তা ওরা পারবে না। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি খুব শক্তিশালী।

-দু'পক্ষের শক্তি পরীক্ষায় শহরের কি হাল হবে ভেবেছেন?

-যা অনিবার্য তা তো হবেই।

-সেই অনিবার্য ফলাফলের হাত থেকে আপনি রেহাই পাবেন তা মনে হয় না।

এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখাল ভদ্রলোককে। মুখ গম্ভীর। বললেন, এখন কি পাচ্ছি? জীবন বাজি রেখে চাকরিতে জয়েন করেছি, পরিবার পরিজন, বুড়ো বাবা-মা কতজনের দায়িত্ব আমার উপর। চাকরিতে জয়েন না করে উপায় কি বলুন? কিন্তু আমাকে না বিশ্বাস করে পাক আর্মি, না বিশ্বাস করে মুক্তিযোদ্ধারা। কি উভয় সংকট। আমি যেন উভয় পক্ষের দাবার ঘুঁটি।

মন নরম হলো রবার্টের। বলল, খুব সাবধানে থাকবেন, বুদ্ধি বিবেচনা করে কাজ করবেন। পারতপক্ষে কোন পক্ষকে ঘাঁটাতে যাবেন না।

www.pathagar.com

–ধন্যবাদ মিঃ রবার্ট আপনার সুপরামর্শের জন্য।

রোহানা চৌধুরী হঠাৎ কথা বলে উঠল, আচ্ছা মিঃ রায়হান, কেউ যদি এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চায় তাহলে তার কি হবে?

–আমার মত অবস্থা হবে মিস চৌধুরী, দু'পক্ষের চাপে স্যান্ডউইচড। এতে বিপদ আরো ঘনীভূত হবে।

ভদ্রলোককে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হলো। রোহানা চৌধুরী বলল, এই যুদ্ধের বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে দেশপ্রেমের আবেগ। তরুণ–তরুণীরা এই আবেগ নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের যাঁরা পরিচালনা করবেন সেই সব রাজনীতিকরা কতটা বিচক্ষণ, তা কারো ভেবে দেখার অবসর মেলেনি। এই অবসরে তৃতীয় পক্ষ নেমে পড়েছে আসরে। তারাই বানরের পিঠা ভাগের বড় অংশীদার।

–আপনার কথা বুঝেছি মিস চৌধুরী। আপনি এই যুদ্ধের বড় রকমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রবার্ট মুচকি মুচকি হাসছে। এমন সময় থানা থেকে ও,সি এসে বলল স্যার, একটা জরুরী খবর আছে।

–এক্সকিউজমি, বলে মিঃ রায়হান উঠে বারান্দায় চলে গেলেন। ফিরে যখন এলেন মুখ বিবর্ণ।

–মিঃ রবার্ট, একটা দুঃসংবাদ, রেস্ট হাউজে গ্রেনেড চার্জ করা হয়েছে। আল্লাহকে ধন্যবাদ, আপনারা এখানে নিরাপদে।

রবার্ট অবিচলিত উত্তর দিল, তাহলে ওঠা যাক।

–চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।

–আপনি খুব ক্লান্ত। সারাদিন অফিস করেছেন, সন্ধ্যা থেকে আমাদের আপ্যায়ন। আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা ও,সিকে নিয়ে যাচ্ছি।

–ধন্যবাদ। শুনুন, যদি থাকার জায়গা না থাকে তাহলে আপনি এবং মিস চৌধুরী আমার বাসাতেই আজ রাত কাটাবেন। আগামীকাল অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

–দরকার হবে না মিঃ খান। গ্রেনেড চার্জে পুরো দালান বিধ্বস্ত হবে না। দু'একটা রুম অক্ষত পাওয়া যাবে। আচ্ছা আসি তাহলে।

রোহানা নীরব। মিঃ রায়হান বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধারা টাঙ্গাইলে খুব সক্রিয়। কিন্তু রেস্ট হাউজ আক্রমণ করাটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? সেখানে বাস করছে একজন বিদেশী, একজন সাংবাদিক। বিস্ময়ের ব্যাপার, যে ঘরটা প্রথমে বেছে নিয়েছিল রোহানা চৌধুরী, সেই পশ্চিমের ঘরটাই চূর্ণবিচূর্ণ।

রবার্ট ম্লান হাসল, ঈশ্বরের অসীম কৃপা, আমরা অক্ষত রইলাম। তোমার মাঝের ঘরটাতেও থাকা হবে না। দেখছ না, ওর একাংশ ভেঙ্গে গিয়ে ছাদের রড বেরিয়ে আছে। ছাদটা এখন শক্তিহীন। যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে মাথার উপরে ভেঙ্গে

www.pathagar.com

পড়তে পারে।

রোহানা চোখ তুলে তাকাল রবার্টের দিকে।

–চল নিচে ড্রইং রুমে গিয়ে বসি। রাত বেশি নেই। গল্প করে কাটাব।

রবার্ট সিগারেট টানতে লাগল ধীরে ধীরে।

–রবার্ট, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

–ইয়েস, কর।

–তুমি কি জানতে, ঐ কোণার ঘরটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে? তাই ওখানে তুমি আমাকে থাকতে দাওনি।

–মিস চৌধুরী, ব্যাপারটা ছিল অনুমান নির্ভর। মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করছে। তারা আসবে রাতের আঁধারে। পশ্চিম দিকে জঙ্গল। হ্যান্ড বোম্ব বা গ্রেনেড যাই ছুড়ুক না কেন, নির্জন কোণটাই তারা বেছে নেবে। কারণ এখানে আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ আছে।

অন্যমনস্ক দেখাল রোহানাকে। রবার্ট ফের বলল, এমন কি প্লেন থেকে কেউ বোমা ফেললেও কোণার ঘরগুলোই আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

–কেন?

–বোমা সোজাসুজি ফেললেও নাইনটি ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলে এসে পড়ে। তাতে কোণার ঘরে সরাসরি আঘাত এসে পড়ে। তবে বড় ধরণের বোমা হলে সমস্ত দালানটাই ধ্বসে যেতে পারে।

–তোমার অনেক অভিজ্ঞতা রবার্ট।

কোন উত্তর এল না রবার্টের কাছ থেকে। সে সিগারেট টানছে। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন এলো রোহানা চৌধুরীর কাছ থেকে।

–কোন্ যুদ্ধ ফ্রন্টে যাবে বলে ঠিক করেছ?

–চল সিরাজগঞ্জে যাই। বিহারী নিধনের ব্যাপারটা কতদূর সত্য জেনে আসি।

–না। দৃঢ় মুখে প্রতিবাদ জানাল রোহানা। বাঙ্গালীরা বিহারী মারছে, আবার বিহারীরা পাক আর্মিদের সহায়তায় বাঙ্গালী মারছে। এসব বালখিল্য হিংসাজনিত খুনাখুনি দেখতে আমার ভাল লাগবে না। তার চেয়ে সরাসরি যুদ্ধ ফ্রন্টে যাই। পুরুষসুলভ বীরত্ব দেখি।

হাসল রবার্ট, তুমি চমৎকার কথা বলতে পার মিস চৌধুরী। তোমার কথাই রাখা যাক। সকালে ব্রেক ফাস্ট করে নিয়ে বল্লার দিকে যাব। ওখান থেকে কালিহাতী। কালিহাতী থেকে ঘাটাইল। পথ–ঘাট কেমন, জান?

–না, তবে এটুকু জানি, পথে মাইন পাতা থাকলে আর ফিরে আসতে হবে না।

–যুদ্ধফ্রন্ট থেকেও ফিরে না আসতে পারি। তবে পথে–ঘাটে মৃত্যু ভাল না। মাইন পেতে রাখার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

ভোর হতেই কোনমতে হাতমুখ ধুয়ে নিল দু'জনে। এখন ব্রেক ফাস্টের সমস্যা। বয়-বাবুর্চি-বেয়ারার সব ভয়ে পালিয়েছে। রোহানা বলল, তুমি থাক, আমি বাজার থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসি। রবার্টের ছেলেমানুষের মত জেদ, উঁহু তা হবে না। আমি যাব তুমি থাক। তোমাদের এই শপিং সেন্টারগুলো আমার ভাল লাগে।

-ওহ গড, রোহানার হাসি ফুরুতে চায় না, শপিং সেন্টার? বেশ গালভরা নাম দিয়েছ তো? এগুলো ভিলেজ মার্কেট ছাড়া আর কিছু না। এলোমেলো অবিন্যস্ত কিছু দোকানপাট। বেশ যাও। রাত জেগে আমার গা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। তুমি গেলে আমি সোফায় গড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেব।

-ও কে থাংকস, বলে রবার্ট বেরিয়ে গেল।

ঘন্টাখানেক পরে ফিরে এল রবার্ট, রিক্সায় কাঁঠাল আর মস্তবড় এক মানকচু। রবার্টের হাতে পাউরুটি। রিক্সা থেকে ও দু'টো জিনিস নিজেই নামাল রবার্ট, রোহানার চক্ষু চড়কগাছ। পরমুহূর্তে হাসিতে ফেটে পড়ল। রবার্ট যত জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ রং, তত হাসে রোহানা।

গম্ভীর রবার্ট, কি হয়েছে বলবে তো?

-কাঁঠাল এবং কচু কিনেছ কেন?

-পাউরুটি খাব কি দিয়ে? এগ কিনলে ফ্রাই করবে কে?

আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল রোহানার ঠোঁটে। রবার্ট গম্ভীর। রোহানাও হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলো, বলল, কাঁঠাল ভাল ফল, খুব ডেলিশাস। কিন্তু বেশি খেলে তোমার লুজ মোশন হতে পারে। ঐ যে, যেমন পরোটা গোস্ত খেয়ে দৌলতদিয়ার পথে হয়েছিল।

রবার্ট হেসে ফেলল।

-আর তোমার কচু কাঁচা খাওয়া অসম্ভব। গলা চুলকাবে, পাগল হয়ে যাবে।

রোহানা ভালই বুঝাতে পারল, কেউ রসিকতা করেছে রবার্টের সঙ্গে।

-হোয়াট? রবার্টের সবিস্ময় প্রশ্ন।

রবার্ট কচুর এ্যাকশন কিছুতেই বুঝতে পারে না, রোহানাও না বুঝিয়ে ছাড়বে না। অবশেষে দু'জনে একত্রে হাসতে লাগল। এমন সময় মিঃ রায়হান খান এসে হাজির। সব শুনে তাঁর মুখেও মৃদু হাসি। বললেন, টিফিন ক্যারিয়ারে আপনাদের ব্রেকফাস্ট আছে। খেয়ে নিন। ওগুলো রেখে দিন গরীব ছেলেমেয়েরা নিয়ে যাবে।

টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার তিন ভাগ করল রোহানা। বলল, মিঃ খান, আসুন একত্রে খাই। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি কিছু খাননি। এই প্রাতঃরাশের কথা আমাদের সবার চিরদিন মনে থাকবে।

-থ্যাংকস মিস চৌধুরী। আপনি সত্যি বুদ্ধিমতী। সত্যি আমি কিছু খাইনি, এমন

www.pathagar.com

কি রাতেও না।

–কেন বলুন তো?

–গতকাল রাতে এই রেস্ট হাউজ ছাড়াও পাওয়ার হাউজ এবং রূপবানী সিনেমা হলে গ্রেনেড চার্জ হয়েছে। সিনেমা হলে বহুলোক হতাহত হয়েছে। সমস্ত শহর সারারাত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

রবার্ট বলল, আমরা ভেবেছি এখানে গ্রেনেড চার্জ হওয়ায় ইলেকট্রিক লাইন ড্যামেজড হয়েছে। আমরা অন্ধকারেই রাত কাটিয়েছি।

–খুব কষ্ট করলেন। আমার ওখানটাও নিরাপদ না বলে আমি আপনাদের ডেকে পাঠাইনি।

–লাভ হতো না মিঃ খান, অন্ধকারে আমরা রাস্তায় বের হতাম না।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল তিনজনের মধ্যে। রোহানা হঠাৎ বলে উঠল, বেসামরিক লোকদের মেরে কি লাভ হলো? সিনেমা হলে তো আর পাক আর্মি যায়নি।

রবার্ট বলল, এটা প্যানিক সৃষ্টির জন্য। পাক আর্মিদের বুঝিয়ে দেয়া হলো, তোমাদের এ্যাডমিনিসট্রেশন ফেইলড। জনসাধারণকেও সতর্ক করা হলো, ওদের কোন কিছুতেই তোমাদের অংশ নেয়া চলবে না।

মিঃ খান বললেন, মিঃ রবার্টের অনুমান ঠিক। আলটিমেটলি এই দুর্ভাগ্যের জন্য জনসাধারণ পাক আর্মিকেই দায়ী করবে। আরো কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর মিঃ খান উঠে দাঁড়ালেন যাওয়ার জন্য। বললেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে বড় খুশি হলাম। কিন্তু যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসে আমাকে দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ।

রবার্ট এবং রোহানার চোখে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন, কেন?

–জানেন, আপনাদের দু'জনকে দেখে কেন যেন মনে হয় আপনাদের সব খুলে বলা চলে।

–নির্ভয়ে বলুন, রবার্টের উক্তি।

–এখানকার মিলিটারি প্রশাসক তাঁর ক্যাম্পে আমাকে আজ ডেকে পাঠিয়েছেন। বেলা দশটায় দেখা করতে হবে। ওখান থেকে আমি আর ফিরে নাও আসতে পারি।

–কেন ডেকে পাঠিয়েছেন অনুমান করতে পারেন?

–হ্যাঁ, গতকাল রাতে এই যে একযোগে তিন জায়গায় গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছে, এর জন্য ওরা আমাকে দায়ী করবে।

–কেন? রোহানা চৌধুরীর প্রশ্ন।

–আমি এই মহকুমার প্রশাসক, তাই। কিন্তু অবস্থাটা যে আমার আয়ত্বের বাইরে তা ওরা কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

রবার্ট চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে লাগল।

–যদি ফিরে আসি, কথার জের টানল মিঃ খান, আমি ফ্যামিলি নিয়ে এখান থেকে

www.pathagar.com

চলে যাব।

–কোথায় যাবেন? রোহানার প্রশ্ন।

–যেখানে অনেকেই গেছে।

–তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে?

–হবে না। কিন্তু জান তো বাঁচবে। মানুষ প্রথমে এইটেই চায়। টাঙ্গাইল মুক্তিযোদ্ধারা দখল করবেই। পিছু হটার সময়ে পাক আর্মি তখন ম্যাসাকার করে যাবে।

মিঃ খানের কথায় যুক্তি আছে। তাই রবার্ট এবং রোহানা উভয়েই চুপ করে রইল।

–আসি তাহলে, ক্যাম্পে হাজিরা দেয়ার সময় হল, বলে বিষণ্ণ হাসলেন মিঃ খান।

–আসুন, আপনার জন্য শুভ কামনা রইল।

–আপনাদের জন্য শুভ কামনা। পথ ঘাট বেশি ভাল না। দু'পক্ষই ওৎ পেতে আছে শত্রু ধরার জন্য, সতর্ক হয়ে পথ চলবেন।

–ধন্যবাদ, আন্তরিক কণ্ঠ রবার্টের।

–খোদা হাফেজ।

রোহানাও শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, খোদা হাফেজ।

ঘরের আবহাওয়া বিষণ্ণ। ভারি কালো ছায়া ফেলেছে ঘরের মেঝেয়, ছাদে, দেয়ালে। জানালা দিয়ে আলো আসছে, রং ফিকে। আকাশটাও ঘোলাটে। গাছের পাতায়, ডালে কেমন বিবর্ণতা। অথচ জুলাই মাসের এই শেষ দিকে রোদে ভরা আকাশের উজ্জ্বল মুখ কল্পনা করে মানুষ। প্রকৃতি জীব জগতের সঙ্গে খেলা করে, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো বিষণ্ণতায় মুখ ভার করে থাকে। জীব জগতের সঙ্গে প্রকৃতি তার গভীর সম্পর্কের কথা জানে বলেই কি ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্তে মুহূর্তে তার রং বদলায়, আচরণ বদলায়। বদলায় ছন্দ, বর্ণ, গন্ধ এবং রূপ। রবার্ট নীরবতা ভাঙ্গল, মিস চৌধুরী, তৈরি হয়ে এসো, রওনা হবো।

–কোথায় যাবে বললে না তো!

–বল্লা হয়ে কালিহাতী, ওখান থেকে ঘাটাইল। তীব্র যুদ্ধ হচ্ছে এসব জায়গায়।

রোহানা কথা না বলে তৈরি হতে চলে গেল। রবার্টও উঠে দাঁড়াল। তারও কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়া দরকার।

রওয়ানা হতে হতে সকাল আটটা। রোদ চন চন করছে। গরম বাড়ছে, মঝে মাঝে ছায়াঘন পথ। দু'ধারে গাছ, ঝোঁপ-ঝাড়ে জঙ্গল, এত গভীর ঘন জঙ্গল যে রোদের মুখ দেখা যায় না। কখনো কখনো পাটক্ষেত দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় হয়েছে চারা। এত ঘন হয়ে উঠেছে যে ফাঁক দেখা যায় না। বাঁশবনে বাতাসের স্পর্শে কড় কড় শব্দ। এই শব্দকেও কেমন অশুভ মনে হয়। রোহানা হাসতে হাসতে রবার্টকে একদিন গল্প শুনিয়েছিল, জান, বাঁশ ঝাড়ে পেত্নী বাস করে। ওরা বিকট শব্দ করে হাসে।

রবার্ট জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি পেত্নী দেখেছ?

www.pathagar.com

উচ্ছ্বসিত হাসি রোহানার, ধেৎ, আমি দেখব কোত্থেকে? আমি যখন দুষ্টুমি করতাম তখন আমার গ্রান্ড মাদার ভয় দেখাতেন, পেত্নী ডাকব? সে তোর ঘাড় মটকে দেবে। এত বিরক্ত করিস তুই তোর মাকে। এমনিতেই বেচারা হিমশিম খায় সংসারের কাজে।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, পেত্নী কোথায় থাকে বল না?

–ওই তো ঐ বাঁশ ঝাড়ে। শুনিস না কেমন কটকট মটমট শব্দ হয় দিনরাত।

–আমি তো পেত্নী দেখি না।

–পেত্নী দেখা যায় না। কিন্তু আমি যদি মন্ত্র পড়ি তাহলে ওরা চলে এসে তোর ঘাড়ে এসে ভর করবে, বলেই নানী মন্ত্র ঝাড়ত,

আয় পেত্নী নেমে
চুল ধর টেনে,
যে কাঁদে দিনরাত
ঘাড় মটকে কর তারে কুপোকাৎ।

ওমনি আমার কান্না থেমে যেত। ভয়ে নানীকে জড়িয়ে ধরতাম। নানী হেসে বুকে টেনে নিত আমাকে। তারপর ছড়া আওড়াত,

দূরে হয়ে যা দুশমন,
খুকির এখন শান্ত মন

আমি হাসতাম, নানীও হাসত।

গল্প শুনে রবার্টও হেসে ফেলেছিল। বলল, তোমার গ্রান্ড মাদার খুব দুষ্টু ছিল। তার ঘাড়ে পেত্নী ভর করলেই ভাল হতো, তাই না?

খিল খিল করে হেসে উঠল রোহানা, ঠিক বলেছ রবার্ট, তখন যদি আমি নানীর চালাকি ধরতে পারতাম, জব্দ করতাম ওকে।

রবার্টের ঠোঁটে হাসি, সব দেশের গ্রান্ড মাদাররাই ওমন মজা করে। পরীর গল্প শোনায়, ভূতের গল্প শোনায়, দৈত্য দানা কত কি। নাতি নাতনীদের বশ করার ওটা একটা কৌশল।

নিঃশ্বাস ফেলল রোহানা, ঠিক বলেছ রবার্ট, বুড়ো–বুড়িদের কাছে কেউ তো যেতে চায় না, তাই ওরা নানা ফন্দি–ফিকির করে কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গ পেতে চায়। কেন যে আল্লাহ্ মানুষকে বুড়ো করেন।

–ওটা সৃষ্টি রহস্য। মানুষকে শক্তিহীন করে ঈশ্বর তাঁর নিজের শক্তি প্রমাণ করেন। বলেন, তোমার কোন কিছুই চিরস্থায়ী না, শুধু আমি চিরস্থায়ী।

রবার্ট এবং রোহানা দু'জনেই গম্ভীর হয়ে যায়। মনে মনে বলে, হে প্রভু, ধ্বংসই যদি করবে এই পৃথিবী, তাহলে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করলে কেন? মৃত্যুই যদি অবধারিত, তাহলে মানুষের হৃদয়কে ভালবাসায় এত প্রসারিত করলে কেন?

রোহানার চোখে পানি, রবার্টও গম্ভীর। পরের মুহূর্তে রবার্ট ভাবছে অন্য কথা।

www.pathagar.com

এই দেশটা এত ঝোপ-ঝাড়-গাছ-পাতা এবং লতাগুল্ম দিয়ে পূর্ণ যে এসব জায়গায় লুকিয়ে থেকে গেরিলা যুদ্ধ করা সহজ মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এসব মোকাবিলা করা কঠিন।

সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রবার্ট। সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সামনে, ডানে, বায়ে। পিছন দিকে দৃষ্টি রাখতে বলেছে রোহানাকে, কেউ যদি তাদের ফলো করে, সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ভাগ্য ভাল, পথে কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটল না। তারা যখন বল্লা পৌঁছল, দুপুর গড়িয়ে বিকাল। দুপুরে লাঞ্চ করা হয়নি। কোথায় উঠবে বুঝতে না পেরে বাজারের দিকে গাড়ি নিয়ে গেল রবার্ট।

লোকজন বিশেষ নেই। বিষণ্ন এবং পরিত্যাক্ত দেখাচ্ছে জায়গাটা। দোকান পাট বন্ধ। কোন কিছু কেনার উপায় নেই। শুধু পশ্চিম দিকে একটা চায়ের স্টল খোলা। রবার্ট গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এল। ওখানে কিছু পাবলিক কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ঘিরে গল্প করছে। রবার্ট বিস্মিত। বল্লা পাক আর্মিদের আস্তানা। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘোরাফেরার কথা না।

গাড়ি থেকে নেমে এল রবার্ট, রোহানাও নামল। সাহেব ও একজন বাঙ্গালী মহিলা দেখে মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে এল, আপনারা কে? এখানে কেন?

রবার্ট পরিচয় দিল নিজেদের। একজন মুক্তিযোদ্ধা গর্বের সঙ্গে বলল, দেখতে এসেছেন? এখন যুদ্ধ শেষ। তবে শেষাংশ সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

-শেষাংশ কি, রোহানার কৌতুহলী প্রশ্ন?

-ওদের আমরা খতম করে দিয়েছি, সহযোদ্ধাদের লাশ ফেলে পালিয়েছে ব্যাটারা। দশটি রাইফেল আর এক হাজার রাউন্ড গুলী কব্জা করেছি আমরা।

-লাশ এবং অস্ত্রের ছবি তুলব আমরা, বলল রাবার্ট।

-লাশের ছবি তুলবে পারবেন না। আপনারা দেরি করে ফেলেছেন। লাশ ফুলে উঠেছিল। আবাহওয়া দূষিত হবে মনে করে লাশগুলো ডোবায় ফেলে দিয়েছি। রাস্তায় ফেলে রাখলে কুকুর, বেড়াল, শকুন টানাটানি করে খেত। সেটাই হতো ওদের উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু কি করব বলুন। পাবলিকের কথা তো ভাবতে হয়।

-পাক আর্মিরা কোন দিকে গেছে জানেন?

-চারানে। ওখানে নীরিহ গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখানে মার খেয়ে ঝাল ঝাড়ছে নিরপরাধ লোকের উপর।

রোহানা এগিয়ে এল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

-করুন ম্যাডাম।

-আপনারা তো অনেক পাবলিক প্লেসে হ্যান্ড বোম্ব মারছেন, গ্রেনেড ছুঁড়ছেন, এই যেমন সিনেমা হল, হাট-বাজার, ওয়াপদা, রেস্ট হাউজ, পাওয়ার হাউজ ইত্যাদি। এতে অনেক নীরিহ লোক মারা পড়েছে। আপনাদের যুদ্ধের এথিক্স কি এখানে?

www.pathagar.com

–পাবলিকের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা। যাতে জনগণ পাক শাসকদের উপরে আস্থা হারায়।

–আপনি যে কথা বলছেন, ওটা পাক আর্মিদের বেলাতেও ঘটে। তারাও ভয়ভীতির সঞ্চার করতে চায় সাধারণ লোকের মধ্যে।

–ম্যাডাম কি পাক আর্মিদের দালাল?

–আমি দালাল নই। সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা নিরপেক্ষ ভাবে খতিয়ে দেখতে চাই। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমি এই মতবাদে দারুণভাবে সহনশীল।

–আপনার নিজের কোন মত নেই ম্যাডাম? কোন আদর্শ? এই যুদ্ধে অবিচল বিশ্বাস?

–দ্যাখো ছেলে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন পরে। আগে প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন। পাক আর্মিরা প্রথমে আমাদের আক্রমণ করেছে। আমরা তাদের প্রতিহত করছি। দেশ শত্রুমুক্ত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে এই মুহূর্তে রবার্ট আমি বা অন্য কোন বিবেকবান ব্যক্তি এক কথায় শেষ কথা বলতে পারবো না। ইতিহাস একদিন এর বিচার করবে। যথার্থ মূল্যায়ন হবে সময়ের কষ্টি পাথরে।

মুক্তিযোদ্ধারা কেমন এক রকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রোহানা চৌধুরীর দিকে। রোহানার বক্তব্য, আমার কোন সন্দেহ নেই একটা ব্যাপারে, কৌতূহলী হয়ে উঠল ওদের চোখ, সেটা হলো মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম।

–সত্যি বলছেন ম্যাডাম?

–হ্যাঁ, বিশেষ করে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে এটা গভীর সত্য।

–ম্যাডাম, বুঝিয়ে বলুন।

–যুদ্ধ যারা বাঁধিয়েছে এটা তাদের মনোবৃত্তির পরীক্ষা। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এটা দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং কর্তব্যবোধ।

মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ চিন্তিত। আলোর উপর যেন পৃথিবীর ছায়া। একজন বলল, ম্যাডাম, আপনি খুব প্রজ্ঞা নিয়ে কথা বলছেন। আমাদের বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সে যা হোক, আমাদের পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

–কে আপনাদের পিছিয়ে আসতে বলেছে? যা আরম্ভ করেছেন তাকে জয়যুক্ত করুন।

–স্টলে কেন এসেছিলেন?

–খাবার সংগ্রহ করতে।

দোকানদারকে তখনই হুকুম করল ওদের দলপতি, এই ম্যাডাম এবং সাহেবকে চা, পাউরুটি, কলা যা যা আছে দিয়ে দে।

দোকানদার তটস্থ হয়ে সব গুছাতে লাগল। কিছুতেই দাম দিতে দিল না

www.pathagar.com

রবার্টকে, না সাহেব, আপনারা আমাদের মেহমান। শত্রু নিধন করলেও আতিথেয়তা ভুলে যাইনি এখনো।

ধন্যবাদ জানিয়ে রবার্ট গাড়িতে স্টার্ট দিলো। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলল, আমাদের দোয়া করবেন।

যতক্ষণ গাড়ি দেখা দেল ওরা তাকিয়ে রইল। রোহানাও হাসিমুখে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। দৃষ্টির সীমানার বাইরে আসতেই রোহানা নির্বাক। ভাবছে যুদ্ধ মানুষকে অমানুষ করে, আবার মানবতাকে সমৃদ্ধও করে। অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাই নতুন প্রজন্মের হাতে এক আদর্শবাদ উপহার দেয়া।

হঠাৎ রোহানা বলল, রবার্ট, তুমি উত্তর পূর্বে এগুচ্ছ কেন, তুমি তো যাবে সোজা উত্তর দিকে, কালিহাতীর দিকে।

–আমি চারানের দিকে যাচ্ছি। পাক সেনাদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে যাই।

–আমি কিন্তু মোটেও উৎসাহ বোধ করছি না রবার্ট। আমাদের দেশের মানুষ বড় গরীব। বাস করে কুঁড়ে ঘরে, জিনিসের মধ্যে সামান্য তৈজসপত্র, পরনের একটা বা দু'টো কাপড়, কিন্তু গরীবের জন্য এই সাত বাজার ধন। পুড়ে গেলে বা বানে ভেসে গেলে দুঃখ পায় মনে, কিন্তু সাহসের সঙ্গে বিপদের মোকাবেলাও করে। আবার নতুন উদ্যমে উঠে পড়ে লাগে ঐ কুঁড়ে ঘর তৈরির জন্য। খড়কুঁটো যোগাড় করে, নিজেদের বাগানের বাঁশ কাটে, দড়ি পাকায়, মাটি খুঁড়ে ঘর বানায়। নতুন খড়ের সুগন্ধে কৃষকের মন ভরে ওঠে। এই যুদ্ধের বিশেষত্ব কি জান রবার্ট, শত্রু যাই কেড়ে নিক না কেন, মাটি কেড়ে নিতে পারবে না। এখানে তারা কোনদিন স্থায়ী বসতি গাড়তে পারবে না।

শান্ত কণ্ঠে বলল রবার্ট, আমারো তাই মনে হয়, বলতে বলতে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিল উত্তর দিকে। কদমতলী যখন পৌঁছল, রাত দশটা। জায়গাটা যেন উত্তপ্ত বারুদ হয়ে আছে। লোকের ভিড়, উত্তেজিত কথাবার্তা, কোলাহল, কান্নাকাটি। কিছু খেয়ে নেয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মুহূর্তে তা উবে গেল। সকালে এস,এস,সি পরীক্ষার্থী বোঝাই বাসে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে কারা যেন। অনেক ছেলেমেয়ে মারা গেছে। আহতও হয়েছে অনেক।

রবার্ট ভাবতে লাগল, আকাশে উড়া প্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হয়, তা অনেক সময় টার্গেটের বাইরে এসে পড়ে, অনেক বেসামরিক লোক মারা যায়, সম্পদ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এতগুলো কচি ছেলে-মেয়েকে কেন মারা হলো? শুধু পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে, এই অপরাধে? অন্যভাবেও তো ভীতির সঞ্চার করা যেত?

রোহানা বলল, আমাদের অভিভাবকরা এত গরীব যে, ছেলেমেয়েদের একটা বছর নষ্ট হোক, তা তারা চায় না, তা পরীক্ষা যার কন্ট্রোলেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন? অধিকাংশ গার্জিয়ানের মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে যায় শিক্ষার খরচ বহন করতে।

www.pathagar.com

রবার্ট মাথা নাড়ে। দু'জনে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। একজন বৃদ্ধ ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তখনো তার মেয়ের বই-খাতা-কলম খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলের মত। রক্ত মাখা ওড়না সবাইকে দেখাচ্ছে। বলছে, এই দ্যাখো আমার মেয়ের মুক্তির লাল ওড়না, এটা দিয়ে আমি বাংলাদেশের পতাকা বানাব। ওর বই-খাতা-কলমের প্রতীক চিহ্ন থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায়, কি বল?

উপস্থিত সবাই চোখ মুছছে। রবার্ট গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় এক যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন আপনারা?

–কালিহাতী। বলতে পারেন, ওখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা?

–ওখানে আদৌ পৌছতে পারেন কিনা তাই আগে ভেবে দেখুন।

–কেন বলুন তো?

–ওখানে আমরা উপর্যুপরি আঘাত হানছি পাক সেনাদের উপর। পথ এখন নিরাপদ না, বিশেষ করে রাতে। গতকাল রাতে মাইন বিস্ফোরণে পাক সেনা বোঝাই তিনটে মিলিটারি ট্রাক সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। গোলাবারুদ প্রচুর হাতে এসেছে আমাদের। রাস্তা এখন বড় বড় গর্ত-খানা-খন্দে ভরা। যেতে পারবেন না।

রবার্ট তাকাল রোহানার দিকে। যুবকটি বলল, আপনারা বরং চারানে ফিরে চলুন। জায়গাটা এখন শত্রুমুক্ত। আমাদের দুটো ঘাঁটি ওখানে, আপনাদের থাকার মত জায়গাও দিতে পারব।

রবার্ট রোহানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। ছেলেটি আবার বলল, অবশ্য কোর দোহরায়, আমাদের ছোট একটা ক্যাম্প আছে। ও জায়গাটা কালিহাতীর একেবারে কাছে। কিন্তু ওখানে আপনাদের না যাওয়াই ভাল।

রোহানা তাকাল যুবকটির দিকে, কেন?

সে বলল, আজ রাতেই আমরা ওখানে জমায়েত হচ্ছি। শেষ রাতের দিকে পাক আর্মিদের ক্যাম্প আক্রমণ করব। চারান থেকে কালিহাতী বেশ দূর হয়ে যায়। অপারেশন চালানো কঠিন।

–তাহলে আমরা দোহরায় যেতে পারি। যা জানতে এবং দেখতে চাচ্ছি, ওখান থেকে দেখা যাবে।

–কিন্তু দোহরায় তো থাকার জায়গা পাবেন না।

–দরকার নেই। গাড়িতে রাত কাটিয়ে দিতে পারব।

–বেশ চলুন। আমরা রাত বারোটার দিকে রওয়ানা হবো। আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

সমস্ত ব্যাপারটা রবার্টকে বুঝিয়ে বলল রোহানা। রবার্ট মাথা নাড়ল, ওদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। এত নিচু স্বরে বলল যেন যুবকটি শুনতে না পায়।

রোহানা বলল, আপনি আমাদের একটা ম্যাপ দিন। আমরা ঠিক চিনে যেতে

www.pathagar.com

পারব, অযথা কেন আমাদের জন্য বাড়তি কষ্ট করবেন।

–আপনি আপনি করছেন কেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত।

–বেশ তো, তুমিই বলব। তোমার নাম কি?

–রইস।

–ছাত্র ছিলে, এখন মুক্তিযোদ্ধা?

–হ্যাঁ।

–ইচ্ছে করলে দোহরায় খবর পৌঁছে দিতে পার।

যে পথে মাইন বিস্ফারিত হয়েছিল, ঐ পথ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গেল রবার্ট। অনেক সময় চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে চালায় গাড়ি। ভক্স ওয়াগন, তাই রক্ষে। ছোটখাট কিন্তু মজবুত গাড়ি। রবার্ট বলল, এসব জায়গায় জীপ আনলে ভাল হতো। আসলে তোমাদের দেশের ইনটিরিওর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না।

রোহানার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, হ্যাঁ, শত শত বছর চলে গেছে, অথচ এ দেশের কোন উন্নতি হয়নি। শাসক এসেছে, শাসক চলে গেছে, রাজভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে কিন্তু দরিদ্রের ভাণ্ডার কোন দিন পূর্ণ হয়নি। এর উপর যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, খরা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন এসব তো লেগেই ছিল, এখনো আছে।

–প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা আজ আর অসম্ভব নয় মিস চৌধুরী।

–ওসব কথা তোমাদের মতো উন্নত দেশের বেলাতেই খাটে। দেশে শতকরা নব্বইজন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, তাদের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ভাবনা মাথায় সহজে আসে না। তবু হয়তো আসতো। কিন্তু ক্ষমতার লড়াই এদেশের ভাগ্যে বারবার বিপর্যয় ডেকে আনে।

–ক্ষমতার লড়াই সব দেশেই আছে মিস চৌধুরী।

–রবার্ট, ক্ষমতার লড়াইয়ের দশ রকম চেহারা। উন্নত দেশের ক্ষমতার লড়াই আদর্শিক। অর্থাৎ সমাজের ভাল চাই, মানুষের ভাল চাই। সেই ভাল হবে আমার আদর্শের রূপায়ণের মাধ্যমে। আরেক রকমের লড়াই হচ্ছে, ক্ষমতার ব্যবহার জনগণের মাথায় লগুড় ঘুরিয়ে। এটা ডিক্টেটরশীপ। আর সমাজতন্ত্রের লড়াই হচ্ছে, তুমি কিছু বোঝ না, অতএব আমিই তোমার প্রভু, তোমার ভাগ্য বিধাতা। অনুন্নত দেশের লড়াইয়ের চেহারা ভিন্ন। জনগণকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা, কায়েম করা। এখানে শাসকের উদর যত স্ফীত হবে, অন্যের উদর হবে তত শূন্য। দেশটাকে গরীব ভিখিরী বানিয়ে নিজের স্বর্ণ সিংহাসনে বসে ক্ষমতার ডুগডুগি বাজাবে। এটা শুধু যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লড়াই তা নয়, একে বংশগতভাবে কুক্ষিগত করার স্পৃহাও অদম্য। সিংহাসনে আর কেউ যেন বসার উপযুক্ত না। রাজার ছেলে রাজা হবে, সে কোন দুঃখে হবে প্রজা?

কথাগুলো এমনভাবে বলল রোহানা যে রবার্ট না হেসে পারল না। পরমুহূর্তে গম্ভীর

www.pathagar.com

হয়ে বলল, ভেরি আনফরচুনেট।

কোকদোহারায় যখন পৌঁছল ওরা, রাত তখন বারোটা। নীরব, নিঃশব্দ জায়গা। দিন হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর লাগত। কিন্তু রাতে বড় বড় গাছ, বাঁশবন, ঝোঁপঝাড় সবকিছুর ছায়া মিলে জায়গাটাকে ঘন অন্ধকারে ঘিরে ধরেছে। কেমন গা ছমছমে ভাব। দু'চারটে ঘরবাড়ি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জন-প্রাণী নেই বললেই চলে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প হওয়ার পর গ্রামবাসীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। দু'একজন বুড়ো, অসমর্থ, অসুস্থ লোক, যাদের নড়াচড়ার শক্তি নেই তারাই ভিটে-মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। বাড়িগুলো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আবৃত। মনে হয়, মস্তবড় এক গোরস্থানে এসে হাজির হয়েছে তারা। গাছগাছালির আড়ালে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। টিমটিম করে হেরিকেন জ্বলছে ভেতরে। সেই হেরিকেনগুলোর চারধার কালো কাগজে ঢাকা। মৃদু আলোয় ক্যাম্পগুলো বিবর্ণ এবং ধূসর দেখাচ্ছে।

রবার্ট এ ক্যাম্প ও ক্যাম্প ঘুরে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্প কমাণ্ডার শাহ নেওয়াজের কাছে চিঠি দিল। শাহনেওয়াজ তখন ম্যাপের উপর ঝুঁকে কি যেন দেখছে। হয়তো কালিহাতীর শত্রুর অবস্থান। কোন দিক থেকে কি ভাবে আক্রমণ করলে সুবিধে হবে তার ক্লোজ অবজারভেশন। চিঠি খুলে পড়ে রবার্টের দিকে আন্তরিকভাবে হাত বাড়িয়ে দিল এবং রোহানাকে হাত তুলে সালাম জানাল। বলল, বোন, আমাদের রেডক্রসের ক্যাম্প রয়েছে পাশেই। আপনারা ওখানে অনায়াসে বিশ্রাম নিতে পারেন। রাতও কাটাতে পারবেন। খাবারের মধ্যে শুধু বিস্কুট এবং চা দিতে পারব।

–ধন্যবাদ, খাবার সঙ্গেই আছে, ব্যস্ত হবেন না।

–হ্যাঁ বোন, তাই করুন, আমাদের এনতেজাম এত সামান্য যে, আপনাদের কিভাবে খেদমত করব ভেবে পাচ্ছি না।

–একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।

–বলুন।

–আপনি কথায় অনেক উর্দু শব্দ ব্যবহার করছেন। ভাষায় উর্দু উচ্চারণের টান আছে, ব্যাপার কি বলুন তো?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কমান্ডার শাহনেওয়াজ। বলল, আমার ওয়াইফ পাকিস্তানী। আমি পাকিস্তান আর্মি সার্ভিসে ছিলাম অনেকদিন। বিয়ে ওখানেই করেছি। আমার বাচ্চাটার বয়স চার বছর। সে তার মায়ের জবান উর্দু শিখেছে আগে। অথচ দুর্ভাগ্য, শালাদের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

রোহানার ঠোঁটে মৃদু হাসি, সত্যি, ব্রাদার ইন ল সম্পর্কটা কত মধুর, অথচ হরিষে বিষাদ।

রসিকতা বুঝতে পেরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কমাণ্ডার শাহনেওয়াজ। তার হাসির দমকে টেন্টের শক্ত কাপড় কাঁপতে লাগল। আর তা বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে

www.pathagar.com

অনেক দূর চলে গেল।

–সত্যি তো, সম্পর্কটা এতদিন গভীরভাবে তলিয়ে দেখিনি। শালারা তো আমার আসল শালাই। তবে ভগ্নিপতী কেমন করে ঝাল ঝাঁড়ে দেখে নেবে।

রবার্ট রসিকতা বুঝতে পারল অনেক পরে. তখন কৌতুক উপভোগ করার সময় নেই। টেন্টের সবাই তখন গম্ভীর।

চা খেতে খেতে রবার্ট ডাকল, মিস চৌধুরী।

রোহানা তাকাল।

–কথার মাঝে মাঝে তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে যাও। তখন তোমাকে আনমনা দেখায়। এনিথিং রং?

চায়ের কাপ থেকে মুখ নামাল রোহানা। বলল, রবার্ট, কমাণ্ডার শাহনেওয়াজের মত আমার জীবনেও বড় একটা সমস্যা আছে। রবার্ট চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আমি যাকে ভালবাসি সে পাকিস্তানী। আমি তার বাগদত্তা। বিয়ে যুদ্ধের জন্য সারতে পারছি না। ওর জন্য আমার বড় ভয় হয় রবার্ট। ওর জীবনের জন্য নিরাপত্তার জন্য আমার ভয়, শঙ্কিত থাকি আমি।

–বিয়েটা সেরে ফেললেই পার।

–ওমর চায় না। ওর ধারণা, আমি অচিরেই বিধবা হবো।

–ওকে আপাতত পাকিস্তানে পাঠিয়ে দাও।

–ও আমাকে ছেড়ে কোথায়ও যাবে না।

–তাহলে তোমরা দু'জনেই পাকিস্তানে চলে যাও। সময়টা বড় বিপজ্জনক মিস চৌধুরী। শুধু যুদ্ধ নয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, বাঙ্গালী বিহারীর মধ্যে যা দাঙ্গার প্রলয়ংকরী রূপ নিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

–তা হয় না রবার্ট। এই দেশের প্রতি আমার কর্তব্য আছে। তুমি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দাও, তখন কি তোমার প্রিয় স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির কথা ভেবে পিছিয়ে গিয়েছিলে? যাওনি। আমিও যাব না, যা হয় হবে।

রবার্ট চুপ। রোহানাও নীরব। টেন্টের ভেতরটা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে উঠল। ভ্যাপসা গরম। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, বৃষ্টি হবে কি? দূরে কোথায় যেন শেয়াল ডেকে উঠল হুক্কা হুয়া। বাঁশবনে কড়কবড় শব্দ উঠছে। রাতের স্তব্ধতা বাড়তে বাড়তে মৃত্যুর মত শীতল হয়ে যাচ্ছে। রোহানার দুই চোখে পানি। রবার্ট গভীর মমতা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অস্ফুট শব্দ করে উঠল, ও মাই পুওর চাইল্ড।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রোহানা। বাতাসে শব্দ উঠল। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে বৃষ্টি ঝড়ে পড়ল টেন্টের গায়ে।

কদমতলী থেকে দোহরায় এত তাড়াতাড়ি অপারেশন স্কোয়াড এসে যাবে ভাবতেও পারেনি রোহানা।

www.pathagar.com

–কেমন করে এত তাড়াতাড়ি এলে?

–হেঁটে সিস্টার হেঁটে, আমাদের সবার বাইসাইকেল আছে, কিন্তু তাতে যুদ্ধাস্ত্র আনা যায় না। তাই কাঁধে করে মার্চপাস্ট করতে করতে চলে এলাম।

–স্পিন্‌ডিড, চমৎকার, রোহানা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

–আরো চমৎকৃত হবেন শুনে যে এই দুর্গেও আমরা বিশ্রাম নেব না। একটু পরেই কালিহাতীর দিকে রওয়ানা হবো।

–কিছু সময় বিশ্রাম নেবে না?

–বিশ্রাম দরকার, কিন্তু নিতে গেলে অনেকটা সময় অপচয় হয়ে যাবে। আমরা শেষ রাতের দিকে ওদের ক্যাম্প আক্রমণ করব। আমাদের হাতে শুধু গ্রেনেড, মর্টার, রাইফেল আর কিছু পিস্তল আছে। আর ওদের হাতে কত কিছু।

–আমার যতদূর বিশ্বাস, ওদের হাতেও তেমন কিছু নেই।

–কেমন করে বুঝলেন? রইসের চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

–ওসব আমল দিল না রোহানা। বলল, এইটুকু বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপারে ওরাই দেশকে খুব ঠকিয়েছিল। এই দেশে যদি ফাইটার প্লেন, কামান, সাঁজোয়া যান ইত্যাদি থাকত, আজ তাহলে এগুলো ওদের হাতে থাকত। তোমরা গেরিলা যুদ্ধ করতে পারতে না। করলেও জেতার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। ফাইটার প্লেন থেকে বোমা ফেলে তোমাদের অবস্থানগুলো ধ্বংস করে দিত। একটা কথা জেনে রাখো রইস, পরের জন্য গর্ত খুঁড়লে একদিন সেই গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়। দু'একটা ট্যাংক আছে তা ঢাকা রক্ষার জন্য রেখে দিয়েছে। তাতে কামান বসানো আছে কিন্তু এ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট একটাও নেই। আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ানরা এই সুযোগ ভালভাবে নিতে পারবে। দমাদম বোমা ফেলে ধ্বংস করে দেবে ঢাকা নগরী।

–এর মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে টানছেন কেন?

–রইস তুমি ছেলেমানুষ। জীবনের অভিজ্ঞতা কম, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আরো কম। শর্ট কোর্স ট্রেনিং নিয়ে প্রয়োজনে যুদ্ধে নেমে পড়েছ। রাজনীতি বোঝই না। এই যুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে তুমি এখন মনে কষ্ট পাবে। থাক ও কথা। যুদ্ধ শেষ হোক, জয়ী হয়ে ফিরে এসো, তখন পরিষ্কার সব বুঝতে পারবে। একটা বাচ্চা ছেলের কাছেও তখন পানির মত সহজ হয়ে যাবে ওদের মতলব।

বিব্রত এবং বিষণ্ন দৃষ্টিতে রইস তাকিয়ে রইল রোহানা চৌধুরীর দিকে। রইসকে বিদায় দিয়ে রোহানা প্রবেশ করল টেন্টের ভেতরে। দেখল কমান্ডার শাহনেওয়াজ রবার্টকে কি যেন বোঝাচ্ছে।

–আসুন মিস চৌধুরী, আমরা রওয়ানা হচ্ছি। বিদায় নিতে এলাম আপনাদের কাছ থেকে।

–আপনি নিশ্চয়ই দলটাকে কমান্ড করবেন?

www.pathagar.com

–অবশ্যই, আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল শাহনেওয়াজের কণ্ঠে, দোয়া করবেন যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসি। হঠাৎ বিষণ্ণ হলো কমান্ডারের চোখ এবং মুখ। তার উপর মলিন হাসি ফুটিয়ে বলল, মেয়েটাকে বড় দেখতে ইচ্ছ করছে। মন কেন যে ছটফট করছে জানি না। একজন যোদ্ধার এমন হওয়ার কথা নয়।

–যোদ্ধাও একজন পিতা, স্বামী, স্নেহময় ভাই।

–ঠিক বলেছেন।

–মেয়েটার নাম কি?

হেসে ফেলল শাহনেওয়াজ, রোহানা। ওর মা নাম রেখেছে।

–রোহানা চৌধুরীও হেসে ফেলল।

–জানেন, আপনার নামটা শোনার পর থেকে বুকের ভেতরে কেমন তোলপাড় আরম্ভ হলো। আপনি যদি শিশু কিংবা কিশোরীও হতেন, আপনাকে মাথায় তুলে কয় পাক যে দিতাম তার ঠিক নেই।

সভয়ে রোহানা বলল, ভাগ্যিস হইনি।

হো হো করে কমান্ডার শাহনেওয়াজের হাসি, তারপর গম্ভীর, কেন যে এমন হয়, কি যে মায়া লাগে আপন সন্তানের জন্য, মনে হচ্ছে দু' হাত বাড়িয়ে সে বলছে, বাপি, মত যাও। মুঝে ছোড়কে যানা তো ম্যায় রোনা শুরু করেগা।

রবার্ট কিছু কিছু বুঝতে পারছে। বাংলা শেখার জন্য তার উৎসাহের কমতি নেই। তারও এমন হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তার মেয়েটাও তখন বছর পাঁচেকের ছিল। শাহনেওয়াজের না দেখা মেয়েটার মতই সুন্দর, নির্মল, পবিত্র। শুধু তার মুখে ছিল ভিন্ন ভাষা, ড্যাডি ডোন্ট গো টু ওয়ার, প্লীজ ডোন্ট লীভ আস।

রবার্ট সেদিন চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়েছিল কচি শিশুর মুখ। এ্যান্নার মার চোখেও করুণা এবং ভালবাসার বিষাদময় অশ্রু। সে ফিরে এসেছিল, কিন্তু এ্যানাকে ফিরে পায়নি। সে মারা গিয়েছিল নিউমোনিয়ায়। মৃত্যুর পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার ড্যাডিকে ডেকেছিল। এ কথা কি কোনদিন ভুলতে পারবে রবার্ট? দিন যায়, রাত আসে। কিন্তু বুকের ভেতরে চাপা কান্না জমা হয়ে থাকে। সে গলে না, নিঃশেষ হয় না। বুকের ক্ষতটাকে নিয়ত দাহ করে। রবার্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে রেখে নীরবতা ভাঙ্গল, আপনারা রওনা হোন, আমরাও আসছি।

–বলেন কি, ব্রাশ ফায়ারে পড়ে যাবেন যে!

–তা হোক, যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতেই তো এসেছি। এইটুকু রিস্ক তো নিতেই হবে। গেরিলাদের কৌশলগত আক্রমণের ধারাটা নিজেদের চোখে দেখতে চাই।

রোহানা বলল, সাংবাদিক হিসাবে আমিও স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা ইতিবৃত্ত লিখে রাখতে চাই।

–ধন্যবাদ। আমি শুধু আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এ কথা বলেছিলাম।

www.pathagar.com

–সাংবাদিকদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ, একথা মেনে নিয়েই কাজে নামতে হবে।

কোন তরফে আর কেউ কোন কথা বলল না। কমান্ডার শাহনেওয়াজ রবার্ট এবং রোহানাকে সালাম জানিয়ে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে।

একটু পরে রইসের প্রবেশ, বলল, ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ আপনাদের আমাদের পেছনে পেছনে আসতে বলেছেন। আমাদের ওভারটেক করে আগে চলে যাবেন না।

আশ্চর্য, এখনো তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছে কমান্ডার শাহনেওয়াজ। বিস্ময়কর মমতা এবং শ্রদ্ধায় ভরে উঠল রোহানার মন, জবাব দিল, তাই হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জীপ দুটো চলছে যতদূর সম্ভব কম শব্দ করে। বেশি মুক্তিযোদ্ধা নেয়নি কমান্ডার শাহনেওয়াজ, তাতে ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। রবার্টের ভক্সওয়াগন চলছে ওদের সঙ্গে বেশ ব্যবধান রেখে। বেশ দূর থেকে বায়নোকুলারের সাহায্যে শত্রুর অবস্থান দেখে নিল কমান্ডার শাহনেয়াজ। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে স্থানটা সুরক্ষিত। দু'জন সৈন্য রাইফেল কাঁধে নিয়ে পেট্রল দিচ্ছে। ঝটপট মুক্তিযোদ্ধারা নেমে পড়ল জীপ থেকে। কমাণ্ডার শাহনেওয়াজ কে কোথায় অবস্থান নেবে, কিভাবে আক্রমণ করবে বুঝিয়ে দিল।

গ্রাম অন্ধকারে ঢাকা, ভোরের আলো ফুটি ফুটি করেও ফোঁটেনি। ধূসর রঙের পর্দার আড়ালে সমস্ত গ্রাম আচ্ছন্ন। নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। আর কোন শব্দ নেই। ক্যাম্পের মৃদু আলো জায়গাটার মৃত্যুস্তব্ধ অন্ধকার দূর করতে পারেনি। শুধু আলো আঁধারের রহস্যময় নীরবতা ভৌতিক ছায়া দান করেছে।

রবার্ট চোখে বায়নোকুলার লাগিয়ে গাড়িতে বসে আছে। গাড়ি দু'দলের অবস্থান থেকে দূরে গাছের আড়ালে। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা ঝাঁপিয়ে পড়ল পেট্রল পার্টির ওপর। সাইলেন্সার পিস্তল দিয়েই ওরা খতম করল দু'জনকে। পরমুহূর্তে টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ল ওদের উপর। এক মুহূর্তে দেরি না করে কমান্ডার শাহনেওয়াজ চারদিক থেকে আক্রমণ করল ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধাদের মর্টারের গোলা বিস্ফোরিত হতে লাগল ঘন ঘন। ওদিক থেকে মেশিনগানের গুলী লং রেঞ্জের রাইফেলের গুলী হাওইয়ের আগুনের মত ছুটাছুটি করতে লাগল চারদিকে। শেল ফাটার শব্দ, আগুনের ঝিলিক, ধূঁয়া বারুদের কটু গন্ধে ভোর রাতের বাতাস ভারি হয়ে উঠল। ফাঁকা জায়গায় শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল। ঝলকে ঝলকে আগুন ছুটোছুটি করে অন্ধকারের বুক চিরে দিতে লাগল তীব্র বেদনায়। আহতদের কাতর ধ্বনি, রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ভেসে চলল ঘন ঘাস পাতার ভেতর সরু নালা সৃষ্টি করে। থেত্‌লানো দেহগুলো দুমড়ে মুচড়ে যেত লাগল ভয়ংকর উৎক্ষেপণের মাঝে। কোন্‌টা শত্রুর দেহ, কোন্‌টা মিত্রের, তার কোন চিহ্ন রইল না। যুদ্ধ থেমে গেল। আবার হিমশীতল স্তব্ধতা। ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে রাতের বিশাল বুকে মুখ লুকিয়ে। পাখিরা জেগে উঠছে। গাছের পাতা শিরশির করছে ভোরের মৃদৃ বাতাসে। কাক কা কা রবে উড়ে যাচ্ছে দূরে।

www.pathagar.com

ক্যাম্পের ভেতরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। অথচ নিস্পন্দ দেহগুলো জীবনহীন।

মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে এসেছে অনেক দূরে। একজন মুক্তিযোদ্ধা বিষণ্ন মুখে ঘোষণা দিল, কমান্ডার শাহ্‌নেওয়াজ শাহাদত বরণ করেছেন। ভয়াবহ আক্রমণের মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দু'জন নিহত সহযোদ্ধার লাশ নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু কমান্ডার শাহনেওয়াজের লাশ লাপাত্তা। সে নাকি একেবারে ঢুকে গিয়েছিল ক্যাম্পের ভেতরে। হাতাহাতি যুদ্ধ করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দহরায় ফিরে যাওয়ার সময় বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ওরা সার্চ পার্টি পাঠাবে আমাদের তল্লাশীর জন্য।

–রবার্ট গাড়ির মুখ ঘোরাতেই রোহানা বলল, প্লীজ স্টপ।

–কিছু বলবে?

–হ্যাঁ। শাহনেয়াজের লাশ না নিয়ে আমি ফিরছিনা।

–আর ইউ ক্রেজি?

–রবার্ট, আমি ঠিক আছি, সুস্থ আছি। কিন্তু ছোট্ট রোহানা তার বাঙ্গালী বাবাকে একেবারে ভুলে যাবে তা হয় না। কবর থাকলে বড় হয়ে সে তার বাবাকে এখানে দেখতে আসবে। খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে কথা বলছি, তাই না?

রবার্টের সেই মুহূর্তে মনে পড়ল, মেমফিস শহরে সে প্রতি রবিবার গীর্জায় যায়। সেখান থেকে সরাসরি চলে যায় 'সিমেটেরিতে।' ছোট এ্যানার কবরে ফুল দেয়, তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কবর এবং নাম ফলক আছে বলেই তা সম্ভব। রোহানা বলল, তুমি চলে যাও রবার্ট। আমি এইটুকু পায়ে হেঁটে ওদের ক্যাম্পে ঢুকব।

রবার্ট কথা না বলে গাড়ি থেকে নামল। ইউ.এস.এর ছোট পতাকা গাড়ির সামনে লাগিয়ে দিয়ে গাড়ির মুখ ক্যাম্পের দিকে করল, ওহ্ রবার্ট, ডোন্ট ডু সো ম্যাচ্ ফর মী।

রবার্টের ঠোঁটে মৃদু হাসির ছোঁয়া। কথা বলল না।

গেটে সেন্ট্রি বাধা দিল। রবার্ট তার আইডেনটেটি কার্ড সেন্ট্রির হাতে দিয়ে বলল, তোমাদের মেজরকে দাও। একটু পরেই ব্যাজ, ইউনিফরম পরা একজন অফিসার বেরিয়ে এলেন। রবার্ট ও রোহানা নেমে এল গাড়ি থেকে। অফিসার করমর্দন করলেন রবার্টের সঙ্গে। তাদের নিয়ে ক্যাম্পের ভেতরে চলে এলেন। দু'টো চেয়ার টেনে এনে বসতে দিয়ে বললেন, বাতায়ে।

অফিসারের মুখ গম্ভীর। কিন্তু রোহানার মনে হলো, এই মুখ তার অচেনা নয়। অথচ কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।

রোহানা পরিষ্কার উর্দুতে বলল, কমাণ্ডার শাহনেওয়াজের লাশটা আমরা ফেরৎ চাই।

–ইউ ডেয়ার টু ম্যাচ্।

–মানবিক কারণে মাঝে মাঝে দুঃসাহস দেখাতে হয় মেজর। কমাণ্ডার

www.pathagar.com

শাহ্‌নেওয়াজের স্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানী। মেয়েটা বাপকে খুব ভালবাসত। হয়তো ওরা দেশে চলে যাবে। কিন্তু কবরটা চিহ্নিত থাকলে মেয়ে বড় হয়ে বাপের কবর দেখে যেতে পারবে।

মেজর গুম হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ডাক দিলেন. মিস চৌধুরী?

রোহানা চমকে উঠল, আমাকে আপনি চেনেন?

–হ্যাঁ, আমি মেজর শফি।

এতক্ষণে পরিচিত মুখটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল রোহানার চোখের সামনে।

–মিস চৌধুরী, আমার একটা প্রশ্নের যদি জবাব দিতে পারেন তাহলে লাশ ফেরৎ পাবেন।

রোহানা সতর্ক। সে জানে, মেজর শফি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি চতুর লোক। মেজর শফির কণ্ঠস্বর বিষণ্ন এবং গম্ভীর।

–এখন বলুন, আমাদের ঘরেও স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে। আমাদের অনেক লোকজন মারা যাচ্ছে যুদ্ধে। এ দেশের মাটিতে তাদের লাশগুলো দাফন পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। যেখানে সেখানে আমরা আমাদের লোকদের লাশ ফেলে আসতে বাধ্য হচ্ছি। ওই লাশগুলো কুকুর, বেড়াল, শুকুনেরা খাচ্ছে। তাহলে আমাদের সন্তানরা তাদের পিতাদের কবর কেমন করে দেখতে আসবে?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রোহানা। রবার্ট তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রোহানা যখন কথা বলল, তার কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত, মেজর শফি খান, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, সে প্রশ্নের উত্তর আমি কেন, পৃথিবীর কেউ দিতে পারবে না। ভিয়েতনামে আমেরিকানদের করব নেই, আলজেরিয়ায় ফরাসীদের নেই, এমন কি এ দেশে পলাশীর যুদ্ধে নিহত ইংরেজদের কবরও নেই। যেখানে বিদেশের মাটিতে অন্য দেশের মানুষ যুদ্ধ করতে এসেছে সেখানেই এই ট্র্যাজেডি ঘটেছে। আমি জানি, স্বীকার করি এটা মানবিক সততার মস্তবড় খেলাপ। তবু এটা ঘটছে, ঘটতেই থাকবে, যতদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিপ্লব চলতে থাকবে।

মেজর খান চুপ। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে গেল. মিস চৌধুরী. বোধহয় মেজর ওয়াসিম এ জন্যই তোমাকে এত পছন্দ করতেন। তুমি নির্মম সত্যগুলো খুব নির্ভীকভাবে প্রকাশ করতে পার। আর এই কারণেই বার বার তোমার মৃত্যু পরোয়ানা জারি হলেও আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারিনি। ভাবি, এদেশে অন্ততঃ একটা সততার কণ্ঠ থাকলেও টিকে থাক, যে সত্য-মিথ্যার কথা একদিন নির্ভীকভাবে এ দেশের জন সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারবে।

–ধন্যবাদ মেজর খান।

–তুমি কমান্ডার শাহনেওয়াজের লাশ ফেরৎ নিতে পার এক শর্তে, কফিন খুলে

www.pathagar.com

লাশের মুখ দেখতে পারবে না বা কাউকে দেখাতেও পারবে না। আমরা ওকে কফিন পরিয়ে বাক্স ভরে মুখ বন্ধ করে দেব। রাজি?

রোহানা সম্মতি জানাল। লাশ ডেলিভারি নিল রোহানা। কিন্তু যানবাহনের অসুবিধে। অনেক খোঁজ করেও কিছু পাওয়া গেল না। রবার্টকে বিদায় দিয়েছে রোহানা, রবার্ট তুমি ঘাটাইল চলে যাও। আমার প্রোগ্রাম মত আমি লাশ নিয়ে ঢাকা যাব।

রবার্ট চলে গেছে। গ্রামে দু চারটে ঘরবাড়ি। পুরুষ লোক নেই। কে কাকে সাহায্য করবে? মেজর শফি খান বললেন, আমাদের একটা পিক আপ ঢাকা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে তুমি লাশটাকে ওটায় নিয়ে যেতে পার। তোমাকে পিছনে লাশের সঙ্গে বসতে হবে।

–আপত্তি নেই। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মেজর খান।

মেজর কোন কথা না বলে ক্যাম্পের অন্য দিকে চলে গেলেন।

একদিন মুকিত এসে হাজির রোহানার বাসায়। রোহানার সবিস্ময় প্রশ্ন, মুকিত তুই?

–আপনাকে একটা খুশির খবর দিতে এলাম আপা।

–দাঁড়া, চা আনি। চা খেতে খেতে খুশির খবরটা বলিস।

চায়ে চুমুক না দিয়েই মুকিত বলল, তোমার মামার ঘাতক মাহমুদ গনিকে ফুটো করে দিয়েছি।

চমকে উঠল রোহানা, ফুটো করে দিয়েছিস মানে?

–মানে বুঝলে না? বন্দুকের গুলিতে বুক ঝাঝরা করে দিয়েছি। চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে ড্রেনে। লাশ তুলে কেউ দাফন না করলে এতদিনে চিল শকুনে খেয়ে ফেলেছে।

–হতভাগা করেছিস কি? তাঁর মত ভদ্র সজ্জন শিক্ষিত ব্যক্তি মামাকে মারতে পারে না।

–লোক যে বলাবলি করল।

–যুদ্ধের সময় কতকিছু গুজব রটে। কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাই না করে একটা নির্দোষ লোককে খুন করলি তুই?

–হতে পারে লোকটা মামাকে মারেনি, তবু আমি দুঃখিত নই। লোকটা গোপনে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত।

–মুকিত, গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ডাক দিল রোহানা।

–বল আপু।

–তুই নাকি রাজাকার হয়েছিস?

–হয়েছি, তাতে কি হয়েছে?

–তোর লজ্জা করছে না এ কথা বলতে?

–না, বরং গৌরববোধ করছি এজন্য যে, আমি একটা আদর্শের জন্য লড়াই

www.pathagar.com

করছি।

–কিসের আদর্শ?

–ইসলামের আদর্শ।

–ইসলাম কি নির্দোষ লোককে খুন করতে বলে? ইসলাম কি নিজের জাতির বিরুদ্ধে কাজ করতে বলে?

–আমি জাতির বিরুদ্ধে কাজ করছি না, একটা ভ্রান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছি।

–কোন আদর্শ ভ্রান্ত আর কোনটা সঠিক তা তুই বুঝলি কি করে? তোরটা যে ভ্রান্ত নয় এ কথা কে বলল? পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি আমাদের উপর জুলুম ও শোষণ না করতো তবে তো এ সংঘাত বাধতো না। আমি তো জানি জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই করাই উত্তম জেহাদ।

–আপা, তুমি ভুল জান একথা আমি বলছি না, তবে তুমিও এটা স্বীকার করবে যে, ইসলামের নামে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকরা চব্বিশ বছরেও সে দেশটাতে ইসলামী শাসন চালু করেনি। যদি করতো তবে এ বৈষম্য ও শোষণ থাকতো না। ফলে দোষটা দেশের বা ইসলামের নয়, এর জন্য দায়ী অসৎ শাসকরা। শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক কথা নয়। দেশটা টিকে থাকলে এবং জনগণ চাইলে একদিন এ অসৎ শাসকদের অপসারণও সম্ভব, কিন্তু তাই বলে সেই রাগে দেশটাতো আর টুকরো টুকরো করা যায় না। তুমি কি মনে কর ইন্ডিয়া বিনা স্বার্থে মুক্তিদের সাহায্য করছে?

–বুঝলাম ইন্ডিয়া বিনা স্বার্থে আমাদের সাহায্য করছে না। কিন্তু প্রতিদানে যতটুকু পাওয়ার ঠিক ততটুকুই পাবে, তার বেশী না।

–আপু, বোকার মত কথা বলো না। বোয়াল মাছ হা করে কিছু গিলতে চাইলে পুরোটাই গেলে, অর্ধেক গেলে না। ইন্ডিয়ার শক্তি ও আধিপত্যের কাছে তখন তোমরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

–মুকিত, তুই খুব ভাল ছাত্র ছিলি। অনেক পড়াশোনা করেছিস। তুই জানিস একটা জাতির শারীরিক, আর্থিক এবং অস্ত্রের শক্তির চেয়ে নৈতিক শক্তি অনেক বড়। সত্য যে ইন্ডিয়া এই সাহায্যের অছিলায় এদেশে আধিপত্যবাদ বিস্তার করতে চাইবে। কিন্তু সমস্ত জাতি যদি এক হয়ে রুখে দাঁড়ায় তবে পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যে তাদের পদানত রাখে।

–ওগুলো শুধু বাগাড়ম্বর, কথার ফানুস, বাস্তবে অন্য চিত্র, মুকিতের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল।

তিরস্কার রোহানার কণ্ঠে, হতভাগা, তুই কি পড়াশোনা করিস তাহলে? উত্তর ভিয়েতনাম আমেরিকার মত পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়ে স্বাধীনতা অর্জন করল, আলজেরিয়া ফ্রান্সের মত একটা শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে লড়ে স্বাধীনতা পেল, এমনি

www.pathagar.com

আরো কত দেশ। আমরাই বা পারবো না কেন? দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোক চাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে, নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে, তুই কেন এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে যাবি?

–কেন যাবো না তাই বলো? পরিস্থিতির কারণে আদর্শের সাথে আপোষ করবো?

–ঠিক আছে. আপোষ না করলে অন্তত চুপ করে থাক।

–চাইলেই কি চুপ থাকা যায়? আনিস চাচা তো চুপ ছিলেন, রাজনীতির ধার ধারতেন না, মসজিদ আর মাদ্রাসা নিয়েই পড়ে থাকতেন, তবু তাকে জীবন দিতে হলো কেন? আসলে লড়াইয়ের ময়দানে নিরপেক্ষরাই বেশী বিপদের সম্মুখীন থাকে। মিলিটারি মার খায় মুক্তির হাতে আর মুক্তিদের মারে আর্মি কিন্তু যারা নিরপেক্ষ, তারা গুলি খায় দুই পক্ষের। চুপ থাকা মানেই তো দু'পক্ষের গুলি খাওয়া, তুমি কি আমাকে তাই করতে বলো?

–তাই বলে পাক বাহিনীর সহযোগী হবি?

–ইন্ডিয়ার সহযোগী হতে না চাইলে তাই যে হতে হবে।

–মুকিত, ঘটনাস্রোতকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হয়। বানের পানি, পাহাড়ের ঢল আর গণজোয়ারকে রোধ করতে যাওয়া ঠিক না, করাও যায় না। সারা দেশ ভেসে যাচ্ছে আবেগে, এই বিশাল স্রোতের মুখে দু'চারটে বোল্ডার ফেলে গতি থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা বোকামী। মুকিত, ভাই আমার, এই পথ ছাড়।

–কেন ছাড়বো? কার ভয়ে ছাড়বো? তুমি কি মনে কর পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় ভারত আমাদের বেশী আপন? আপা, তিন কোটি লোকের হাত থেকে বাঁচার জন্য তুমি কি আমাকে তেত্রিশ কোটি লোকের গোলামী কবুল করতে বল? রোদের থেকে বাঁচার জন্য গরম তেলের কড়াইতে লাফ দেয়ার কোন যুক্তি আমি দেখিনা। আপা, তুমি ঘরে বসে বক্তৃতা ঝাড়ছো, আর আমি জেহাদের মাঠে নেমেছি।

–ধর্মের নামে উন্মাদনা জেহাদ না।

–আপন দেশ আর ধর্মকে ভালবাসা উন্মাদনা নয়। আপা, তুমি বাড়াবাড়ি করছো, তোমার বুঝা উচিত আমি বড় হয়েছি, ভাল মন্দ বুঝি।

হঠাৎ অন্যমনস্কতা ঘিরে ধরল রোহানাকে। এই ছেলে এই তো সেদিন উদোম হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, যখন দশ-বারো বছর বয়স, দুষ্টের চূড়ান্ত। মামার বাগানের আম, ডাব পেড়ে খেত ইচ্ছে মত। কারো অনুমতির ধার ধারতো না। কিন্তু পড়াশোনায় ভাল ছিল বলে সবাই স্নেহের চোখে দেখতো। এস.এস.সি এবং হায়ার সেকেন্ডারী দু'টোতেই স্টার মার্ক। গরীব বাবা মার ঘরে সে কি আনন্দ। মিলাদ পড়াল। শুধু তাই না, পাড়াপড়শিকে দাওয়াত করে খাওয়াল। হাত জোড় করে সে কি বিনয় তালেব আলীর, আমার ছেলেকে দোয়া করবেন আপনারা, যেন ও মানুষের মত মানুষ হয়। সবাই হাত তুলে দোয়া করল মুকিতকে। সেই ছেলে যুদ্ধ আরম্ভ হতেই পড়াশোনা ছেড়ে

www.pathagar.com

দিয়ে রাজাকারের দলে নাম লিখালো?

–উঠি আপা।

–চা খেলি না?

–রাজাকাররা তোমার কাছে ঘৃণার পাত্র। তোমার বাড়িতে সে কি চা খেতে পারে?

–এমন করে বলছিস কেন? যে পথ রক্ত ঝরানোর পথ সে পথে মঙ্গল নেই। তা ছাড়া তোরা মিলিটারিদের ইনফরমার হয়েছিস।

–কে বলল তোমাকে এ কথা? ওদের নিজেদেরই স্পাইং নেটওয়ার্ক আছে। মুক্তিদেরও আছে।

–তোরাও ওই নেটওয়ার্কের আওতায় কাজ করছিস। চেনাজানা লোকদের ধরিয়ে দিচ্ছিস মিলিটারিদের হাতে, কেউ আগের শত্রুতায়, কেউ বাহাদুরীর জন্য।

–সবাই এ কাজ করছে না।

–তা হতে পারে, কিছু লোক হয়তো করছে। কিন্তু দেনা শোধ করতে হবে সবাইকে।

–ওরা আমাদের মারছে না?

–মারছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে যে নির্মমতা দেখা দেবে তা কল্পনাও করা যায় না।

–যদি আমরা জিতি?

–মুকিত, দিবাস্বপ্ন দেখিস না।

–আপা, তুমি আমার মনের জোর ভেঙ্গে দিতে চাইছ, তোমার এখানে আর থাকা চলে না। তুমি রীতিমত ইন্ডিয়ার দালাল হয়েছো।

–ছিঃ ছিঃ...

–তোমার কথাবার্তা তাই প্রমান করে। কবে না তোমাকেই মেরে বসি।

–তাই করিস মুকিত, আমার সব যন্ত্রণার অবসান হয়।

রোহানার চোখ ভরে উঠল পানিতে। ওদিকে না তাকিয়ে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল মুকিত। রোহানা আর কোন দিন ওর খবর পায়নি। ভাসা ভাসা শুনেছে, মুক্তিযোদ্ধারা ওকে মেরে ফেলেছে।

বুশরা তার স্বামীর লাশ না দেখে ছাড়বে না। মেয়েকেও দেখাবে। রোহানা জানে, কি ঘটেছে। আহত অবস্থায় কমান্ডার শাহনেওয়াজকে ওরা ধরেছিল। তারপর টরচার করে মেরেছে। মুখ এখন ক্ষতবিক্ষত এবং বিকৃত। শর্তের রহস্যটাই ওখানে। কিন্তু একথা বুশরাকে বলা যাবে না। রোহানা শুধু বলল, বুশরা ডোন্ট বী সেন্টিমেন্টাল। গতকাল মারা গেছে ও। চব্বিশ ঘন্টার বেশি হয়েছে। সারা শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। তুমি ও মুখে তোমার স্বামীর মুখ আর খুঁজে পাবে না। তার চেয়ে ও যেভাবে শান্তিতে শুয়ে আছে ওভাবেই ওকে দাফন করতে দাও। তাছাড়া কচি মেয়েটার

www.pathagar.com

স্মৃতিপটে এই ভয়ংকর ছবি তুমি এঁকে দিয়ো না। ও চিরকাল দুঃস্বপ্ন দেখবে।

—নেহি বহিন, এ্যয়সা কভি নেহি হোগা।

—জরুর হোগা, ম্যায় ওয়াদা খেলাপ নেহি করোঙ্গী। কঠিন শোনাল রোহানার কণ্ঠস্বর। বুশরা চুপ হয়ে গেল।

দু'দিন পরে বুশরার খবর নিতে গেল রোহানা। বুশরা শান্ত এবং গম্ভীর।

—এখন কি করবে?

—জানি না বহিন্।

—চল্লিশ দিন অপেক্ষা কর। ওর চেহলাম হয়ে যাক। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ো। যদি তোমার বাপের বাড়ি করাচীতে চলে যেতে চাও, তাহলে বলো, ব্যবস্থা করে দেব।

—ছোট রোহানাকে কি বোঝাবো তা তো বললে না বহিন।

—বলো, তার বাবা অনেক দূর দেশে চলে গেছে।

—রোজ এক কথা বলব?

—তাইতো বলতে হবে। যখন ও বড় হবে, তখন সত্যি কথা বলো, ও সব বুঝতে পারবে।

—আচ্ছা বহিন, একটা কথার জবাব দেবে?

—বল।

—আপনা ভাই, আর আপনা খসম যখন মারামারি হানাহানি করে তখন ঘরের বহুটি কোন পক্ষ লেবে?

রোহানা জানে, এমন একটা প্রশ্ন করবে বুশরা। কিন্তু উত্তর তার জানা নেই।

—বুশরা তোমার প্রশ্নের উত্তর অন্য কেউ দিতে পারে না। দুটি পক্ষ যখন মারমারি করে তখন মধ্যস্থতা করা যায়, যখন পক্ষ দু'টির কোনটার সঙ্গেই তুমি সংশ্লিষ্ট নও। কিন্তু যেখানে স্নেহ-মমতা, ভালবাসা এবং আবেগ কাজ করে সেখানে কোন পক্ষ নেয়া যায় না। নিলেও ন্যায় বিচার করা যায় না। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে শুধু দুঃখ ভোগ করতে হয়।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বুশরা, ঠিক বলেছ বহিন, অসহায় অশ্রুপাত। জীবন ভর আমি আর রোহানা কাঁদব।

রোহানা চৌধুরীর চোখও ভরে উঠল পানিতে। সেই মুহূর্তে তার ওমরের কথা মনো হলো। তাহলে তাকেও কি সারা জীবন কাঁদতে হবে? ওমরের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। আজই সে যাবে ওমরের কাছে।

ওমরকে প্রেসে পাওয়া গেল না। রোকন সাহেবের সঙ্গে দেখা, মা আপনার মুখ বড় শুকনো লাগছে। এক কাপ চা খান।

—দিন, আমাকে আপনি তুমিই বলবেন।

www.pathagar.com

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোকন সাহেবের মুখ। এক কাপ চা রোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, মা তোমাকে একটা কথা না বললেই নয়।

–বলুন।

–তুমি জান, ওমর সাহেব মেডিকেল কলেজে কাগজ বিক্রি করতে যায়?

–জানি।

–দু' একটা ইংরেজি কাগজ বিক্রি করারও এজেন্সি নিয়েছে। ওগুলো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বিক্রি করে। অর্থাৎ হকার সেজেছে।

রোহানার চোখে বিস্ময়, চাচা বিশ্বাস করুন, আমি এতটা জানি না। ও বলেছে, মেডিকেল কলেজে দর্শন পত্রিকার অনেক গ্রাহক আছে। এক সঙ্গে কিছু পত্রিকার ডেলিভারি দিয়ে আসে।

–মা, সমস্যা কি জান? ওমর সাহেব যে অবাঙ্গালী তা আগেও অনেক লোক জানত। এখন ওকে অবাঙ্গালী বলে ওরা চিহ্নিত করে ফেলেছে। সান গ্লাস পরলেই কি চোখের গাঢ় নীল রং আর গায়ের ধবধবে ফর্সা রং মুছে ফেলা যায়? তাও তো দুশ্চিন্তায় সোনা বর্ণ গায়ের রং কত মলিন হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে আজকাল ওকে বাঙ্গালীরা দেখলেই ধাওয়া করে। কবে যে কি হয়ে যায় মা। মালিক বলেন, আমাদের প্রেসেরও তো একটা নিরাপত্তা আছে। এখানে ওমর সাহেব চাকরি করছে জানতে পারলে উন্মত্ত জনতা প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেবে।

রোকন সাহেব থামলেন। ধৈর্য সহকারে কথাগুলো শুনছিল রোহানা। মুখে চা তেতো লাগছে। রোকন সাহেবের কি দোষ? বাস্তব অবস্থা জানিয়ে দিয়ে ভালই করলেন তিনি।

রোহানা বসেই রইল প্রেসের একটা কাঠের টুলে। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে। ঢুলছে রোহানা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ক্রোধোন্মত্ত জনতা, ধর ধর, মার মার শব্দ উঠছে। শিকার বিহারী ভদ্রলোক ওমর বাট। দেখতে দেখতে তার হাত পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কাটা মুরগীর মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একটা রক্তের স্রোত হেলেদুলে বয়ে চলল পিচ ঢালা মসৃণ পথে। সেই রক্ত থেকে অজস্র রক্তজবা ফুটে উঠল। কারা যেন ফুলগুলো পা দিয়ে থেতলে দিচ্ছে, রক্ত আর চট্‌কানো ফুলে রাজপথ ভেজা এবং পিচ্ছিল।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল রোহানা। রোকন সাহেব ধরে ফেললেন তাকে, কি হয়েছে মা, তুমি যে পড়ে যাচ্ছিলে!

–বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম চাচা।

রোকন সাহেব রোহানাকে ধরে নিয়ে নিজের ছোট সংকীর্ণ ঘরের মলিন বিছানায় জোর করে শুইয়ে দিলেন। গভীর ঘুমে অচেতন রোহানা চৌধুরী।

সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙ্গল। আবছা ধূসর অন্ধকারে মাথার কাছে কার যেন অস্পষ্ট মুখ দেখল রোহানা। মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। অথচ মুখের গন্ধটা তার অনেক

www.pathagar.com

পরিচিত। মুখটা সে নিজেই দু'হাতে ধরে নিজের মুখের উপর নামিয়ে আনল। এই মুহূর্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংস্কার সব ভেসে গেল উন্মত্ত ঢেউয়ের আবেগে। দুটো মুখ সংলগ্ন হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় বাধা-বিপত্তি এবং তিক্ততাকে অতিক্রম করে গভীর ভালসাবায় লীন হয়ে গেল। মুখ ধুয়ে নিল রোহানা। ভাগ্যিস মুখটা তার ঘামে ভেজা ছিল। তাই চোখের পানির সিক্ততা ওমর বুঝতে পারেনি।

ওমরের ঘরে ঢুকল রোহানা। অন্ধকার নেই। লাইটের আলোয় দেখল, ওমরের বিছানা, জিনিসপত্র রোকন সাহেবের ঘরের তুলনায় অনেক বেশি মলিন, অপরিচ্ছন্ন এবং আবর্জনায় পূর্ণ। অপ্রস্তত ওমর বলল, তুমি আসবে জানলে ঘরটা ঠিকঠাক করে রাখতাম।

–আমি না এলেই নিজেকে তুমি এমনভাবে কষ্ট দেবে ওমর?

ওমর হাসল, বিষণ্ন এবং মলিন হাসি।

রোহানার বুকের ভেতরটা কেমন ধক্ করে উঠল। ওর চোখ দুটো গর্তে গেড়ে গেছে। মুখ শুকনো। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। গায়ের রং মলিন। ওমর তার দেহ এবং মনের ঔজ্জ্বল্য হারিযে ম্রীয়মান এক শাখায় পরিণত হয়েছে। যে শাখা একদিন ছিল জীবন উদ্যমে ভরপুর, সতেজ, সজীব, আজ তা আলো বাতাসের অভাবে, আর ঝড়ের ঝাপটায় বিষাদগ্রস্ত, পতনোম্মুখ। তবু ওর মধ্যে ভালবাসা আছে বলে ও আজো বেঁচে আছে।

–চা খাবে?

–খাব।

ওমর চা আনতে বেরিয়ে গেল। রোহানা কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওমর বলল, বাঃ। ঘুরে ঢুকে বলল, চিরকাল ছেলেরা মেয়েদের এই করুণা মিশ্রিত যত্নটুকু উপভোগ করে।

হেসে ফেলল রোহানা, আমি তোমাকে করুণা করি?

–নয়তো কি? নইলে কি ধূলোবালি পরিষ্কার করতে লেগে যাও একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং লেখিকা হয়ে?

–ওমর, সব মেয়েরেই কর্মসত্তা থেকে নারীসত্তা বড়।

–যদি সে নারীসত্তায় ভালবাসা থাকে, ওমর যোগ করল।

–নেই?

–আছে।

–অবশ্য ওজনে তোমার দিক ভারি।

–ভালবাসা জিনিসিটাই এমন যে প্রতিপক্ষকে বেশি কদর দিয়ে আনন্দ পায়।

দু'জনেই নির্মল আনন্দে হাসতে লাগল। পরক্ষণেই রোহানা গম্ভীর, জান, এমন মানুষ সংসারে আছে সস্তায় কোন জিনিস পেলে মূল্যায়নের দুর্লভতা কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ

www.pathagar.com

ন করতে জানে না।

–আমাদের বেলায় এরকম ঘটার সম্ভাবনা নেই। ভালবাসার বড় বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

–ওমর, ভয় হয়, মূল্যের এই দেনা কোথায় গিয়ে ঠেকবে।

–যা হবার হবে। মন খারাপ করো না। তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে।

রোহানা মুখ তুলে তাকাল।

–পত্রিকা বিক্রির এক হাজার টাকা জমা হয়ে গেছে।

–আশা করি আমরা এবার স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারব।

–স্বাধীনভাবেই তো কাজ করছি।

–প্রেসের এই কাজটা ছেড়ে দিলে হয় না?

–এ কথা বলছ কেন? মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই তো আছে।

রোহানার বুকের ভেতরটা কষ্টে মুচড়ে যেতে লাগল। কেমন করে সে ওমরকে বলবে, এ চাকরিটাও তোমার থাকছে না। মুখে বলল, এ জায়গা তোমার জন্য বড় অস্বাস্থ্যকর। কাগজের ধূলোবালি, মেশিনের কালি দিনরাত তোমার ফুসফুসে ঢুকছে। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

–এ কয়টা টাকার উপর তুমি এত ভরসা করছ কেন রোহানা? এই টাকা দিয়ে তুমি নিরাপদ আশ্রয় গড়বে, সংসার গড়বে?

–ওমর, প্রয়োজন এবং জীবনের ইচ্ছা এমন একটা ধারণার জন্ম দেয়।

–বাস্তব এর চেয়ে অনেক কঠিন এবং বিমুখ রোহানা।

–আমি একটা চাকরি খুঁজছি। ওমর তুমি বাধা দিয়ো না।

–তুমি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়বে। খবর সংগ্রহ ও লেখালেখির সময় পাবে না।

–দুটোই আমাকে চালাতে হবে।

–এ সময়ে চাকরি করাটা কি ঠিক হবে? মানুষ তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে সামরিক জান্তার সঙ্গে অসহযোগিতা করছে, ওপারে চলে যাচ্ছে। আর তুমি আঁটঘাট বেঁধে চাকরি করবে?

একটু সময় চুপ করে রইল রোহানা। তারপর বলল, ওমর. জীবন বাঁচানো ফরজ। যারা ওপারে গেছে তাদের একভাবে না একভাবে হিল্লে হয়েছে। কেউ কেউ কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছে ব্যাংক থেকে। আর রেফিউজিদের প্রতিপালন করছে বিভিন্ন বিশ্বসংস্থা। এগুলো কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিচ্ছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে। আর তুমি আমি এবং অন্যান্যরা যারা এদেশে রয়ে গেছি, তাদের না আছে জীবন ধারণের সংস্থান, না আছে জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা।

একটু থামল রোহানা, কথা যখন বলল, তার কণ্ঠস্বর ভারি, যারা যুদ্ধে যায় তারা সৈনিক, বেঁচে থাকলে গাজী, মৃত্যুতে শহীদ। কিন্তু বাকি আপামর জনসাধারণ ভাসমান

www.pathagar.com

খড়কুটো। তাদের দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। তাদের দুঃখ-কষ্ট-অবর্ণনীয়। তারা বাস করছে এক ভয়াবহ অবস্থায়। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ অবস্থায় মানুষ কি করবে? বাঁচতে তো হবে। এটা তো মানুষের বাঁচার ন্যূনতম মৌলিক অধিকার।

চিন্তিত মুখে বলল ওমর, যা করবে ভেবে চিন্তে করো রোহানা।

–ঠিক আছে, তাই করব।

রোহানা জানে, ওমরকে বাঁচাবার এই একমাত্র পথ। একটা আলাদা সংসার গড়া, কিন্তু মুখ ফুটে ওমরকে সে বলতে পারে না, ওমর আমাকে বিয়ে করে ফ্যালো। তাতে তোমার শান্তি, আমারো শান্তি। ওমর তোমার সামনে বড় বিপদ। এ বিপদ যে আমারই।

–এত কি ভাবছ? চল, তোমাকে রাতের খাবারটা খাইয়ে দিয়ে বিদায় দিই, ওমর তাড়া দিয়ে বলল।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এল ওরা। মাঝারি গোছের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। কোণার টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল দু'জনে। অনেকেই খাচ্ছে। কারো মুখে হাসি নেই। সাধারণত রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং ক্লাবগুলোতে হৈ হুল্লোড় হয়। জীবনের প্রবহমান চাঞ্চল্য ধরা পড়ে বিভিন্ন চরিত্রের, বৈশিষ্ট্যের জনতার মাঝে। নোংরামি থাকে, অপরিচ্ছন্নতা থাকে। কিন্তু মানুষ বেঁচে আছে, জীবনের স্বাদ গ্রহণ করছে, এই উপলব্ধির প্রফুল্লতা ধরা পড়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা, অর্থহীন কলবর এবং হাল্কা আনন্দ স্ফূর্তির মধ্যে। কিন্তু এ সবের কোন লক্ষণ নেই এখানে। জীবন ম্রিয়মান, ভয়ার্ত এবং শঙ্কাকুল। কেউ কেউ বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ জানালা দিযে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পাক সেনারা এসব জায়গায় হঠাৎ করে হানা দেয়। ধরে নিয়ে যায় ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেক সময় সন্দেহবশে নিরপরাধ লোকদের ধরে নিয়ে টরচার করে।

অর্ডার মত এক প্লেট খাবার এল, এক থাল ভাত, দু'টুকরো মুরগীর গোস্ত, পানির মত মুসুরির একবাটি ডাল।

রোহানা বেয়ারাকে বলল, একটা খালি প্লেট এনে দাও।

ওমরের খাবারের অর্ডার দেয়ার সময়ে রোহানা কোন কথা বলেনি। এখন প্লেট আনতে বলেছে খাবার ভাগাভাগি করবে বলে।

–আমি রাতে খাবার ছেড়ে দিয়েছি রোহানা।

–কেন জানতে পারি?

–ভরা পেটে রাত জেগে কাজ করতে অসুবিধে হয়।

–আজ খাও, সংক্ষেপে বলল রোহানা।

ওমর হেসে আর এক প্লেট ভাত তরকারি আনতে বলল। ঘরের ভেতরটা কেমন

www.pathagar.com

বিষণ্ণতায় ভরে আছে। আলোও জোরালো নয়। ষাট পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। চেয়ার টেবিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। গম্ভীর মুখ ম্যানেজার, বয়-বাবুর্চিদের। বয় কাছে আসতেই রোহানা জিজ্ঞেস করল, তোমরা এত চুপচাপ কেন?

বয় কেমন ইতস্তত করতে লাগল। ইচ্ছে আছে বলার, ভরসা নেই। বল, আমরা তো এদেশের মানুষই।

–গতকাল মিলিটারিরা তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের পকেটে নাকি পিস্তল পাওয়া গেছে। ওদের আর কোন হদিস নেই।

–তুমি এত কথা জান কি করে?

–ওরা তো এই অঞ্চলেরই ছেলে। আগেও এখানে এসে খেত। গতকালও খেতে এসেছিল। ম্যানেজার জানে, ওরা এখন মুক্তিযোদ্ধা, ওদের আমরা না খেতে দিয়ে পারিনে। দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা কি উচিত আপা?

–তা তো ঠিকই, রোহানা আশ্বাস দিল।

ছেলেটি আরো কাছে এসে ফিস্‌ফিস করে বলল, ম্যানেজারকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

– তারপর? ওমরের চোখে ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা।

–বন্দুকের বাট দিয়ে নাকি খুব পিটিয়েছে। মুক্তিদের চেনে কিনা তাই জানতে চেয়েছিল। তা ম্যানেজার খুব শক্ত মানুষ, বলেছে, কাউকে চিনি না। ওমন কত নতুন খদ্দর আসে প্রতিদিন আমার রেষ্টুরেন্টে। তারপর ওরা কি করল জানেন? এক মুক্তিকে ধরে নিয়ে এল ম্যানেজারের সামনে, জিজ্ঞেস করল, একে চেন? তা সাবাস বাপের বেটা, কি জবাব দিল জানেন, বলল, কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে। অথচ চিনি না। আপনাকে কি কখনো দেখেছি জনাব?

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটি নির্বিকার মুখে চেয়ে আছে।

–ও হ্যাঁ, গতকাল আমার ওখানে খেতে গিয়েছিলেন, এরা ধরে নিয়ে এল, মনে পড়ছে এখন।

–জেয়াদা বাত মাত্ করো, বলে প্রচণ্ড এক ঘুষি লাগাল ম্যানেজারের চোয়ালে। ম্যানেজারের মুখ ফুলে ঢোল, ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে। কিন্তু আর মুখ খুলল না সে।

–ইয়ে লোগ কবসে মিসক্রিয়েন্ট বানা?

–জানি না।

–ইনলোগকা ঠিকানা কাঁহা?

–জানি না।

ফের পিটুনি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ম্যানেজার। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেল সে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটিকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে ওরা ভেতরে নিয়ে গেলো। আর কোন হদিশ নেই। তা ম্যানেজার আমাদের লোক ভাল। ওদের তিনজনের

www.pathagar.com

বাড়িতেই সকাল সকাল ডিশভর্তি খাবার পাঠিয়েছে। তিন বাড়িতেই কান্নার রোল। কে রাঁধে আর কে খায়?

ওমর এবং রোহানার মুখে খাবার বিস্বাদ লাগছে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, মুক্তিরা কি সেদিন খাবার শেষ করেছিল, নাকি আরম্ভ করতে না করতেই ধরে নিয়ে গেছে। ওরা কি অভুক্ত ছিল? ওদের ঘর কোথায়? ওদের বাবা-মারা কি করছে? শুধু কান্নাকাটিই করছে নাকি ছেলেদের ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করছে? এসব ক্ষেত্রে ছাড়া পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু এসব কথা নিরর্থক বলে রোহানা এবং ওমর ভাতের থালায় হাত ডুবিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বয় বলল, খান আপা, এখন আর ভয় নেই। ওরা আর এভাবে আসতে পারবে না।

–কেন, আশ্বাস দিয়েছে নাকি?

–ব্যাপারটা তা নয়। আমরা চারদিকে পাহারা বসিয়েছি।

–সশস্ত্র?

–কি যে বলেন, তাহলে কি রক্ষে আছে? ওদের হাতে কত ভারি অস্ত্র। উত্তর দিকে একজন পান বিক্রি নিয়ে বসেছে। দক্ষিণে বাদামওয়ালা, পূর্বে একজন চুড়িওয়ালি, পশ্চিমে কুমার, মাটির হাড়ি পাতিল নিয়ে বসে আছে বিক্রির জন্য। শত্রুর আগমন টের পেলেই কুকুরের মত ডেকে উঠবে। কেউ ডাকবে মোরগের ডাক, কেউ দেবে বাঁশীতে ফুঁ। পশ্চিমের জন পাখির ডাক, বৌ কথা কও। তাই কোনদিক থেকে শত্রু আসবে, আর আমরা কোন দিক দিয়ে পালাব, সব ঠিক।

–বাঃ চমৎকার, ওমর বলে উঠল, একেই বলে বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই আমরা একবারে বেশি খানা পাকাচ্ছি না। বারবার পাকাচ্ছি। আপনারা গরম গরম ভাত পেলেন। আরেক প্লেট ভাত আনব আপা?

–না।

–খেয়ে নিন আপা, হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এর মধ্যেই আমাদের বাঁচার পথ করে নিতে হবে। আমাদের কাজ অনেক গুণ বেড়েছে, তা বাড়ুক। কত মায়ের ছেলে যে এই যুদ্ধে জান দিচ্ছে, আমরা একটু গায়ে গতরে খাটব, এই আর কি। ছেলেটি ভেতরে চলে গেল।

রোহানা ভাবল, আজ সাধারণ মানুষও বাস্তবতা সম্বন্ধে কত সচেতন হয়ে উঠেছে। কঠিন বাস্তবতা সংগ্রামের সাহস জোগায়।

ভাত মুখে তুলতে ইচ্ছে করছে না রোহানার। তবু ওমরের অনুরোধে এবং ছেলেটির কথা ভেবে খেতে হলো। সমস্ত দেশ আজ যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। স্বাধীনতা শব্দটি তাদের চোখের সামনে। দ্বিতীয় শব্দটি পশ্চিম পাকিস্তানীরা জুলুমবাজ, তাদের হাত থেকে মুক্ত হওয়া চাই। সমস্ত পৃথিবীটা আজ কি আদর্শগত ভাগে ভাগ হয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে, নাকি ধর্মীয়, নীতিগত ভাবে? ক্রুসেডের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে স্পেনের যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ সবই তো হয়েছে ধর্মীয় অনুভূতির অজুহাতে। নীরিহ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে স্পেনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তারা মুসলমান বলেই সমগ্র খৃষ্টান জাতি এক হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহে অসংখ্য মুসলমানকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো তারা মুসলমান বলেই। তখন কোথায় ছিল আদর্শ, কোথায় ছিল দেশপ্রেম, কোথায় ছিল নিরপেক্ষ নৈতিকতা? কিন্তু আজ দেশে দেশে এসব কি হচ্ছে? মুসলমান মুসলমানকে নির্বিচারে মারছে, হানাহানি করছে, রক্তপাত ঘটাচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট করছে, সম্মানের হানি করছে। কোন্ উঁই পোকা এই ধ্বংসযজ্ঞে নেমেছে তা কেউ ভাবছে না। শুধু উপরের ক্ষত দেখে সর্ব উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে, এটা কোন দূরদর্শী আচরণ নয়।

–রোহানা, এত কি ভাবছ? দারোয়ানের ঘরের জায়গাটুকু আছে তো?

–না।

–আশ্চর্য, তাহলে থাক কোথায়?

–নিজেদের ভাঙ্গা বাড়িতে।

–সেখানে তো অনেক উড়ো লোকের বাস।

–ওদের মাঝেই থাকি।

–খারাপ লাগে না?

–লাগে।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলল ওমর, কবে যে ভাঙ্গা ছাদ হুড়মুড় করে মাথার উপর পড়বে!

–পড়ুক।

–তোমাকে এত নিরাশ হতে কোন দিন দেখিনি।

–যখন মানুষ অথৈ পানিতে পড়ে খড়কুটোরও নাগাল পায় না তখন এমনিই হয়।

– ওখানে আমাকেও নিতে চাও? সুন্দর সংসারের স্বপ্ন দ্যাখো?

–দেখি, মরলে একসঙ্গে মরব।

–আমি চাই, তুমি বেঁচে থাক।

–কেন?

–এই যুদ্ধের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে লিখবে কে?

–কেউ না কেউ লিখবে।

–কেউ লিখবে না। সবাই ইতিহাসে বীর হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সেই বীরত্ব তোষণের, মিথ্যাচারিতার, চাটুকারিতার।

–রোহানা, আবার ডাকে ওমর।

–বল।

www.pathagar.com

–তোমার চোখে আজকাল এত সহজে পানি আসে কেন?

–জানিনা।

–রোহানা, অফুরন্ত পানিতে বুদ্বুদ ওঠে না, ময়লা পানিতে ওঠে। তোমার দুঃখ কিসের রোহানা?

–তোমাকে নিয়ে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে।

–আমরা কি বেঁচে আছি না?

–একে বাঁচা বলে না। সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে আমার ভয়।

–কেন এত ভয়?

–বোঝ না? এ যুদ্ধ বুশরাকে ক্ষতবিক্ষত করে, আমাকে করে, করে আরো অনেককে যারা একদিন পশ্চিম অঞ্চলের লোককে আপন ভেবে ভালবেসেছিল।

এখন তাদের পর ভাবা যায় না?

–না, এমন কি মৃত্যুতেও না।

–কেন?

–ভালবাসা যে বর্ণ-গোত্র-জাত কিছু মানে না।

–এ নিয়ে এত ভেবে কি হবে? যা ভবিতব্য তাতো এড়ানো যায় না।

–কি যেন! বিধাতা সৃষ্টি রক্ষা করেন, ধ্বংস করেন না। তিনি কোন জাতির উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেন না। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ আজ একটা অন্ধ আবেগ, ক্ষমতার ভাগাভাগি, যুদ্ধ দর্পিত মানুষের অহংকার।

–চুপ কর, কে যেন আসছে।

আগন্তুক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঘোষকের মত হাত নেড়ে বলল, আপনারা পশ্চিমের দোর দিয়ে পালান। শত্রু আসছে।

মুহূর্তে ঘরে লন্ডভন্ড কান্ড ঘটে গেল। যে যার টেবিল থেকে উঠে পশ্চিম দিকে ছুটল। ম্যানেজার ক্যাশ নিয়ে ছুটল সবার আগে। একজন শিশু পায়ের নিচে পড়ে কঁকিয়ে উঠল। বাবা মা শিশুটিকে নিয়ে খেতে বসেছিল। লোকের ধাক্কায় কোল থেকে ছিটকে পড়েছে। ভাতের থালা, গ্লাস, ডিশ ঝনঝন শব্দে নিচে পড়ে ভাঙ্গতে লাগল। একজন বলল, বাল্ব ভেঙ্গে দাও, অন্ধকারে ওরা যেন কাউকে দেখতে না পায়। মুহূর্তে ঘর অন্ধকারে ডুবে গেল। সেই রুদ্ধশ্বাসঘন কালো অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে ধরে বসে রইল রোহানা এবং ওমর।

–ওঠ রোহানা।

–কোথায় কোন দিকে যাব? কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে। যারা পালিয়েছে তারা পুরনো লোক। এখানকার অলিগলি সব চেনে।

–ওঠ, আমার হাত ধর। নইলে ক্রসফায়ারিংয়ে পড়ে যাব। এখানে কেউ নেই, সবাই পালিয়েছে।

www.pathagar.com

–ক্রসফায়ারিং কিসের?

–গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার পুরোপুরি ধারণা নেই। হাত ধর আমার।

দু'জনে হোঁচট খেতে খেতে অনুমান করে পশ্চিম দিকে ছুটল। দরজার বাইরে পা রাখতেই গুলীর শব্দ। দালানের দেয়াল ঘেঁসে বসে পড়ল দু'জনে। মিনিট খানেক গুলীর শব্দের পর হঠাৎ জোরালো টর্চের আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। বাংলায় কে যেন বলছে, বাল্ব লাগাও। আলো এবং লোকজনে ঘর আলোময় এবং শব্দময়। রোহানার নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা, ব্যাপার কি?

–কোথায়ও ভুল হয়েছে। ভেতরে চল।

–না, অপেক্ষা কর।

–দরকার নেই।

ওমর আগে ঘরে ঢুকল, পিছনে রোহানা। দশ-বারোজন যুবক, সবার হাতে রাইফেল। পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনারা পালাতে পারেন নি?

–না, তবে দরজার বাইরে ছিলাম।

–তাহলে আমাদের মিশন সাক্‌সেস্‌ফুল।

–কিসের মিশন?

–এটা শত্রু আক্রমণের রিহার্সেল। দেখলাম কত তাড়াতাড়ি আমাদের লোকজন সরে পড়তে পারে।

–কেন বলুন তো?

–এখান থেকে পরপর দু'বার পাক সেনারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে গেছে। অযথা লোক ক্ষয় আমাদের হাইকমান্ড পছন্দ করে না। আমরা মারব বেশি, মরব কম। তাই তড়িৎবেগে পশ্চাৎ অপসারণের মহড়া দিলাম।

–এখানে কি মুক্তিযোদ্ধারা ছিল?

–ছিল, জন পনের।

–আশ্চর্য, আমরা বুঝতেই পারিনি।

–পারবেন কেমন করে? তারা আপনাদের মতই সাধারণ লোক।

–ঠিক বলেছেন। কিন্তু রেস্টুরেন্ট এখান থেকে সরালেই তো হয়।

–ক্ষেপেছেন? ম্যানেজার পাঁড় গোঁয়ার। এটা ওর বাপ-দাদার আমলের রেস্টুরেন্ট। পুরনো ব্যবসা, গভীর মমতা। এ অঞ্চলের লোকজন সব তার চেনা। জনান্তে বলছি তিনি কিছু সমাজসেবাও করেন। এখানকার গরীবদের মধ্যে অন্ন-বস্ত্র গোপনে বিতরণ করেন।

–আমরাও তাই শুনলাম।

–এর মধ্যে সব শুনে ফেলেছেন? সত্যি বলছি, লোকটি খুব ভাল। সজ্জন। পরোপকারী। দেশপ্রেমিক। সব মুক্তিযোদ্ধাদের বিনে পয়সায় খাওয়ায়। ভাল জিনিসটি

www.pathagar.com

সবার আগে ওদের পাতে তুলে দেয়।

ওমর বলল, বাইরে থেকে সব সময় সব লোককে চেনা যায় না। দেখলে মনে হয় কাঠখোট্টা।

–ঢাকাইয়া কুট্টি।

–এবার তাহলে আসি?

–আসুন। রিহার্সাল দিচ্ছি বটে, কিন্তু ওরা যে কোন সময়েই হানা দিতে পারে।

–খাওয়া হয়েছে?

–সবে আরম্ভ করেছিলাম।

–তাহলে বসুন, আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান। ম্যানেজার এবং কুক নতুন করে রান্না করতে অলরেডি লেগে গেছে।

–সময় নেই, ওকে অনেক দূর যেতে হবে, বলে রোহানাকে দেখাল ওমর।

–এখানে কেন এসেছিলেন?

–আমি এদিকে একটা প্রেসে কাজ করি। ও এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। এই রেস্টুরেন্টের সুনাম আছে, তাই ভাবলাম খেয়ে যাই।

–দুঃখিত, আপনাদের খাওয়া হলো না।

–যুদ্ধের সময়ে এটা সামান্য ব্যাপার। আসি?

–আসুন।

পথে নেমে ওমর বলল, মুক্তিযোদ্ধাদের কি সুন্দর ব্যবহার।

–গুটিকতক পাষন্ড ছাড়া সব মানুষের ব্যবহার সুন্দর। তবু যুদ্ধ হয়। আসলে কি জান, যুদ্ধের সময়ে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। মানবিক বোধ লোপ পায়। তা না হলে মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে না, চতুরতার আশ্রয়ও নিতে পারে না। এর সবগুলো হচ্ছে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির বিরোধী শক্তি।

–তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ রোহানা। মানুষের দুটো চেহারা পরস্পর বিরোধী। একই মানুষের মধ্যে স্বর্গ এবং নরক পাশাপাশি থাকে। অর্থাৎ কল্যাণকামী শক্তি, অন্যটি ধ্বংসকারী বিরূপতা।

রোহানা জবাব দিল, কথাগুলো এ রকম, ফুলের মধ্যে কীট থাকে, মুক্তো ঝিনুকের কর্দমাক্ত দেহ থেকেই বের করে আনতে হয়। আসলে কি জান , সব রিপুই মানুষের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়।

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করল, এখন কোথায় যাবে, তোমার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে?

–আপাততঃ তাই।

–ওখানে অসুবিধে হচ্ছে না?

–বলেছি তো হচ্ছে। বাচ্চাদের গন্ডগোলে আমার ঘুম হয় না। বড়দের ঝগড়াঝাটি

www.pathagar.com

দিনরাত লেগেই আছে। অশান্তি। চিন্তা করো না। জয়নালের ঘর শীগগীর খালি হবে, ফিরে যাব কিনা ভাবছি।

–দ্বিধা কেন? ও খুব ভাল লোক। নিজের সন্তানের মতই আমাদের স্নেহ করে।

–কারণ আছে।

–খুলে বল।

–ওর ঘরে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছে। সেদিন আমাকে দেখে ওরা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

–কিন্তু তুমি তো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি নও। শুধু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের কারণগুলো বিশ্লেষণ করছ।

–ওরা অতশত বোঝে না। হাজার হলেও ছেলে মানুষ। ওদের আবেগ প্রচন্ড, যুক্তি কম। আমার মনে হয়, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা আমার সম্পর্কে ওদের কিছু ভুল ধারণা দিয়েছে।

–কেন বল তো?

–পানির মত সহজ ব্যাপার। আমি আর ওখানে ঢুকতে না পারলে ওর পোস্ট পাকাপোক্ত হয়।

রোহানার হাতে ওমরের হাত ভিজে উঠছে। বলল, তোমার চতুর্দিকে বিপদ রোহানা। তুমি অনেক দূরে চলে যাও।

–কোথায় যাব ওমর, দেশটা যে বড় ছোট্ট।

–এটা তোমার আমাকে না ছেড়ে যাওয়ার বাহানা।

–একই প্রশ্ন তোমাকেও।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইল ওমর।

দিন সাতেকের মধ্যে রোহানা আবার দেখা করল ওমরের সঙ্গে। তার মুখে খুশি খুশি ভাব। ওমর মৃদু ঠাট্টা করল, ব্যাপার কি? মেঘ সরে গিয়ে রোদের চিকচিকে মুখ।

–দুর্ভাবনা থেকে আপাতত মুক্তি।

–বাঃ জবর সুখবর।

–এই ঠাট্টা করছ?

–না। খবরটা বলে ফেল।

–ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করেছি, একবারে ইনডিপেনডেন্ট, ঝামেলা নেই। ভাড়া মোটে দু'শো টাকা।

সব দুঃখ–কষ্ট ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল ওমর, এই সুখবর?

হাসি থামিয়ে ওমরের জিজ্ঞাসা, বাসায় কে থাকবে? তুমি না আমি?

–তুমি।

www.pathagar.com

ওমর চুপ। ওমরকে উৎসাহিত করার জন্য এক সঙ্গে অনেক কথা বলল রোহানা, আমি দিনের বেলায় অধিকাংশ সময় তোমার কাছে থাকব। রাতটা বাসায় যে করে হোক কাটিয়ে দেব।

ওমর গম্ভীর।

–এমন করছ কেন ওমর, কথা বল।

–ও বাসায় আমি যাচ্ছি না।

রোহানার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। কাতর হয়ে বলল, কেন ওমর, কেন?

অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি বেলোনিয়ায় যাচ্ছি।

–বল কি? ওখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে।

–জানি।

–তাহলে?

–আহত মামাকে দেখতে যাচ্ছি।

–তোমার মামা আছেন এ দেশে, তুমি তো কোনদিন বলনি।

–বললে কি লাভ হতো?

–লাভ লোকসান দিয়ে কি সব কিছুর বিচার হয়?

–তাহলে কি দিয়ে হয়?

–এটা জাস্ট সেন্টিমেন্ট।

–যুদ্ধের সময় সেন্টিমেন্ট দিয়ে কোন কাজ হয় না।

–তোমার মামা এত কাছে আছেন, এ কথা ভাবতে তোমার ভাল লাগে না?

–না। তিনি ডিফেন্সের লোক। এ দেশে না এলে যুদ্ধে তিনি আহত হতেন না।

–আঘাত কি গুরুতর?

–জানি না।

–কে খবর দিল?

–পরিচিত একজন। তুমি চিনবে না।

–কখন যাচ্ছ?

–আজকে দুপুরের দিকে একটা ট্রেন আছে।

–আমি যাব তোমার সঙ্গে।

–পাগল। তুমি গিয়ে কি করবে? মামাকে দেখবে? তিনি তোমার শত্রু পক্ষ।

–তুমি এমন টেরচাভাবে কথা বলছ কেন?

–তোমার তাই মনে হচ্ছে?

–তাহলে সত্যি কথা বলি। তোমার মামা একটা উপলক্ষ। আমি সারা রাস্তা তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাব।

–আমি কি গরু-ছাগল যে ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাব?

www.pathagar.com

–তা ভাবছি না। তবে বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী কেউই আজ রাস্তায় নিরাপদ না।

–তুমি কি আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি?

–কিছুটা।

–কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলবে?

–আমরা স্বামী-স্ত্রী।

–ভালবাসা কি মিথ্যেবাদী হতে শেখায়?

–হ্যাঁ শেখায়। জান না বাঁচলে ভালবাসাও মিথ্যে হয়ে যায়।

–পরকালে বিশ্বাস কর না?

–করি। কিন্তু লাইলী–মজনু হতে চাই না। আমি তোমাকে পরকাল এবং ইহকাল দু'কালেই চাই।

–লোভ এত বেশি?

–ভালবাসায় যত লোভ তত প্রগাঢ়তা।

–তোমার সঙ্গে কথায় পারি না।

–পারলে কি করতে?

–বুঝিয়ে দিতাম, তোমার এই হারাই হারাই ভাব না পাওয়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক।

–ঠিক বলেছ, আমি আর পারি না।

কোমলতা ভেসে ওঠে ওমরের নীল চোখে। বলে, ভালবেসে এই পৃথিবীতে তোমার আমার মত এত কষ্ট কেউ পেয়েছে বলে জানি না।

–এটা তো সবে শুরু। শেষ কোথায় জানি না। ওমর, তোমাকে যতটুকু কাছে পাই সেইটুকুই আমার লাভ। তৈরি হয়ে আসি?

–তৈরি হওয়া মানে তোমার দু'টো টাঙ্গাইলের শাড়ি ব্যাগে পুরে নেয়া, এই তো?

হাসল রোহানা, কপালে এর চেয়ে বেশি যে জোটে না।

–দরকার নেই। যেমন আছ ওমনি চল। সোজা মিলিটারি ক্যাম্পে চলে যাব। শাড়ি বদলাবার সময় এবং স্থান কোনটাই পাবে না।

–ক্লান্ত সৈনিকের মত আমার চুল এবং গা দিয়ে যে গন্ধ বেরুবে।

–বের হোক, আমি অখুশি নই।

–আমিও না। তুমি আগে সিগারেট খেতে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বের হতো। তাও খারাপ লাগত না। এখন খাওনা কেন?

–পয়সা নেই।

–আমি তোমাকে ট্রেনে সিগারেট কিনে দেব।

–হাজার খানেক টাকা পেয়ে দু'দিনের বাদশাহী পেয়েছ। এ সপ্তাহে কাগজ বেরুবে না, মনে রেখো।

www.pathagar.com

–বেরুবে।

–কেমন করে? দু'জনেই বাইরে থাকছি।

–বাইরে থেকেই লেখাগুলো সেরে ফেলব। ফিরে এসে ছাপতে দেব।

–চান মিয়া রাজি হবে না। আমার দিনরাত কাজের বদলে এই সুবিধেটুকু দিত। এখন দেবে না।

গম্ভীর হয়ে গেল রোহানা। মনে মনে ভাবল, কথাটা মিথ্যে না।

যতদূর সম্ভব সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে ট্রেনে উঠল দু'জনে। রোহানা মাথায় ঘোমটা দিল লম্বা করে। ওমরের দিকে তাকিয়ে রোহানা আতঙ্কিত। সোনা বর্ণ গায়ের রং ছাই চাপা হয়েও উঁকি দিচ্ছে উজ্জ্বলতা নিয়ে। সানগ্লাসের মধ্য দিয়েও চোখের নীল রংয়ের হাসি ভেসে ওঠে। শুধু পিঙ্গল বর্ণের চুল ঢাকা পড়েছে কালো রংয়ের ডাইংয়ে।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। এক রেজিমেন্ট সৈন্য উঠল ট্রেনে। রোহানার ফিস্‌ফিস্ শব্দ ওমরের কানে এল, কি হবে?

–ভয় নেই, ওরা বেলুচ।

ওদের তামাটে মুখ। কেউ কেউ রীতিমত কালো। ওমর জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখল দু'জন রাইফেলধারী বেলুচ উঠছে ওদের সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। যে যার মত আইডেনটিটি কার্ড বের করল। নামের সঙ্গে বাট শব্দ তুলে দিয়েছে ওমর। সাংবাদিক হিসাবে দু'জনেরই পরিচয়। রোহানা কার্ড বের করল না।

–এই কার্ড বের কর।

–না। আমি এখন শুধু তোমার স্ত্রী। এতে বিপদ কম।

ওমর বাধ্য হয়ে রোহানাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিল।

–আপলোগ কাঁহা যা রাহা?

–লাকসাম।

মনে মনে ওমরের বুদ্ধির তারিফ করল রোহানা। বেলোনিয়া বললে রক্ষে ছিল না। ও স্থান এখন যুদ্ধের উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ড। বেলোনিয়ার উল্লেখ করলেই পাক সেনারা ভাববে এরা বাঙ্গালী চর অথবা মুক্তিযোদ্ধা। ধরে নিয়ে যাবে।

–কিস্ লিয়ে?

ঘাবড়ে গেল ওমর। জার্নালিস্ট লেখা রয়েছে। যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছে শুনলেই ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবে জোর করে। রোহানার ফিসফিস শব্দ আবার শোনা গেল, বল শ্বশুর বাড়ি। সেই রকমই বলল ওমর। কার্ড ফেরৎ দিয়ে চলে গেল ওরা।

–বাব্বা, ফাঁড়া কাটল, ওমরের স্বস্তির নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে এল।

–ফাঁড়া আরো সামনে আছে।

–বল কি তুমি?

–বুঝতে পারছ না কেন, এটা যুদ্ধক্ষেত্রের এক নম্বর সেক্টর। চট্টগ্রাম, পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম, ফেনী ইত্যাদি নিয়ে বিশাল এক যুদ্ধক্ষেত্র। বেলোনিয়া জয় করার উপর দু'পক্ষেরই ভাগ্য নির্ভর করছে। সাংবাদিকদের খবর রাখতে হয়। রবার্ট সঙ্গে এলে আরো ভাল হতো।

–তুমি ভুলে যাচ্ছ রোহানা, আমি ওখানে ব্যক্তিগত কাজে যাচ্ছি।

–সরি ওমর।

–দুঃখটাও আমার একা।

–ওমর ভুল বোঝো না, অনুতপ্ত কণ্ঠ রোহানার, তোমার মামাকে কখনো চোখে দেখিনি। তুমি ওর নাম পর্যন্ত মুখে আননি। তাই ভুলটা আমি সহজে করে ফেলেছি।

ওমর কথা বলল না। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

লাকসাম স্টেশন আসতে দেরি নেই। রাত এখন এগারোটা। দু'জনের চোখেই ঘুম ঘুম ভাব। রাতের খাবার কেউ খায়নি। যুদ্ধ না থাকলে এই ট্রেন জার্নি কত সুখের হতো। দু'পাশের গাছপালা সরসর করে দূরে সরে যাচ্ছে। ওদের স্পষ্ট অবয়ব দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো অন্ধকার ওদের দেহে লেপ্টে গিয়ে অশরীরি ছায়া হয়ে গেছে। দূরে কুঁড়ে ঘরগুলো শান্ত বধুর মত মাথা নিচু করে শাড়ির আঁচল খুঁটছে। মৃদু আলোর রেশ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁকে আটকে আছে। বাইরে মুখ দেখাতে সাহস পাচ্ছে না। দিনের বেলার পড়ন্ত রোদে রোহানার চোখে দৃশ্য ছিল অন্য রকম।

ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা ন্যাংটো ছেলে-মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে রেলগাড়ির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিল। অলসভাবে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে খোলা মাঠে। কিন্তু কোন কৃষক নেই। শস্য ক্ষেতগুলো শস্যহীন, ফাঁকা, উদাস, বিষণ্ন। বিকেল হতেই দৃশ্য বদলে যেতে লাগল। দুপুর সরে যেতেই রোদ তার উজ্জ্বলতা হারাল। ধূসরতা ছেয়ে ফেলল আকাশ এবং দিগন্ত। গাছপালার সবুজ শরীর ধোঁয়াটে কুয়াশায় ডুবে গেল। মাঝে মাঝে লাল লাল টিলা চোখে পড়ছিল। এখন তাও দেখা যায় না। জোনাকিরা এখনো ছুটোছুটি আরম্ভ করেনি। নিকষ অন্ধকার ধীরে ধীরে বাদুড়ের রাজত্বে পরিণত হচ্ছে। মাঝে মাঝে স্টেশন আসছে। অথচ আগের মত শোরগোল এবং কোলাহল নেই। হকাররা পান সিগারেট বিক্রি করছে নিঃশব্দে। চিনা-বাদাম, ঝালমুড়ি, চানাচুর বিক্রির ছোট ছোট ছেলেদের কণ্ঠেও আগের মত হাঁকডাক নেই। এতটুকু বাচ্চা ছেলে সব। অথচ ওদের চোখেও কেমন এক রকম সতর্ক চঞ্চলতা।

কামরার লোকগুলোও যেন বোবা বনে গেছে। যুদ্ধের খবর ফলাও করে বলার জন্য কেউ কেউ সবে মুখ খুলেছিল, সৈন্যদের ঢুকতে দেখে সবাই চুপ। ওরা যাওয়া মাত্র আবার আরম্ভ করার প্রচেষ্টা। কিন্তু প্লাটফরমের উপর সৈন্যদের আনাগোনা দেখে মুখ বন্ধ। কেউ কেউ ওমরকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, যাচ্ছেন কোথায়?

–শুনলেন তো, লাকসাম, শ্বশুরবাড়ি।

–সবে বিয়ে করেছেন?

www.pathagar.com

–হ্যাঁ।

–বাচ্চা-কাচ্চা হয় নি?

–না।

–আজকাল বার্থ কন্ট্রোলের উপর শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা জোর দিচ্ছে।

ওমর চুপ, রোহানার ঘোমটার নিচে শব্দহীন হাসি।

–যুদ্ধের ব্যাপারটা কেমন বুঝছেন?

–জনাব, দেয়ালেরও কান আছে?

–ও ব্যাটারা কি বাংলা বোঝে?

–কিছু কিছু বোঝে।

–কি যে বলেন, উল্টো করে যারা আইডেনটিটি কার্ড ধরে।

–বাংলায় লেখা থাকলে অসুবিধে হয়। ইংরেজি একটু আধটু সবাই জানে।

–আপনি দেখছি ওদের হয়ে ওকালতি করছেন।

ওমর বলল, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

–আপনি যাতে বেফাঁস কিছু বলে বিপদে না পড়েন তাই সতর্ক করে দিলাম।

অসহায়ের মত হাসল লোকটা। পাশের লোকটি বলল, উনি ঠিকই বলেছেন, এই কামরাতেই যে ওদের চর নেই, এ কথা কে বলতে পারে?

লোকটির মুখে ভয়ার্ত ছায়া। ওমর শান্তভাবে বলল, অত ভয় না পেলেও চলবে। ওরা যুদ্ধ নিয়েই বেশি ব্যস্ত।

–ঠিক বলেছেন সাহেব, যা ফাইট হচ্ছে দু'পক্ষে, বলার মত না। এস্‌পার ওস্‌পার হয়েই যাবে। জয়ের পাল্লাটা আমাদের দিকেই বেশি। ব্যাটারা বুঝুক, বাঙ্গালীদের কত সাহস এবং বুদ্ধি।

আগের লোকটি হাত নেড়ে বলল, তুমি আমাকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই দেখি আরম্ভ করলে।

–বুঝলে ভায়া, যুদ্ধের গল্পটা হচ্ছে পান চিবুনোর মত রসালো ব্যাপার।

ওমর নিজের হাতে রোহানার হাতের চাপ উপলব্ধি করেও থামল না, বলল, এই যুদ্ধে বোধহয় আপনার কেউ আপনজন মারা যায়নি। কিংবা ক্ষতিগ্রস্তও হয়নি?

–না বাবা, আমি ওসবের মধ্যে নেই। ছা পোষা মানুষ। ব্যবসা বাণিজ্য করি, টু পাইস আয় করি। ক্ষুদে ব্যবসায়ী। তবে ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। জিনিস-পত্রের দাম হঠাৎ পড়ে গেছে। খদ্দের খুব কম। যুদ্ধটা ভালোয় ভালোয় শেষ হলে বাঁচি।

আগের ভদ্রলোক এবার সাহসী গলায় বলল, আমার ব্যাপার আলাদা। আমার এক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে। সেজন্য আমি গর্বিত।

পিছন থেকে কে একজন বলে ওঠে, গর্ব ঘরে গিয়ে করুন। ওরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আপনার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, তবে এখুনি আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ইন্টারোগেশন আরম্ভ করবে। চাই কি গুলী করে মেরেও ফেলতে পারে। রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকবে আপনার লাশ। আপনার আত্মীয়স্বজন জানতেও পারবে না আপনার গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ।

লোকটা ঢোক গিলে বলল, তাই নাকি?

পিছনের লোকটি এবার বিজ্ঞের মত বলল, কে একজন জ্ঞানী লোক বলেছেন, ভ্রমণে মুখ বন্ধ রাখবে কিন্তু চোখ খোলা রাখবে।

–চমৎকার কথা! কে বলেছেন?

–নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

সীটের একেবারে কোণ ঘেঁষে বসা লোকটি এবার মুখ খোলে, স্ট্র্যাটেজিক দিক দিয়ে আমরা সুবিধেজনক স্থানে আছি। এটা হলো গিয়ে নদী-নালা, খাল-বিলের দেশ। ঝোঁপ-ঝাড়, ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি তো আছেই। গেরিলা যুদ্ধের জন্য স্বর্গস্থান। আর খোট্টারা সাঁতার পর্যন্ত জানে না।

–আপনি কি করে জানেন সাঁতার জানে না?

–আমি জানব না? এতকাল পশ্চিম পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সার্ভিসে ছিলাম। যুদ্ধ না লাগতেই ট্রান্সফার নিয়ে বুদ্ধিমানের মত পরিবার পরিজনসহ চলে এলাম। ভারি বৃষ্টি হলেও শালারা ড্রেনের পানিতে ডুবে মরে, বলে ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজে হো হো করে হেসে উঠল।

–ভারি মজা তো, অন্য একজন যাত্রী ফোঁড়ন কাটল।

সামনের সারির লোকজনও চুপ থাকল না, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে যুদ্ধে আমরা জিতবই।

–আলবৎ, যেখানে ইন্ডিয়ার মত সুপার পাওয়ার আমাদের মদদ দিচ্ছে।

পাশের পাজামা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ইন্ডিয়ার কথা বলবেন না। তারা নিজের স্বার্থেই এসেছে। দুধের সর ওরাই খাবে। আমরা শুধু বিড়ালের ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়তে সাহায্য করছি।

ওমনি কামরায় হৈ হৈ উঠল, শালা মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ। ধর শালাকে, মার শালাকে।

–আরে ভাই আমি কোন লীগ নই।

কিন্তু তার গলা ডুবে গেল অশ্রাব্য গালাগালির মধ্যে। ওমর বলে উঠল, আপনারা থামুন। কামরায় মারামারি হলে আমি চেন টানব। মেয়ে-ছেলে নিয়ে যাচ্ছি। কামরায় বাচ্চাকাচ্চাও আছে। তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দিতে পারি না। চেন টানলে রাইফেল হাতে পাক বাহিনী ছুটে আসবে। তখন কিন্তু ইন্ডিয়ার স্বপক্ষ বিপক্ষ বলে কিছু থাকবে না। সবাইকে ধরে নিয়ে গুলী করবে। মন্ত্রের মত কাজ হলো। সবার হাঁকডাক মুহূর্তে বন্ধ। একজন শেষ মুহূর্তের ফোঁড়ন কাটতে ছাড়ল না, ইন্ডিয়া হলো গিয়ে

www.pathagar.com

আমাদের মিত্রশক্তি। বন্ধু দেশের দুর্নাম কিছুতেই সহ্য করব না।

কেউ কোন জবাব দিল না। শুধু ট্রেনের ঝিক্ ঝিক্ শব্দ, যেতে হবে অনেক দূর, যেতে হবে অনেক দূর, গানের একটানা ঐকতান। ফড়িং জাতীয় পোকা উড়ছে। অনেক যাত্রীর উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি ওদিকে। অনেকক্ষণ পরে নৈঃশব্দে চিড় খেল। পাজামা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটি ঘড়ি দেখে বললেন, আধ ঘন্টার মধ্যে লাকসাম এসে যাবে। তিনি প্রথমে বসেছিলেন মাঝের সীটে। এখন জানালার ধারে ওমরের পাশে। ভদ্রলোক ওমরের সঙ্গে কথা বলার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। ওমর বলেনি। কামরায় অনেক লোক। আবার একযোগে ধেয়ে এলে রক্ষে নেই। উত্তেজিত জনতা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, কোন বাধা মানে না। পাক সেনা তো নয়ই।

ভদ্রলোক শেষ চেষ্টা করলেন, ভাগ্যিস আপনি বুদ্ধি করে সিচুয়েশন সেভ করলেন। নইলে আমার জীবন শেষ হতো কতগুলো নির্বোধের হাতে। ধন্যবাদ।

–চুপ করুন, ধমকে উঠল ওমর।

চুপসে গেলেন ভদ্রলোক। ওমরের মায়া হতে লাগল। অন্য দিকে আলোচনা ডায়ভার্ট করতে চেষ্টা করল, রোহানা, জানালা বন্ধ করে দিই। তোমার ঠান্ডা লাগছে।

–গরমে ঠান্ডা বাতাস দরকার। আমার মাথা ধরেছে।

আবার কামরায় ঝিমুনো নিঃশব্দতা। সবাই ঢুলছে। বাল্বের তার এদিক ওদিকে দোল খাচ্ছে গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে। বাতাসের ঝাপটায় রোহানার চুল উড়ছে। বা হাত দিয়ে সে মাঝে মাঝে চুল সরিয়ে দিচ্ছে চোখের উপর থেকে। মাথায় লম্বা ঘোমটা। ওর দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় ওমরের বুক ভরে ওঠে। মেয়েটা তার জন্য কি পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট বরণ করছে। ভালবাসা মানুষকে সুন্দর এবং উদার করে। কি চমৎকার দেখাচ্ছে রোহানার ক্লান্ত মিষ্টি মুখ।

–তুমি খুব ঢুলছ, ওমর রোহানার কানে কানে বলল।

–এই মুহূর্তে আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান ওমর?

–কি?

–তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে।

–আমার কাঁধে অন্তত মাথাটা রাখতে পার।

–এতগুলো লোকের মধ্যে?

–তুমি তো আমার বৌ?

–সাজানো বৌ, গভীর বিষণ্নতা রোহানার কণ্ঠে।

–সাজানো কেন হবে? জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার

–শুধু মুখে মুখে।

–না, অন্তরে অন্তরে।

আবার নীরবতা। নৈঃশব্দ আরো গভীর, অন্তর্গত, বিষণ্ন। বাইরে জমাট অন্ধকার।

www.pathagar.com

প্রস্তরীভূত অন্তরের মত নিশ্ছিদ্র, নিরেট, বোবা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক নেই। জোনাকীর আলো নেই। দু'পাশের গাছপালা, জঙ্গল ঝোপঝাঁড় দাঁড়িয়ে আছে কালো দৈত্যের মত।

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দ। বিকট বিস্ফোরণ। ভূমিকম্পের মত প্রবল ঝাঁকুনি। নিরেট অন্ধকারে নিমজ্জিত সব। অন্ধকারে গভীর যন্ত্রণা আর আর্ত চিৎকার। গাড়ির হেড লাইট নিভে গেছে। কামরায় আলো নেই। কিছু দেখা যাচ্ছে না। বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। ধুয়া নাকের ভেতর দিয়ে অন্ত্রে ঢুকছে। মাথায় ঝিম ঝিম ভাব। শরীর অবশ। অনুভূতি প্রায় লুপ্ত। চেতনা ডুবে যাচ্ছে গভীর থেকে গভীরে। সমুদ্রের তলদেশ হাতড়াচ্ছে ওমর। বিবশ মাথাটাকে বারবার ঝাঁকি দিচ্ছে। সে বেঁচে আছে তো? গায়ের সঙ্গে কে যেন লেপ্‌টে আছে। ওমর হাতড়াচ্ছে, রোহানাকে খুঁজছে। রোহানা, ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরের ডাক ওমরের।

–এই তো আমি।

–কি হয়েছে।

–জানি না। মনে হয় এ্যাকসিডেন্ট।

–এত ধোঁয়া কেন?

–মাইন অথবা বোমা ফেটেছে।

–আমরা কি বেঁচে আছি?

–কথা বলছি তো।

–কামরার অন্যান্য লোক?

–কেউ কেউ মারা গেছে নিশ্চয়। কামরাটা আমাদের বিপরীত পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। আমরা উঁচুতে উঠেছি।

–তুমি কিছু দেখেছ?

–অনুমান করছি। জেগেই তো ছিলাম।

–সব কিছু এত ভারি লাগছে কেন? বাল্ব কি মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়েছে?

–এখনো পড়েনি, তবে পড়তে পারে। কামরাটা কাঁপছে। আমার হাত ধর ওমর।

–বেরুবো কি করে?

–যে জানালাটা আমার মাথার কাছে ছিল ওটা খোলাই আছে। একটু উঁচু হও। তাহলে ঠাঁই পাবে।

–মনে হয় আমার হাঁটুতে জোর নেই।

–আছে। প্রবল ঝাঁকুনিতে অবশ হয়ে গেছে। ঝাড়া দাও। সাহস সঞ্চয় কর। ওপাশে কাদা ভর্তি ডোবা। কামরাটা আস্তে আস্তে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ওদিকে।

–ওমর, জলদি কর।

ওমর কয়েকবার চেষ্টার পর উঠে দাঁড়াল।

–সীটটা মনে হয় কাত হয়ে আছে।

www.pathagar.com

–ওর কিনারে ওঠ।

কয়েকবার চেষ্টা করার পর ওমর সীটের কিনারে দাঁড়াতে পারল।

–এবার জানালা ধরতে চেষ্টা কর। তুমি পুরুষ মানুষ। শক্তি খাটাও। একটা শিক বাঁকা করতে পারলেই মাথা গলিয়ে বের হওয়া যাবে। ....আরেকটু ফাঁক.....

–আমি কি সাহায্য করতে পারি?

–কে আপনি?

–পাজামা পাঞ্জাবী।

এত দুঃখেও ক্লিষ্ট হাসল ওমর। বলল, আসুন। চেঁচাবেন না। টের পেলে সব বেঁচে যাওয়া লোক ধেয়ে আসবে এ পথে বের হওয়ার জন্য। থেত্‌লে যাব আমরা।

দু'জনে প্রাণপণে কাজটা করতে চেষ্টা করল। সফলও হলো। ওমর ফিসফিস করে বলল, রোহানা, হাত ধর। শক্ত করে ধর।

–ব্যালান্স রেখো ওমর। নয়তো দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ে যাব। এক হাতে জানালা চেপে ধর। অন্য হাতে আমাকে ওঠাও।

তাই করল ওমর। ভদ্রলোক বললেন, আপনারা আগে নামুন। আমি পরে আসব। তবে সাহায্যের দরকার হবে। দোহাই আপনাদের, ফেলে যাবেন না।

–কি সব বলছেন। চুপ করুন।

–তুমি আমার পরে আসছো তো, রোহানার উদ্বেগকাতর কণ্ঠ।

–আসছি।

–হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়ো না আমাকে। যদি মাটি ঠাঁই না পাই, হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

ওমর শক্ত হাতে ধরে রইল রোহানাকে। রোহানা বাঁচুক। নিজের হাত ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে। রোহানাকে মাথার উপর উঠিয়ে কতবার ঘুরিয়েছে ওমর। এত ভারি মনে হয়নি। আজ মনে হচ্ছে হাতের পেশী রগ সব ছিঁড়ে একাকার। আঁসফাঁস করছে রোহানা, ফাঁক এত ছোট কেন?

–বাড়তি কাপড় খুলে ফ্যালো রোহানা।

রোহানা শাড়ি খুলে দলা পাকিয়ে নিচে ফেলে দিল। তারপর মাথা গলাল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, বেরুতে পেরেছি। পায়ের নিচে ঘাসের মাথা পাচ্ছি। মাটি খুব নিচুতে নয়।

–তুমি ছাড়।

–সত্যি বলছ? আল্লাহর কসম?

দুঃখেও হাসি পেল রোহানার। এত বিপদেও তার নিরাপত্তা সম্পর্কে ওমর কত সজাগ।

–আল্লাহর কসম। আমার ভালবাসার কসম। হাত ছেড়ে দাও ওমর।

www.pathagar.com

–ওমর ছাড়ল। ঝুপ করে রোহানা মাটিতে পড়ল। শব্দ পেল ওমর।

–রোহানা ভাল আছ?

–আছি। আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি লাফিয়ে পড়। মাটি খুব নিচে নয়।

–ভদ্রলোককে আগে নামাচ্ছি।

–কোন ভদ্রলোক?

–মুসলিম লীগ ভদ্রলোক।

–ওমর তোমার পায়ে পড়ি, নামো।

–ওঁর পরেই নামছি। কসম খোদার। তুমি সরে দাঁড়াও।

মুসলিম লীগ ভদ্রলোক আপত্তি জানাল, তা হয় না, আপনি আগে নামুন।

প্রচন্ড ধমক দিল ওমর, নামুন বলছি। সময় নষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা গলিয়ে লাফ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তার নিজের কাঁধে অনেকগুলো হাতের চাপ অনুভব করল। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে নিজের গায়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হাতগুলো খামচে সরিয়ে দিয়েই জানালা ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল ওমর।

–রোহানা তুমি কোথায়?

–তুমি তোমার হাতের বাঁ দিকে হাত দশেক সরে এসো। আমি এখানে দাঁড়িয়ে।

ওমর স্টেপ গুনে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সরে এল। এক সময় রোহানার অস্তিত্ব টের পেল। রোহানা বিপুল কান্নায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওমরের বুকে। কোনমতে টাল সামলাল ওমর। একজন আরেকজনকে বুকে চেপে ধরে সেই কেয়ামতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল কালো মূর্তির মত। নিজেদের বাঁচার আনন্দ উপভোগ করার উপায় নেই। চারদিক থেকে আহত লোকদের মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর গোঙানি ভেসে আসছে। বাতাস চিরে চিরে চিৎকার, আর্তনাদ, ক্লিষ্ট প্রার্থনা, বাঁচাও বাঁচাও ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে আছড়ে পড়ছে শূন্যতায়। রোহানা অনুমান করছে, আহত নিহতদের রক্তে এই ভেজা মাটি পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। ঘাসের ডগা লাল রং মেখে মাথা নুইয়ে দিয়েছে নিচের দিকে। অন্ধকারে রক্ত, ধোঁয়া, বারুদ, মানুষের চিৎকার সব মিলে একাকার।

হঠাৎ গুলীর কানফাটা শব্দ। অন্ধকারে হুড়োহুড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। শুয়ে পড়ল রোহানা এবং ওমর। মুসলিম লীগ ভদ্রলোকের এতক্ষণ পরে সাড়া পাওয়া গেল, শুয়ে পড়েছেন?

–হ্যাঁ।

–মাথা ওঠাবেন না। গোলাগুলী সহজে থামবে না।

–কেন বলুন তো!

–বুঝতে পারছেন না, মুক্তিরা ট্রেনটা উড়িয়ে দিয়েছে মাইনের সাহায্যে। এই ট্রেনে দুই রেজিমেন্ট পাক সেনা ছিল।

www.pathagar.com

–গুলী করছে কে?

–দু'চারজন পাক সেনা বেঁচে গিয়ে থাকবে। তারাই।

–কাদের গুলী করছে?

–মুক্তিদের। ওরা ধারে কাছেই আছে। হয়তো সামনের জঙ্গলেই।

–কেমন করে বুঝলেন?

–আরে সাহেব, এইটুকু বুঝতে বেশি বুদ্ধি লাগে নাকি? মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রিত ডেটোনেটরযুক্ত মাইন বসিয়েছিল। দূর থেকে বোতাম টিপে দিয়েছে মাত্র। ধারে কাছেই আছে ওরা।

–তাহলে রাতভর গোলাগুলী চলতেই থাকবে?

–আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এই ঝোপ-জঙ্গলে ওদের খুঁজে পাবেন নাকি? মাঝখান থেকে যে দু'চারজন ট্রেন যাত্রী বেঁচে গেছে তারা এলোপাতাড়ি গুলী খাবে।

–তাহলে উপায়?

–যেখানে আছেন ওখানেই চুপ করে শুয়ে থাকুন। বেশি বক বক করলে ওরা এদিকেই ছুটে এসে আমাদের মুক্তি ভেবে গুলী করবে। বেটাদের ঘিলুতে বুদ্ধি কম।

কথার ধরণে মৃদু হাসল রোহানা। ওমর ওকে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে শুয়ে রইল। কিন্তু কেরামত মন্ডল নামক ভদ্রলোকটি নিজেই চুপ থাকার পাত্র নন। একটু সময় চুপ থাকার পর আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কেমন বুঝছেন?

–গোলাগুলী থেমে গেছে। কিন্তু আহতদের আর্তনাদ আরো তীক্ষ্ণ স্বরে শোনা যাচ্ছে।

–এ সময়ে ওদের জন্য যদি কিছু করা যেত, ওমর আক্ষেপ করে কলল।

–ক্ষেপেছেন? এই অন্ধকারে নিজেরাই কখন দলা পাকিয়ে যাবেন।

–এমন করে বলছেন কেন?

–খোট্টাদের মত আপনার মাথাতেও ঘিলু কম।

চমকে উঠল ওমর। রোহানার মমতাভরা হাতের স্পর্শ পেয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

–ট্রেন এ্যাকসিডেন্ট হলে কি হয় জানেন না? পাক সেনারা খালি হাতে তো আর রওনা হয়নি। সবার হাতেই রাইফেল ছিল। তাছাড়া বড় বড় যে বাক্সগুলো ওরা কামরায় উঠিয়েছে, তাতে স্টেনগান, গ্রেনেড, গোলা-বারুদ অনেক কিছুই আছে। ওগুলো মুক্তিরা এখন হাতিয়ে নেবে। ওদের দরকার। গ্রামবাসীরাও এই লুণ্ঠনে যোগ দেবে।

–এখানে ধারে কাছে কোন গ্রাম নেই।

–দূরে থাকলেও ক্ষতি নেই। এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে।

–গ্রামবাসীরা অস্ত্র দিয়ে কি করবে?

www.pathagar.com

–এখন আর নিরীহ গ্রামবাসী কেউ নেই। সবাই ঘোষিত অঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা। অন্য ধরণের লোকও বাস করে গ্রামে। চোর, ডাকাত, লোচ্চা। তারা এখন আহত এবং নিহত ট্রেন যাত্রীদের মাল সম্পদ লুট করবে। বৌমা আপনার গায়ে কি সোনার গয়না আছে?

–না।

–থাকলে ফেলে দিন। কারণ ওরা শুধু জিনিস ছিনিয়ে নেবে না, আপনার মাথায় আঘাত করে আগে আপনাকে মেরে ফেলবে। তারপর জিনিস খুলে নেবে। ওরা সাক্ষী রাখতে চায় না।

ভদ্রলোকের কথায় রোহানার গায়ের লোম খাড়া, গায়ে সিরসিরানি ভাব। গলায় জোন টেনে বলল, বিশ্বাস করুন, আমার গায়ে একরত্তি সোনা নেই।

–আমার বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসে কি আসে যায়? ব্যাপারটা নিরাপত্তার। বাঙ্গালী ঘরের বৌয়ের গায়ে একরত্তি সোনা নেই, ভাবতেও অবাক লাগে। আপনার স্বামীটি শুধু বেকার নয়, বাউন্ডুলে।

হাসি চাপে রোহানা, বলে, আপনার অনুমান মিথ্যে না।

এবার ভদ্রলোকের কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন, ভালবাসার বিয়ে বুঝি? তা না হলে এ রকম হবার কথা না।

–ঠিক বলেছেন।

–বাবা মার রাগ ভাঙ্গাতে যাচ্ছেন?

–আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

–আপনাদের চেয়ে আমার বয়েস অনেক বেশি। জীবনে এমন কত দেখলাম। তা লাকসামেও সাবধানে থাকবেন। এখানেও বাঙ্গালী বিহারীতে মারামারি। খুন হচ্ছে হরদম। জংশনগুলোতে বিহারীদের বাস বেশি। রেলওয়েতে ওদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য। এই যে হতভাগ্য ট্রেনটা, এর ড্রাইভারও ছিল বিহারী।

–বেঁচে আছে কিনা কে জানে?

–পাগল, ঘিলু ছিটকে এদিক ওদিক বেরিয়ে গেছে।

–আপনি বড্ড অনুমান করে কথা কলেন।

–ভোর হলেই দেখতে পাবেন। ইঞ্জিন ঘর এবং পরের দুটো কামরা ওদের টার্গেট ছিল। পরের গুলো তো প্যাসেঞ্জার বগী।

–এতগুলো নিরীহ লোক মারা গেল।

–তা তো যাবেই। পাক সেনারা স্পেশাল ট্রেনে যেতে পারত। যায়নি কেন জানেন? ভেবেছিল, স্পেশাল ট্রেনের বিপদ বেশি, মুক্তিরা টার্গেট করবে নিঃসন্দেহে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয় কম। নিজের দেশের নিরীহ মানুষকে কে আর মারতে চায়?

–তাহলে মারল কেন?

www.pathagar.com

–মা, যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি অন্য রকম। দু'এক হাজার সাধারণ মানুষ মরে মরুক, কিন্তু দু পাঁচশ সুশিক্ষিত পাক আর্মি মেরে ফেলা অনেক লাভ। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র তো হাতিয়ে নেয়া গেল।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ওমর। রোহানা নীরব। ভাবল ভদ্রলোকের কথাগুলো মিথ্যে না। জীবনের অভিজ্ঞতার দাম অনেক। মনে হয় রাজনীতি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও দেখেছেন নাকের ডগায়।

নিঃশব্দতায় ডুবে আছে রাত। গাঢ় অন্ধকার তাকে আলিঙ্গন করে আছে। চিৎকার এবং আর্তধ্বনি এখন একটানা শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে থেমে থেমে হচ্ছে। আহতদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। চারদিকে ভিজে বাতাস। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ একটু বাতাসের জন্য খাবি খায়। জিহ্বা আড়ষ্ট, ঠোঁট শুষ্ক। ঠোঁট চেটে জিহ্বা ভেজাবে সে শক্তিও থাকে না। গাঢ় অন্ধকারে তারা শুধু মৃত্যুকে চেতনা দিয়ে প্রত্যক্ষ করে, যার দেহ কালো যমদূতের মত, আলকাতরার মত মিশমিশে কালো অন্ধকার। এক মুহূর্ত আগেও এদের জীবন ছিল আলোময়, কোলাহলময়। অথচ এখন অন্ধকারের নৈঃশব্দে চেতনাহীন বিলুপ্তি, লেপ্‌টে যাওয়া এক বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে মানুষ যেমন তল হাতড়ায়, আহত ব্যক্তিরা জীবনকে তেমনি খুঁজে খুঁজে বেড়ায় এক অন্তহীন নৈঃশব্দের মাঝে। কোন তপ্ত হাতের স্পর্শ পায় না। ঘোলাটে চোখের উপর কোন মানুষের মমতাময় চোখের বেদনা ছড়ায় না। শুধু একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় এই মৃত্যুপথযাত্রীরা এখন শুধু ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত বেদনার অসহায়ত্ব নিয়ে।

রোহানা ওমরের বুকে লেগে থেকেও ঘামছে। ওমর টের পাচ্ছে তার সিক্ত মুখ, চোখ এবং ভেজা চুল। সে যে কিছু করতে পারছে না এই মরণোন্মুখ যাত্রীদের জন্য, এই বেদনা তার বেঁচে থাকার আনন্দকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তার অনুভূতিকে গ্লানিতে ভরে দিচ্ছে। জীবন শুধু বেঁচে থাকার জন্য না, নিজের অস্তিত্বকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। নিজের মধ্যে অন্যের আনন্দকে উপলব্ধির জন্য। এক অবিনাশী মহত্ত্ব মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কেউ তা টের পায়, কেউ পায় না।

রাত পা পা করে ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের ঘন আবরণ পাতলা হয়ে আসছে। আলো ফুটি ফুটি করেও ফোটেনি। কিন্তু অন্ধকার ফিঁকে হওয়ার আভাস জানিয়ে দিচ্ছে আল্‌তো হাতের মৃদু স্পর্শ মেখে। সুবেহ সাদেকের সময় পূর্বাকাশ লাল্‌চে সোনালী আলো গগণস্পর্শী স্নিগ্ধতা নিয়ে উঁকি মারে। আলো-আঁধারির এই খেলায় বিশ্ব প্রকৃতি নব উন্মোচনের লীলায় প্রতিভাত হয় সৌন্দর্যের মহান সুষমা। অথচ আজকের সুবেহ সাদেকের উদয় হচ্ছে বিষণ্ন ব্যথার অন্তহীন আক্ষেপে। এখনো আহতদের স্তিমিত আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর আসন্ন বিরহ নিয়ে।

দিগন্ত প্রসারিত মাঠে কোথাও বাড়িঘর নেই। মসজিদ নেই। আজানের শব্দ ভেসে

www.pathagar.com

আসছে না। শুধু ডোবার ভেজা বাতাস নাকে মুখে ঝাপটা মেরে দূরে সরে যাচ্ছে লুকোচুরি খেলার মত। এখনো কোন উদ্ধারকারী দল আসেনি। কিন্তু দূরে পাতলা কুয়াশার আবরণের পর্দা ভেদ করে ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। বাতাসে শিস দেয়ার শব্দ।

কেরামত মন্ডল বেনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ক্লান্তমুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই। প্রায় সারা রাত ধরে তিনি কথা বলছিলেন। তাঁর কথাগুলো ছিল ভবিষ্যতদর্শী সুদূরপ্রসারী বিশ্লেষণ। তাঁর আক্ষেপজনিত বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল রক্তে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বাতাসের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে, এরা কি করছে এরা জানে না। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হোক, রক্তপাত হোক, ক্ষতি নেই। আবার একদিন মিতালি হবে। আলিঙ্গন করবে একে অন্যকে। কিন্তু ঘরের কথা পরকে জানিয়ে কি লাভ? সালিশী করতে ডেকে এনে সিন্দাবাদের দৈত্যের মত নিজেদের ঘাড়ে অন্যের গুরুভার চাপিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনার কি প্রয়োজন ছিল বৌমা? এ দৈত্য আর তো ঘাড় থেকে নামবে না। মজবুত ঘাড়ের নিরাপদ এবং আরামদায়ক আশ্রয় ছেড়ে কে বা নামতে চায়? মাগো, তোমার ছেলেমেয়ে অথবা ভাইবেরাদর ভুল করলে তুমি কি নিজে তাদের শাসন করবে, নাকি পাড়া-পড়শী ডেকে এনে সালিশী বসিয়ে নিজেদের পরিবার-পরিজনকে বেইজ্জতি করবে? তাতে তো তোমার নিজের দূর্বলতার দিকটিই উন্মোচিত হবে। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ কি বেশি মা জননী? কেন আমরা এই ভুল করছি? এর কাফ্ফারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে দিতে হবে। তারা একদিন ফতুর হয়ে যাবে।

রোহানা কোন উত্তর দেয়নি। তার খুব তেষ্টা পেয়েছিল। বারবার ঢোক গিলেছে গলাটা ভিজিয়ে নেয়ার জন্য।

কেরামত মণ্ডলের কণ্ঠস্বর আবার খাবি খেতে খেতে রেল লাইনের লোহার পাতে ঘষা খেতে লাগল প্রবল আবেগের উৎক্ষেপে, মা, এই রাতকে সাক্ষী রেখে আপনাদের বলছি, যুদ্ধে এই তৃতীয় পক্ষের সশ্লিষ্টতা শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এক্সপ্রপ্রয়টেশন ডেকে আনবে না, ডেকে আনবে সাংস্কৃতিক এক্সপ্রপ্রয়টেশনও। মা হাড়ের মজ্জা কখনো খেয়াল করে দেখেছেন কি? এই জিনিস হাড়ের শক্তি যোগায়, রস সিঞ্চন করে। সবল বলিষ্ঠ রাখে। দেহের অভ্যন্তরে জালের যে অসংখ্য শিরা উপশিরা বিছিয়ে আছে তা দেহের রক্ত সঞ্চালনে শুধু যে সাহায্য করে তা নয়, তা দেহের উত্তাপ সক্রিয়তা এবং সজীবতাকে জিইয়ে রাখে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ দেশের মানুষের যে নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় বোধের সমন্বয় ঘটেছে তার ধারা বয়ে চলেছে জাতির জীবনে ফল্গুধারার মত। এর সঞ্জীবনী সুধার অপরিমেয় রসে জারিত হচ্ছে অভূতপূর্ব আবেগ, স্বচ্ছ অনুভূতি, এবং হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসার তাড়িত প্লাবন। ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমাদের নিজস্ব আদর্শ এবং ভাবধারায়। দেশপ্রেম গড়ে উঠেছে

www.pathagar.com

আমাদের সত্তার প্রকৃত রূপায়নের মাঝে। অন্য দেশের ধার করা বিজাতীয় মডেলে তার শুধু বিনাশ হবে, কোন গতি সঞ্চার করবে না। এই স্বেচ্ছামৃত্যুকে কেন আমরা ডেকে আনলাম, বলবেন কি? ঘোমটার আড়ালে আপনার মুখ যতটা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় আপনি বুদ্ধিতে প্রোজ্জ্বল। আপনি আমার কথার উত্তর দিতে পারবেন মা?

রোহানা ভদ্রলোককে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অন্ধকারের ঘাসবনে মাথার নিচে হাত রেখে শায়িত একটি লোককে অনুমান করতে পারছে। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে, যদিও সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের প্রসারিত চাদর ছাড়া আর কিছু নেই।

রোহানার এই মুহূর্তে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে অনুভব করছে এই কথাগুলো ভদ্রলোকের হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতির ঢেউ ভাঙ্গা আবেগ। যুক্তিতর্ক, বিশ্লেষণ, সত্যনিষ্ঠা এবং দূরদর্শিতা সবই আছে। কিন্তু যুদ্ধের উত্তেজনা শুধু মাত্র একটা লক্ষ্য স্থির করে, জয় পরাজয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থির লক্ষ্য ছিল নাৎসীদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের লিপ্সা প্রতিরোধ করা, পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ। তেমনি এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের উদ্রেক হয়েছে শোষণের নামে। এখানে যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ সব ভেসে গেছে দেশ প্রেমের উচ্চকিত তরঙ্গের শক্তির ঠেলায়। এখানে অন্য কথা বলা নিরর্থক। আজ হোক, কাল হোক ইতিহাস কথা বলবে। সব কিছু বিশ্লেষণ করবে চুলচেরা হিসাবের নিক্তি দিয়ে। ততদিনে অনেক রক্ত ঝরবে। অনেক সম্পদ ক্ষয় হবে। মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে যুদ্ধজনিত আবেগের উচ্ছ্বাসে। অনেকের অশ্রুজলে সিক্ত হবে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ভালবাসা। ইতিহাস সেদিন লাভ-লোকসানের হিসাবের খাতা খুলে দেখবে আমাদের অতীত পুরুষদের কর্মকান্ড।

ভোরের আলোর মুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হচ্ছে। তার মুখের কালিমা মুছে গিয়ে সেখানে জন্ম নিচ্ছে আদরের আভাস। হঠাৎ আর্তনাদ ভেসে এল রোহানার কণ্ঠ ফুঁড়ে। ওমর এবং কেরামত মন্ডল এক সঙ্গে ছুটে এল। বলতে গেলে ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল। ভোরের আলো উঁকি মারতেই ওমর রোহানার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারের বিপদে যে ঘনিষ্ঠতা শোভা পায়, দিনের পরিষ্কার আলোয় তার অপরিহার্যতা যায় ম্লান হয়ে।

রোহানার মুখে কথা নেই। শুধু আঙ্গুল তুলে তার পাশের একটা বস্তুকে দেখাল। অবাক বিস্ময়ে দু'জনে দেখল একটি মেয়ে রক্তাক্ত দেহে জবুথবু হয়ে মরে আছে রোহানার পাশে। মেয়েটির সুডোল হাতের রং ফর্সা ধবধবে। মেহেদি মাখানো হাতের তালু এবং আঙ্গুলের নখ। মাথা থেত্‌লে গেছে। দীর্ঘ ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসের উপর।

দু'চার গোছা চুল আটকে আছে শক্ত বেনো ঘাসের মাথায়। মুখটা চেনা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

কিন্তু সোনার ফুল পরা টিকালো নাক জেগে আছে রক্তাক্ত মুখের উপর। কাতান শাড়ি পরনে। রক্ত এবং কাদায় মাখামাখি।

ওমর আবছাভাবে মনে করতে পারল, এক নব দম্পতিকে সে দেখেছিল দরজা ঘেসে সীটের কাছে। মেয়েটি বড় সুন্দর, লাজ রাঙা মুখ। ছেলেটি কালো, সাধারণ চেহারার। কিন্তু ভালবাসা এবং ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নে দু'জনেই বিভোর। মনে হয়, মেয়েটি ছিট্‌কে দরজার বাইরে এসে পড়েছে, ভিড়ের চাপে দরজা হয়তো আধখোলা অবস্থায় ছিল। ছেলেটির পাত্তা নেই। মেয়েটিও বাঁচতে পারল না।

রোহানার বুঁজে আসা কণ্ঠস্বর, ওমর দ্যাখো, সারারাত আমরা ওর পাশেই শুয়ে ছিলাম। কত কাছে, অথচ টের পাইনি।

কেরামত মণ্ডল বললেন, ঘাবড়াবেন না মা। দিনের আলো ফুটলে আশেপাশে আরো কত মৃত দেহ দেখতে পাবেন। বীভৎসভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

–আমি ভাবছি চাচা, ওর বিয়ের ফুলশয্যার রাতটাও কাটল না।

–তাকে কি মা? কতজনের বিয়ের স্বপ্নই যে ভেঙ্গে যায়।

ধক করে উঠল রোহানার বুক। ওমরের হাত চেপে ধরল।

কেরামত মন্ডল বললেন, ওমর সাহেব, ভোরের আলো স্বচ্ছ হয়ে ফোঁটার আগে মাকে নিয়ে আপনি দূরে সরে যান।

–এই ঘন ঘাসের রাজত্ব পার হয়ে কোথায় যাব? কাছে তো লোকালয় নেই।

–তা সত্যি। কিন্তু মা কি এই দৃশ্য সইতে পারবেন?

–আপনি ভাববেন না, ও খুব শক্ত জাতের মেয়ে। তবে এ রকম অবস্থায় আর কখনো পড়েনি।

–মনটা নরম।

–যতটা ভাবছেন ততটা না। উদ্ধার ট্রেন এল বলে।

–আপনি কি ভাবছেন, ওদের সৈন্যদের মৃতদেহ আগে না সরিয়ে আমাদের উদ্ধারের কাজে লেগে যাবে?

ওমর চুপ। একটু পরে বলল, একটা ট্রেনে বগী অনেক থাকে। মৃতদেহ ক্যারি করতে কয়টা বগী আর লাগবে?

–ব্যাপারটা অত সহজ না ওমর সাহেব। ওরা মোটেও চাইবে না, পাবলিক ওদের ক্ষয়ক্ষতি জেনে ফেলুক।

–তাহলে উপায়?

–ভাববেন না। ট্রেন আরো আসবে। ওরা আমাদের উদ্ধারও করবে। তবে দেরি হবে, চাই কি সারাদিন লেগে যেতে পারে।

চিন্তিত দেখাল ওমরকে। কেরামত মন্ডল ভ্রু কুচকে বললেন, এমন জায়গায় ইচ্ছে করেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটানো হয়েছে যেখানে পাক সেনাদের জন্য তাড়াতাড়ি কোন

www.pathagar.com

সাহায্য না আসতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, জায়গাটা সন্দেহের আওতায় না পড়ে।

–আপনি এত কিছু বোঝেন কি করে?

কেরামত মন্ডল হাসলেন, কথা বললেন না। ভদ্রলোকের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে তা ভাবেনি ওমর। প্রথম উদ্ধারকারী ট্রেন এসে আহত এবং নিহত সৈনিকদের নিয়ে চলে গেল। অনেকগুলো বগী খালিই গেল। দ্বিতীয় ট্রেনটা এল ঘন্টা দুই পরে। দূরদূরান্তে মানুষ তখন রেডিয়ো এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে এ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে গেছে। অনেক রিলিফ কর্মী চলে এসেছে এখানে। তারা আহতদের উঠিয়ে দিতে লাগল কামরায়।

ওমর তাড়া দিল, রোহানা ওঠ। পরে কিন্তু জায়গা মিলবে না।

রোহানা অনড়। তার কন্ঠস্বর দৃঢ়, এই মেয়েটার আগে একটা ব্যবস্থা কর।

–ও তো মরে গেছে।

–ও এই ঘন ঘাস বনে পড়ে থাকলে ওকে কেউ দেখবে না। মেয়েটাকে শেয়াল কুকুরে খাবে।

কেরামত মন্ডল বললেন, মা এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়ল বলে। যারা গণকবর খুঁড়বে তারা লাশ খুঁজে নেবে।

নড়ল না রোহানা, না চাচা, ওরা এই গভীর ঘাস বনে মেয়েটিকে খুঁজে পাবে না। মেয়েটা যে এতদূর কি করে এল?

–যন্ত্রণায় গড়িয়ে গড়িয়ে এসেছে। নানারকম শব্দের মধ্যে ওর যন্ত্রণা কাতর শব্দ শোনা যায়নি।

–যারা ভলান্টিয়ারের কাজ করছে, তাদের একটা খবর দেয়া যায় না?

–যায়, ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে যাবে মা।

–আমি বলি কি, আপনি চলে যান চাচা। আমরা পরে আসছি।

–পরে যদি ট্রেন না আসে? এই বিজন বনে কি করবেন?

–এখন আর বিজন বন নেই। দেখছেন তো, কত লোকের ভিড়। সাহায্য চাইলে ওরা করবেই।

–মা, আপনাদের ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতাম না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার একটা জরুরী মিটিং আছে।

–যুদ্ধের সময় মিটিং?

–হ্যাঁ। বাঙ্গালী বিহারীতে খুনোখুনি হচ্ছে খুব। দু'দলেই আমার বন্ধুর সংখ্যা প্রচুর। তাদের ডেকেছি, যদি একটা মিটমাট করে দেয়া যায়। শহরে শান্তি বজায় রাখা যায়।

–পারবেন বলে মনে হয়?

–কেন পারব না? এতকাল পাশাপাশি বাস করেছি। এক বাড়ির বিয়ের দাওয়াতে

www.pathagar.com

এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য বাড়ির লোক যোগ দিয়েছি। ঈদের দিনে কোলাকুলি করেছি। তখন তো বাঙ্গালী-বিহারী বলে কোন কথা ছিল না।

–ওটা ছিল আঞ্চলিক প্রীতি এবং সখ্যতা। আজ এরা যে যার মত পক্ষ বেছে নিয়েছে।

–বুঝেছি মা। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? সমস্ত দেশের কথা এই মুহূর্তে আমি বলতে যাচ্ছি না, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু আমার শহরে সম্প্রীতি বজায় রাখতে চাই। দেখতে চাই, মানুষের কাছে মানুষ বড় না দল বড়।

কোন কোন সময়ে মানুষের চেয়ে দল, মত বড় হয়ে যায়। তখন মা-বাপ, ভাই-বোনও আপন থাকে না।

–আপনার কথা না বুঝি এমন নয়। যুদ্ধ অনেক কিছু ছিনিয়ে নেয়, আবার দেয়ও। মরেল হাই হয়। অহেতুক মারামারি খুনোখুনির মধ্যে কোন আদর্শ নেই মা। নীরিহ মানুষ মারার মধ্যে কি বাহাদুরি আছে মা?

–চেষ্টা করে দেখুন, বলল রোহানা।

–হ্যাঁ মা, তাই দেখব। একটা লোকও যদি আমার কথা বোঝে, ভাবব আমার ভাগ্য।

কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে যান কেরামত মন্ডল। তিনি এখনো সম্প্রীতির স্বপ্ন দেখেন। ভালবাসার স্বপ্ন দেখেন। সেই সুনীল স্বপ্নের মেদুরতায় নেমে আসে জীবনের মহত্তর বেদনা, নবজাত শিশুর ক্রন্দনের মত।

–চাচা, ট্রেন হুইসেল দিয়েছে। অনেকটা পথ দৌড়াতে হবে আপনাকে।

–একটা নাম এবং ঠিকানার কার্ড ওমরের হাতে গুঁজে দিয়ে কেরামত মন্ডল দৌড়াতে লাগলেন নড়ে ওঠা ট্রেনের দিকে। রোহানা চৌধুরী কেরামত মণ্ডলের গমন পথের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল। মানুষটি এত ভাল যে চিন্তা করা যায় না। এই সঙ্গে স্বপ্নদর্শী, এখনো ভাবেন, যুদ্ধটা বড় কথা না, মানুষে মানুষে ভালবাসাই বড় কথা। শেষ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার বাপের বাড়িটা কোথায় বৌমা? আপনি বললে আমি ঠিক চিনে নিতে পারব। আমার জন্ম এবং কর্ম এই লাকসামেই। আপনারা একবেলা আমার এই গরীবের বাড়িতে ডাল-ভাত খাবেন।

এই সহজ, সরল, উদার দৃষ্টিভংগীর মধ্যবয়েসী মানুষটিকে আর ঠকাতে ভাল লাগেনি রোহানার। স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল, লাকসাম আমাদের গন্তব্য স্থান না। আমরা যাব বেলোনিয়ায়।

আঁৎকে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, বলেন কি? ওটা তো যুদ্ধ ফ্রন্ট। একেবারে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ।

ওমরকে দেখিয়ে রোহানার উত্তর, ওর মামা যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তাঁকে দেখতে যাব।

www.pathagar.com

–নামটা বলুন তো।

–ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খান।

কেমন একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল কেরামত মন্ডলের মুখে, উনি তো পশ্চিম পাকিস্তানী।

–ওমরও পশ্চিম পাকিস্তানী। ওর বাড়ি লাহোরে। পূর্ব পুরুষ সূত্রে ও বিহারী।

হঠাৎ নিজের গাম্ভীর্যকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন কেরামত মন্ডল। এত জোরে হাসতে লাগলেন যে মৃত মেয়েটির সামান্য জীবন স্পন্দন থাকলে সেও নড়ে উঠত।

–বাঃ চমৎকার, একদিকে ভাঙ্গছে, অন্যদিকে গড়ছে। এই দেখুন পাকিস্তান ভাঙ্গল বলে, অন্যদিকে আপনাদের সন্তান সন্ততি দু'দেশের মিলন সেতু তৈরি করবে।

রোহানার ঠোঁটে হাসি, চাচা আপনি এমন করে বলেন।

–মারে, মানুষে মানুষে হিংসা-বিবাদ বড় জোর তিনদিনের, ভালবাসাটা চিরকালের।

উদাস কণ্ঠে রোহানা উত্তর দিয়েছিল, চাচা, ভালবাসার প্রধান শত্রু 'সন্দেহ'। তৃতীয় পক্ষ যতদিন এই সন্দেহ উস্কে দেবে ততদিন মিলনসেতু তৈরি হবে না।

ট্রেনের দিকে দৌড়তে দৌড়তে কেরামত মন্ডল বলেছিলেন, মা, জেনেশুনেই আমরা এই সন্দেহ সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিই, এটেই আমাদের দুঃখ।

কেরামত মন্ডল দৃষ্টির আড়াল হতেই ওমর তাকাল রোহানার দিকে, বলল, একটা সত্য গোপন করলে কেন?

–কি?

–আমরা স্বামী-স্ত্রী নই।

–কে বলল নই। জন্ম-জন্মান্তরে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

–রোহানা, এই মেয়েটির পরিবর্তে আমি যদি ওখানে লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম কি হতো তোমার?

–মেয়েটি তো আমিও হতে পারতাম।

–তাইতো দু'জনের পথই খোলা রেখেছি।

–এ রকম বলো না।

–রোহানা, আজ এত মৃত্যু এক সঙ্গে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জান, মৃত্যু কত সহজ! দু'পক্ষের যুদ্ধরত মানুষ সাধারণ মানুষের কোন দাম দিচ্ছে না। আমরা তাদের ইচ্ছার কাছে বলি হয়ে যাচ্ছি।

–তা তো হচ্ছিই। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা মরে যায় না।

–তোমার কথা বুঝলাম না।

–অমর ভালবাসা বলে পৃথিবীতে একটা কথা আছে। মানুষ হৃদয়ে ভালবাসা ধারণ

www.pathagar.com

করেই মারা যায়। তাই মানুষ থাকে না, কিন্তু পৃথিবীতে ভালবাসা থেকে যায়।

–ওটা এ্যবস্ট্রাক্ট আইডিয়া রোহানা।

–আসলে ভালবাসার অনেকটাই এ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া। অনুভূতির তীব্রতম বেদনাময় অনুরাগ। ভোগটা স্থুল। পৃথিবীর সব জীবজন্তুরই ভোগের বাসনা আছে। ভোগও করে তারা। কিন্তু মানুষ এই এ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার অনুরাগের সমন্বয় নিয়ে ভোগ করে বলে তা এত সুন্দর।

–মরলে এই ভোগ থাকে না।

–অনুরাগের অনুরণন পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকে।

ওমর মৃদু হাসল, তা যদি তাজমহল হয়ে বেঁচে থাকে।

–ওটা তোমার ভুল ধারণা। সব ভালবাসার তাজমহল নেই। তবু তা বেঁচে থাকে।

–সে তো গল্প উপন্যাসে। তুমি যতই বল না কেন রোহানা, অনুভূতি সত্য হলেও স্থূলতা ধারণ করেই ভালবাসার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

–আমি বিশ্বাস করি না ওমর। সমস্ত বিশ্বের গোচর এবং অগোচরে রহস্যময় ভালবাসা প্রকাশিত। পৃথিবী ধ্বংস না হলে এর মরণ নেই।

ওমর তর্ক করল না, চুপ করে রইল। রোহানাকে সে চেনে। সে যা বিশ্বাস করে তাই বলে।

বিকালের দিকে লোকাল ট্রেন এল। সেই ট্রেনে উঠে বসল দু'জনে। এর মাঝখানের দশ ঘন্টা ছিল যন্ত্রণায় ভরা সময়। প্রতীক্ষার যন্ত্রণা নয়, অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুদৃশ্য তিল তিল করে দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। তার পাশের থেতলানো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রোহানা বলল, ওমর, দ্যাখো মেয়েটার আঙ্গুলগুলো চম্পাকলির মত সুন্দর, লম্বা। ওর বর নিশ্চয়ই এই আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করত। আচ্ছা, মেয়েটার কি ফুলশয্যা হয়েছিল? নাকি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে?

বিষণ্ন মমতা নিয়ে ওমর কড়া গলায় ধমক দিল, চুপ কর। এমন আবেগপ্রবণ হওয়া তোমাকে মানায় না।

অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠ রোহানার, ওমর, মানুষ যখন বুক ভরা আশা এবং আকাংখার অতৃপ্তি নিয়ে হঠাৎ করে মরে যায়, তখন তার মুখ দেখে কি মনে হয় না, ওখানে একটা প্রশ্ন জেগে আছে, আমার কি অপরাধ, আমি এভাবে মরতে চাইনি?

ওমর নিশ্চুপ। সে জানে, রোহানার এই সব প্রশ্ন তার নিজের মনের নিশ্চিত ও অনিশ্চিত সংশয়ের দোলা লাগা কষ্টের প্রকাশ। এতকাল বাইরের শক্ত ভাবটা বজায় রেখেছিল, আজ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। ওমর রোহনার হাত ধরল শক্ত করে, উঠে এসো। সামনের দিকে চল। ওখানে অনেক লোক কাজ করছে। ওদের সঙ্গে হাত লাগাও। শস্তা ভাব-বিলাসিতার এখন সময় না।

একরাশ লজ্জা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে রোহানার মুখ লাল করে তুলল। বলল, চল।

www.pathagar.com

কিন্তু মেয়েটার কি হবে? ওর স্বামীর খোঁজ করলে হতো না?

–সে কি বেঁচে আছে? দু'জনে একই জায়গায় পাশাপাশি বসেছিল। বেঁচে থাকলে বৌয়ের খোঁজ করত। ভলন্টিয়ারদের ওর অবস্থানটা জানিয়ে দিই। অন্তত গণ-কবরে ওর স্থান হোক।

প্রথম রিলিফ ট্রেনে ফাস্ট এইডের সরঞ্জাম এসেছিল। ভলান্টিয়াররা আহতদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। এদের অনেকেই আনাড়ি। ওদের হাত থেকে গজ তুলো তুলে নিয়ে নিপুণ হাতে রোহানা ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগল। ওমর অবাক। একজন ভলান্টিয়ার জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ডাক্তার?

–না।

–নার্স?

–না।

–তাহলে....?

–এক সময় সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। নার্সি ট্রেনিংটাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

–আপনি কি দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনে ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি ভাগ্যবতী।

–তা সত্যি। এতগুলো মানুষের মৃত্যু দেখলাম।

–যুদ্ধে এমন হবেই।

–নিজের আপনজন কেউ মারা গেলে আপনি কি এমন করে বলতেন?

ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল ওখান থেকে। এক ছোকরা ভলান্টিয়ার এসে বলল, চা খাবেন আপা?

–না।

–ফ্লাস্কে তৈরি করে এনেছি। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কাজ করছেন। তেষ্টা পায়নি?

–পেয়েছে।

–তাহলে খান।

–না।

–রক্ত হাতে খেতে ঘৃণা করছে?

–না ভাই, আপনি বরং ডেটল আনুন। অনেকের ক্ষতস্থানের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। পরিষ্কার না করে ব্যান্ডেজ বাঁধা যাচ্ছে না।

–ডেটল নেই। সামান্য যা এনেছিলাম ফুরিয়ে গেছে।

–পানি আনুন।

www.pathagar.com

–তাও নেই।

–তাহলে উপায়?

একমাত্র আল্লাহ ভরসা।

–ওরা সব আহতদের প্রথম ট্রেনে নিয়ে গেলেই পারতো।

–তা পারতো। কিন্তু যারা বাঁচবে না বলে ওদের ধারণা তাদের ফেলে রেখে গেছে।

–কে বাঁচবে কে বাঁচবে না, ওরা জানে কি করে? হায়াত-মউত সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আমার ধারণা, সময়মত চিকিৎসা পেলে এদের অনেকেই বেঁচে যাবে।

–আচ্ছা আপা, ছেলেমানুষ ভলান্টিয়ার ফিস ফিস করে বলল, একটা কথা আমাকে বলবেন, পাক আর্মি ডাবল ডিলীং করছে কেন? একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মারছে, পাবলিকও মারছে। আবার সেই পাবলিকের জন্য দরদ দেখাচ্ছে। এই দু'মুখো নীতির অর্থ কি?

–পাবলিক যাদের মারছে, সন্দেহ বশে মারছে। ওদের ধারণা, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এইসব পাবলিকের যোগসাজস আছে। আর প্রশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য পাবলিক হাতে রাখছে, যদিও তারা শান্তিতে নেই। কারণ, কোন পক্ষেই কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়েই তারা চাকরি করছে।

–কিন্তু প্রশাসন ওরা টিকিয়ে রাখতে চায় কেন?

–শেষ রক্ষার জন্য।

–সে আবার কি?

–যদি কোন কমপ্রোমাইজ হয়।

–তার কি সময় আছে?

–আলাপ আলোচনার পথ সব সময়েই খোলা থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হবে না।

–কেন হবে না? অনেক রক্তক্ষয় এড়ানো যেত।

–দুটো কারণে হবে না। আমরা জয়ের পথে। নেপথ্যে একটা কারণ আছে।

–নেপথ্য কারণটা কি?

–এই যুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ আছে। তারা নিভন্ত আগুন উস্কে দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

–আমরা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না কেন?

–মুসলমানদের ট্রাজেডি ওখানেই। আমাদের ইতিহাস বোকামি এবং অদূরদর্শিতার ইতিহাস। পলাশীর যুদ্ধ, টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের নিজামের ভূমিকা এ কথাই প্রমাণ করে। নিজেদের দুভার্গ্য নিজেরাই তৈরি করি আমরা। আর তার যাঁতাকলে নিজেরাই পিষে মরি।

–আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন।

www.pathagar.com

–জানিনা, বুঝি।

–বুঝলাম না।

–তোমার চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি। তাই চোখ মেলে যা দেখি তা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করি। এটা শুধু শেখা নয়, জানা নয়, জীবনের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং বঞ্চনার মধ্যে ঘটনা আত্মস্থ করা।

–আপনি এত সুন্দর করে কথা বলেন।

–এটা সুন্দর পুঁথি দিয়ে মালা গাঁথা নয় ভাই, জীবনের এক দুঃখময় বিকাশ।

–আপনি কি করেন, চাকরি?

–না, সাংবাদিকতা। একটা পত্রিকার সম্পাদকও।

–তাইতো এমন করে সব উপলব্ধি করেন।

–জনসাধারণের উপলব্ধি কিন্তু আরো গাঢ়, তিক্ত এবং বিষাদময়।

–কেন আপা?

–কারণ তারা দুঃখ দুর্দশার ভুক্তভোগী।

–সাংবাদিকরা তাহলে আরামে আছেন।

হেসে ফেলল রোহানা ছেলেটির সূক্ষ্ম রসিকতায়।

–তোমার নামটা যেন কি ভাই?

–রায়হান।

–তা রায়হান, তোমর বয়স কম। কিন্তু প্রশ্নগুলো চমৎকার। তবে শুনে রাখ, সাংবদিকরা সুখে বসে নেই। তারা যখন মানুষের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের অনুভূতি অন্যের বেদনার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। রায়হান, কোথায়ও কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হলেই শুধু ব্যথা পাওয়া যায় তা নয়, ভেতরে রক্ত জমাট হলেও ব্যথার তীব্রতা বিষময় হয়ে ওঠে। এই চিনচিনে ব্যথা অস্তিত্বকে গ্রাস করে, অস্বস্তিকর এক অনুভূতির জন্ম দেয়। তাই আমরা কেউ সুখে বসে নেই। যে ব্যথা পায় সেও নয়, যে উপলব্ধি করে, সেও নয়। তাছাড়া যুদ্ধে প্রচুর সাংবাদিক মারা যায়। কারণ তারা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে গিয়ে, প্রত্যক্ষভাবে দেখতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয়। এটা তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রায়হান তুমি কি কর?

–কলেজে পড়তাম।

–এখন পড় না?

–ছেড়ে দিয়েছি।

–মুক্তিযোদ্ধা হয়েছ?

–হ্যাঁ

–যুদ্ধে যাওনি?

–এটাও তো যুদ্ধ, এই ট্রেন ধ্বংস করা।

www.pathagar.com

–তুমি এই অপরারেশনে ছিলে?

–হ্যাঁ।

–আস্তে, রায়হান আস্তে। দেয়ালেরও কান আছে।

–তোমরা সরে পড়নি কেন?

–সময় পাইনি, তাই এখানে ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছি। না এলেই ভাল হতো, এত মৃত্যু দেখতে হতো না।

–মুক্তিযোদ্ধাদের এত ভাবপ্রবন হলে চলে না। তোমার বয়স কত?

–আঠারো বছর।

–তুমি আসলেই ছেলেমানুষ। যে তিনটে বগিতে পাক সেনা ছিল, তা বাকী বগি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করা যেত। কিন্তু সারা ট্রেনটাকেই টার্গেট করে ধ্বংস করে এতগুলো নীরিহ লোককে মেরে ফেলা উচিত হয়নি।

–যুদ্ধের সময়ে কি এত চিন্তা ভাবনা করে কাজ করা যায়?

–যায়। যুদ্ধ অর্থ শুধু ধ্বংস না। প্ল্যান মাফিক এগিয়ে যাওয়া। শত্রুকে চিহ্নিত করা। তারপর মেরে ফেলা।

–না মারলে হয় না?

–হয়, কিন্তু মেরে বিভীষিকার সৃষ্টি করা, ত্রাসের সঞ্চার করা, যাতে শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া প্রবাদই আছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

–অনেক সময় শত্রু বন্দী করেও রাখা যায়।

–তাও করা হয় দুটো কারণে। এক. টরচার করে শত্রুর মুখ থেকে গোপন তথ্য বের করা, দুই. নিজেদের বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করা।

–নিয়মগুলো বড় বর্বর আপা।

–যুদ্ধটাই বর্বরতা রায়হান। মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন হলো যুদ্ধ। ন্যায় অন্যায় এবং বিবেকের কোন বালাই থাকে না। মানুষের ভেতরে যে পশুত্ব থাকে তাই বড় হয়ে জেগে ওঠে। রায়হান, একটা কথা বলব?

–বলুন।

–তুমি চলে যাও। বড় রকমের একটা অপারেশন করেছ। এর পরে এই টেনশন পোয়ানো ঠিক হচ্ছে না। তোমার বিশ্রাম দরকার।

–কেমন করে যাব? আমার সঙ্গীরা পালাতে পেরেছে, আমি পারিনি। পাক সেনারা তন্নতন্ন করে খুঁজছিল আমাদের। আমি দৌড়ে এক ঝোঁপের আড়ালে শুয়ে পড়েছিলাম, তাই রক্ষে। রিলিফ ট্রেনে লোকজন আসতেই এদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লাম।

–ভালই করেছ। দূরে বসে বিশ্রাম কর।

–তার কি উপায় আছে? পাক সেনারা চারদিকে কেমন চোখ রেখেছে দেখছেন না? ওরা সন্দেহ করবে।

www.pathagar.com

–ঠিক বলেছ। তাহলে কথা না বলে চুপচাপ আমার সঙ্গে কাজ কর।

–খুব বিরক্ত করছি আপনাকে তাই না?

–উহু! সময় ভালই কাটল। কাজের দুঃসহ ভারটা অনেক হাল্কা হয়েছে। আমি আমার কথা ভাবছি না, তোমার কথা ভেবে কথাটা বলেছি।

–ধন্যবাদ আপা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। রোহানা টের পাচ্ছে ছেলেটা বড় ক্লান্ত। গত রাতের অপারেশন ওর নার্ভের উপর বড় রকমের চাপ সৃষ্টি করেছে। তারপর পালাতে পারেনি। ধরা পড়ার ভয়ে তটস্থ। ওকে অভয় দেয়া এবং আগলে রাখা রোহানা চৌধুরীর দায়িত্ব। বলল, চায়ের কথা বলছিলে না? দাও, দু'জনে মিলে খাই।

–ঠান্ডা হয়ে গেছে। গতরাতের সন্ধ্যা থেকে এখানে ছিলাম কিনা। কমান্ডার সিগারেট খেতে দেয়নি। পাছে আগুন দেখা যায়। কিন্তু চা খাওয়া বারণ ছিল না।

আবার প্রসঙ্গটা এসে যাচ্ছে। রোহানা বলল, থাক তাহলে, ঠান্ডা চা আমি পছন্দ করি না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিন্তু রায়হান চুপ থাকার পাত্র না। হয়তো ভেতরের উত্তেজনা মুক্তি দেয়ার জন্য এত কথা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ঐ যে উনি সানগ্লাস পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের দুলাভাই?

–না, বন্ধু।

বিস্মিতকণ্ঠ রায়হানের, বাঙ্গালী মেয়েদের বন্ধু থাকে?

–ভাবলেই থাকে। তুমি যে কলেজে পড় সেখানে মেয়ে নেই?

–আছে।

–তাদের সম্পর্কে কি ভাব?

–ক্লাসফ্রেন্ড।

–ফ্রেন্ড মানে তো বন্ধু।

হাসল রায়হান, কথা বলল না।

–একটু ঘুরে আসি আপা?

–ওহ্ শিওর। অনেকক্ষণ তোমাকে আটকে রেখেছি।

একটু পরেই চাপা উত্তেজনা লোকজনের মধ্যে। ভিড় এখানে সেখানে। রোহানা একজনকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ওদিকটায়?

–একজন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছে।

ধক্ করে উঠল রোহানা চৌধুরীর বুক, কে সে? নাম জানেন?

–কাজী রায়হান। গতরাতের অপারেশনে ও নাকি ছিল।

–কি করে জানেন, ও মুক্তিযোদ্ধা? ওতো রিলিফ টীমের ভলান্টিয়ার।

–কথাটা আপনি পাক আর্মিদের বোঝান গিয়ে ম্যাডাম। ফ্রাঙ্কের মুখের একটা

www.pathagar.com

গ্লাস ঝোঁপের আড়ালে পেয়েছে পাক আর্মিরা। রায়হানের কাঁধের ফ্লাস্কে ওটা নাকি হুবহু লেগে গেছে, ব্যস।

নিঃশ্বাস ফেলারও উপায় নেই। শুধু রোহানা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে যেতে লাগল। কি সহজ সরল ছেলেটা। সবে তো জীবন আরম্ভ করেছিল। এই জীবনযুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে ওর কত কৌতূহল, কত জিজ্ঞাসা। অথচ সামান্য ভুলের জন্য ওকে জীবন দিতে হচ্ছে। এই পৃথিবীর আদর্শ, আবেগ, ভাববাদ কোন কিছুই ওর কাজে লাগলো না।

সেই সন্ধ্যার একটু আগে একটা লোকাল ট্রেন এসেছিল। আহতদের স্ট্রেচারে করে ট্রেনে ওঠানো হলো। এই সময়ের মধ্যে মারা গেছে অনেকে। যাদের আত্মীয়-স্বজন এসেছিল, তারা লাশ সনাক্ত করে নিয়ে গেছে। আশ্চর্য, মেয়েটার কোন আত্মীয়-স্বজন এলো না। বোধহয় মেয়েটি কোন সুদূর পল্লী অঞ্চলের, যেখানে এ সংবাদ এখনো পৌঁছায়নি। গণকবর একটাই খোড়া হয়েছিল। রোহানা চৌধুরীর অনুরোধে দুটো কবর খোড়া হলো, মেয়েদের জন্য ভিন্ন। বাচ্চাদের মেয়েদের কবরেই দাফন করা হবে বলে স্থির হলো।

ট্রেনে সারাটা পথ রোহানা ওমরের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। বাইরের দৃশ্যও দেখছিল না। জীবনের অনিত্য পরিণাম নিয়ে ভাবছিল তাও নয়। আহত মানুষের করুণ এবং যন্ত্রণাকাতর মুখগুলোই বারবার ভেসে উঠছিল তার চোখের পর্দায়। এক মধ্যবয়স্ক লোকের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে গিয়ে তাকে যে বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়েছিল সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না রোহানা।

–ব্যান্ডেজ বাঁধলে আরো ভাল থাকবেন, বলল রোহানা।

আসলে ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল ছিল না, এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি রোহানা।

–দেখুন, আমার কিছু হবে না। প্রতিদিন এক ঘন্টা করে জগিং করি ভোরে, সন্ধ্যায় মুগুর ভাজি. যদিও নিয়মটা সেকেলে, কিন্তু শরীরটাকে খুব ঝরঝরে রাখে। রক্ত কতটুকু আর ঝরবে, ঝরতে দিন, এত সহজে আমাকে কাবু করতে পারবে না। খানিকটা হাঙ্গামা হুজ্জত হলো, এই আর কি!

–চুপ করে থাকুন, ভাল লাগবে।

–আমার স্ত্রীর কথা বড্ড মনে পড়ছে। আমার রওয়ানা হওয়ার আগের রাতে আমার স্ত্রী ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। কিছুতেই আমাকে রওয়ানা হতে দেবে না। কিন্তু মেয়েদের কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া ব্যবসার কাজে আমাকে লাকসাম আসতেই হতো। সময় মত পার্টির সঙ্গে কথা না বললে এত বড় ড্রীল ফস্কে যাবে। প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে, ঠিক কিনা?

–ঠিক, সংক্ষিপ্ত উত্তর রোহানার।

www.pathagar.com

–তা স্ত্রী বলল, কথা যখন শুনবেই না, যাবেই। আয়াতুল কুর্সি পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে বের হও। আগে ডান পা ফেলবে। আরে ভাই, আয়তুল কুর্সি জানিই না, পড়ব কি? স্ত্রীকে বলব, তুমি পড়ে ফুঁ দিয়ে দাও, তা লজ্জায় বলতেই পারলাম না।

–স্ত্রীর কাছে লজ্জা কি?

–আহা নামায, দোয়া-দরুদ কিছুই শিখিনি, জানি না। বৌ যতবার জিজ্ঞেস করেছে, তুমি সব সময় বাইরে বাইরে ঘোরো, আয়তুল কুর্সি পড়তো? পড়ি। আরে ভাই, মিথ্যে বরাবর বলে এসেছি, এখন কোন মুখে সত্য কথা বলি?

হাসল রোহানা। বিষাদের সুর ভদ্রলোকের কণ্ঠে, আচ্ছা বলুন তো, আয়তুল কুর্সি পড়ে যদি বের হতাম, ট্রেন দুর্ঘটনা হতো না?

–ট্রেন দুর্ঘটনা হতো, আপনার কিছু হতো না। অবশ্য সব কিছু নির্ভর করে দোয়া কবুল হওয়ার উপর।

–সে আবার কি রকম?

–আপনি যখন আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে খাস দিলে দোয়া পড়বেন, তখন তা কবুল হবে।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, জানেন, মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

রোহানা কথা বলল না।

–এবার ফিরে গিয়ে বৌয়ের কাছেই নামায শিখব। সবার আগে আয়তুল কুর্সি, লাজুক হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

রোহানা হাসল, খুব ভাল হবে।

কিছুতেই ভদ্রলোকের রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। বিকালের দিকে মারা গেলেন, লোকাল ট্রেন আসার আগেই। ভলান্টিয়াররা ডাকাডাকি করছিল রোহানাকে। রোহানা যায়নি। যেতে পারেনি। ভদ্রলোকের বেঁচে থাকার শেষ আকুতিটুকু ধীরে ধীরে কিভাবে মরে আসছিল তা সে নিজের চোখে দেখেছে। তাঁর আত্মবিশ্বাস নিয়তির কাছে কিভাবে মার খেয়ে পরাজয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এই দুঃখ-মলিন অনিচ্ছার যন্ত্রণা সে সহ্য করতে না পেরে উঠে এসেছে। বেঁচে থাকার অর্থ তবু বোঝা যায়। একটা গতিশীল প্রক্রিয়ার মাঝে মানুষ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ দুঃখ, সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু মৃত্যু রহস্যময়। প্রবহমানতার রুদ্ধতা, গতির সমাপ্তি, আশা নিরাশার সমাধি। মৃত্যুর পরে আলাদা একটা জীবন। এই জীবনের সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই, সখ্যতা নেই, শত্রুতাও নেই। অন্তহীন এই জীবনের রহস্যময়তার একমাত্র শেষ বিচারক স্বয়ং বিধাতা, যে বিধাতার সঙ্গে লেন-দেন চলে না, তর্ক চলে না, শুধু চলে আত্মসমর্পণ।

লাকসাম জংশন এসে গেল। প্ল্যাটফরমে লোকজনের ব্যস্ততা দেখে মনে হয় না,

www.pathagar.com

একটু দূরেই জীবন-মৃত্যুর এতবড় খেলার মহড়া ঘটে গেছে। শুধু স্টেশনে পাক সেনাদের বেশি সংখ্যায় আনাগোনা।

ওমর এই প্রথম কথা বলল, ওঠ।

শূন্য দৃষ্টি রোহানার, এখানে নামব?

–হ্যাঁ।

–বেলোনিয়ায় যাব না?

–এই ট্রেন বেলোনিয়া যাবে না। পরে ব্যবস্থা হবে। এসো।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকল দু'জনে। একটা বেতের চেয়ারে রোহানাকে শুইয়ে দিয়ে বলল, বিশ্রাম কর। আমি আসছি।

মিনিট পনের পরে দু'কাপ চা, পাউরুটি আর কলা নিয়ে ঢুকল ওমর। বলল, খাও।

–ইচ্ছে করছে না যে।

–দুদিন কিছু খাও না, ক্ষিধে মরে গেছে। খেলে ভাল লাগবে।

দু'জনে চুপচাপ চা খেয়ে নিল। পাউরুটি দিয়ে দিল এক ভিখারী ছেলেকে। কলা পড়ে রইল চেয়ারের হাতলে। ওমর উঠল।

–কোথায় যাবে?

–বাজারের দিকে। তোমার শাড়ি ব্লাউজ দরকার। এখানে গোসল সেরে নাও।

–ভালই তো আছি।

–শাড়ির দিকে তাকাও।

হঠাৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠল রোহানা। কাদায় মাখামাখি হয়ে চটচটে হয়ে আছে শাড়ি। ভারিও মনে হচ্ছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না।

–একবার বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে এসো। নিজেকেই চিনতে পারবে না।

–সত্যি? হাসল রোহানা।

ওমর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রোহানা স্বাভাবিক হচ্ছে। রোহানা জীবনের আশায় আবার উচ্চকিত হচ্ছে।

নতুন শাড়ি পরে নিজেকে বড় ঝরঝরে মনে হলো রোহানার। কিছুক্ষণ আগে সে যে একটা বধ্যভূমিতে ছিল, সেই দৃশ্য ভাসমান মেঘের মত ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে মন থেকে। ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখল আয়নায়। জিজ্ঞেস করল ওমরকে, কেমন দেখাচ্ছে?

রোহনা দীর্ঘাঙ্গী নয়, উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণেরও নয়। ছোটখাটো ছিপছিপে গড়ন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখ দুটো ঝকঝকে। হাসি এবং বুদ্ধি যেন এক সঙ্গে খেলা করে চোখ দু'টোতে। ওমরের চোখে মুগ্ধতা।

–ওমন করে কি দেখছ ওমর?

www.pathagar.com

–তুমি বড় লাবণ্যময়ী রোহানা।

–আমার নিজেকে আজ এত কেন ভাল লাগছে জান?

–না তো!

–তোমার দেয়া শাড়ি ব্লাউজ পরেছি বলে। কি যে আনন্দ হচ্ছে। জীবনে এই তোমার প্রথম উপহার।

ওমর প্রথমে হতভম্ব। তারপর প্রাণখোলা হো হো হাসি। পরে বিষণ্ন কাতর কণ্ঠে বলল, তাইতো, তোমাকে তো কোনদিন কিছু দিইনি। অথচ তুমি প্রতি মাসে আমাকে কত কিছু দিয়েছ, কলম, ডায়েরি, মনিব্যাগ, বই ইত্যাদি।

–ওগুলো তোমার দরকার ছিল বলে দিয়েছি। ছেলেরা যে নিজেদের দরকার নিজেরা বুঝতে পারে না, অথচ মুখ বুঁজে অসুবিধেগুলো ভোগ করে। হয়তো কেউ দেবে বলে প্রতীক্ষা করে।

–তুমি কিছু পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করনি রোহানা?

–করেছি। তুমি দাওনি।

–আমি বুঝিনি রোহানা।

–একটা জিনিস কিন্তু না চাইতেই দিয়েছ?

তাকাল ওমর।

–ভালবাসা।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল ওমর, মনে হয় জীবনের সব ভালবাসা এবং আদর দিয়ে ভরিয়ে দিই তোমাকে। কিন্তু লগ্ন এলো না।

রোহানা চুপ করে রইল।

–ওঠ রোহানা।

–কোথায় যাবে?

–কেরামত মন্ডল চাচার বাড়িতে। মনে নেই, আমাদের বাসার ঠিকানা দিয়ে গেলেন। কত করে বলে গেলেন যেতে।

–যাব?

–হ্যাঁ, একটা রাতের বিশ্রাম দরকার আমাদের। তাছাড়া মানুষটাকে বড় ভাল লেগেছে আমার।

–বেশ চল।

স্টেশন থেকে বাড়ি বেশি দূরে না। বাজার ছাড়িয়ে আরো পশ্চিমে। মফস্বল টাউন। বাড়িঘরের কেমন ছাড়াছাড়ি ভাব। একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব অনেক। মাঝখানে মস্তবড় মাঠ। স্কুলের ছেলেরা এখানে বিকালে ফুটবল খেলে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আর কেউ খেলতে আসেনি। নিঃশব্দ কাতরতায় মাঠটা একা পড়ে আছে। ঘাস গজিয়েছে অনেক। কিন্তু গোলপোস্ট রয়ে গেছে। মাঠ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে অনেকটা

www.pathagar.com

সরে গিয়ে বাড়ি। অনেককে জিজ্ঞেস করতে হলো ঠিকানার কার্ড দেখিয়ে।

প্রত্যেকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়েই সরে পড়ল। ওমর ও রোহানা অবাক, এমন করছে কেন এরা? তারা এ শহরে আগন্তুক বলে সন্দেহ করছে নাকি কেউ? কেমন দায়সারা উত্তর দিয়ে সরে যাচ্ছে। দিনের বেলাতেও বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। ভেতরে কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভূতুরে বাড়ির মত ছায়াঘন নৈঃশব্দে ডুবে আছে বাড়িটা। বাড়ির কমপাউন্ড ওয়াল নেই। গেটও নেই। রোহানা এবং ওমর দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েকটা মুহূর্ত অস্বস্তির কাঁটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিঃশব্দে পার হয়। রোহানা বলে, ফিরে চল।

–এসেছি যখন শেষটা দেখে যাই।

ওমর ঘরের দরজায় নক করতে থাকে। প্রথম ঘর, হয়তো বৈঠক খানাই হবে। বেশ কয়েকবার নক করার পর দরজার কপাট খুলে যায়।

–কে?

প্রশ্ন হয়। গলায় কম্পন বোঝা যায়। পর মুহূর্তে মনে হয়, কেরামত মন্ডল দাঁড়িয়ে আছেন। ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয় না। ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি। লম্বা গড়নের। চোখ দুটো বিষণ্নতায় ধূসর। জলভরা মেঘ আকাশে যেন ঝুলে আছে ভারাবনত হয়ে। বাতাসের সংস্পর্শে এলেই টপ টপ করে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়বে।

ওমর তড়িৎ কণ্ঠে বলল, আমার নাম ওমর। ওর নাম রোহানা। কেরামত মন্ডল সাহেব আমাদের এখানে বেড়াতে আসার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলেন।

কেরামত মন্ডলের দেয়া কার্ড ওমর মেলে ধরল ভদ্রলোকের চোখের সামনে।

–ভেতরে আসুন।

–উনি বাসায় নেই?

কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন, আসুন।

দু'জনে ভেতরে প্রবেশ করল। এটা ড্রইং রুম। বেশ সাজানো গোছানো। মফঃস্বলের বাড়ি হিসাবে চমৎকার। পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় দেয়।

–এ্যাকসিডেন্টের সময় আমরা ট্রেনের একই কামরায় ছিলাম, ওমর আলাপ করতে চেষ্টা করে।

–অতশত জানি নে। তাঁর বলার সময় হয়নি। শুধু নাম দুটো বলে গেছেন। আর কিছু নির্দেশ রেখে গেছেন।

–উনি কি অন্য কোথাও চলে গেছেন?

–হ্যাঁ, তবে সেটা আলাদা জগৎ।

–আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

–আপনারা কিছু জানেন না?

–কি জানব?

–ট্রেন থেকে স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলী করা হয়েছে। হাসপাতালে নেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল, বাঁচেনি। ওই অবস্থাতেও আপনাদের কথা বলেছিল।

স্তব্ধ রোহানা ও ওমর। কণ্ঠ ফুঁড়ে শুধু একটা শব্দ বের হলো, আশ্চর্য।

–আশ্চর্য কিছু নয়। এমন একটা পরিণতির আশংকা আমরা করতাম। কিন্তু উনি করতেন না, বলতেন আমি কিছু অন্যায় করছি না।

–আপনি?

–ওর ছোট ভাই।

–ওর ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী কি এখানে আছেন?

–উনি চিরকুমার। জীবনভর দেশের সেবা করে কাটিয়েছেন। দেশ ছিল তাঁর চিন্তা, ধ্যান, পরম সম্পদ।

–ওঁর অপরাধ কি ছিল?

–এ রকম গৃহযুদ্ধে অপরাধ লাগে না। ভিন্ন আদর্শই অপরাধ।

–যতদূর জানি, উনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন না।

–কিন্তু তৃতীয় পক্ষকে ডেকে আনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। খাল কেটে কুমীর আনাকে তিনি এ যুদ্ধের দূর্বল দিক বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

–এমন কথা অনেকেই তো ভাবতে পারেন। সাংবাদিক হিসাবে আমরাও না ভাবছি এমন কথা নয়। ঘটনা বিশ্লেষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

–কথাগুলো এখন মনে মনে রাখুন। নইলে বিপদ হবে।

–আমরা বিপদের মধ্যেই বাস করছি। কিন্তু সত্যচ্যুত হওয়া আর ধর্মচ্যুত হওয়া একই কথা।

–সত্য আর ধর্ম এখন মানছে কে?

–দু'চারজন হলেও মানছে, যেমন কেরামত চাচা।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এল। গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, উনি বিহারী বধের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আমরা ধরেই নিয়েছি উর্দুভাষী বলে ওরা পশ্চিম পাকিস্তানী লবির লোক, আর তাই মনে করে ওদের ঠেলে দিয়েছি পাক সেনাদের দলে। ওরা যে পাকিস্তান নয় এসেছে ভারতের বিহার থেকে এবং এখানে এসে ঘরদোর তুলে এখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছে, এ দেশটাকেই যে ওরা ওদের স্বদেশ ভাবতে পারে, একথা আমাদের একবারও মনে হয়নি, ফলে এ দেশটাকে যতই ওরা নিজের ভাবুক আমরা ওদেরকে পাক সেনাদের লবিতেই ঠেলে দিয়েছি, আর ওদেরও অনেকেই আমাদের ভাবনাটাকেই সত্য ভেবে নিয়ে ওই দলে গিয়ে ভিড়েছে। আত্মরক্ষার অধিকার সবারই আছে।

–ঠিক বলেছেন। উর্দু ভাষী হওয়ার অপরাধে ওদের ওভাবে চিহ্নিত করা ঠিক হয়নি। আসলে তো ওরা তো ইন্ডিয়ানই। সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের কাছে।

www.pathagar.com

–এখন বিবেক কাজ করছে না, কাজ করছে ভাবাবেগ। এখানে সন্ধ্যায় একটা মিটিং হওয়ার কথা ছিল। বাঙ্গালী-বিহারীদের যুদ্ধকালীন সম্প্রীতি মিটিং। তার আগেই ওঁকে মেরে ফেলা হলো।

–তাহলে এটাই হত্যার কারণ?

–এটা একটা কারণ। ভাইজানের সামগ্রিক আদর্শই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি ভাবতেন, বিশ্বের সমস্ত দেশের মুসলমানদের একটা সমন্বিত আদর্শবাদ থাকা উচিত। কোন দেশের মুসলমান রুটি খায়, কোন দেশে ভাত খায়, কেউ শেরোয়ানী পরে, আর কেউ শাড়ি পরে, এটা বড় কথা না। বড় কথা হলো আত্মিক মিলন। এই আত্মিক মিলন আসবে এক ধর্ম, এক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। এখানে মুসলমান মুসলমানে কোন ভেদাভেদ নেই। এনটিটি এবং ইনট্রিগিটি শব্দ দুটোর প্রতি ভাইজানের ছিল অগাধ বিশ্বাস। মুসলিম দেশসমূহের ভৌগোলিক সীমা রেখাকে তিনি মনে করতেন কৃত্রিম রেখাচিহ্ন হিসাবে। সব মুসলমান এক, বিশ্বাস এক, কর্মকান্ড এক। অতএব এটা একটা দারুণ ইউনিটি ইন ডায়ভার্সিটি। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের একটা কনফেডারেশনের চিত্র নিয়ে তিনি প্রায়ই গবেষণা করতেন এবং প্রবন্ধ লিখতেন। প্রায়ই বলতেন, আমার দেহটার সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু আত্মার নেই। আমার দেহ বাস করে আমার দেশে, কিন্তু আত্মা বাস করে সমস্ত মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে। আবার এর সঙ্গে মিলিত হবে বিশ্ব মানবতার মিলিত আত্মিক সত্তা। তাঁর এই মানবতাবোধ সব মানুষের রক্ত, মাংস, মজ্জা এবং আত্মা নিয়ে গভীর সমুদ্রের মত এক মহা মিলন।

আনিস মন্ডল থামলেন। এই মৃত মানুষটিকে কেন যে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছে রোহানার, তা সে নিজেই জানে না। যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এত উদার, মনের ডায়মেনশন এত বড় যে সাধারণ মানুষের তা বোঝার কথা নয়। যারা এত বড় মন নিয়ে জন্মান তাঁদের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় স্বদেশবাসীদের কাছেই। কারণ, তাঁদের চিন্তাধারাকে ধারণ করার ক্ষমতা তাঁদের যুগের মানুষদের নেই। বহু শতাব্দী পার হলে, মানুষের চিন্তাধারার প্রসার ঘটলে চিত্তবৃত্তির অন্ধত্ব দূর হলে তারা আবার এঁদের নতুন করে মূল্যায়ন করে। ভেবে অবাক হয়, মেঘের অন্তরালে সূর্য রশ্মির এত তেজ কেমন করে লুকিয়ে ছিল? রহস্য ধারণ করে যুগের যন্ত্রণা থেকে তাঁদের আড়াল করে রেখেছিল? কেরামত মন্ডল বেঁচে নেই। তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের হাতে। তাঁর আদর্শও চাপা পড়ে থাকবে যুদ্ধের ডামাডোলে। কিন্তু মেঘের এত বড় ক্ষমতা নেই যে সূর্যের উজ্জ্বল মুখ চিরদিনের জন্য অন্ধকারে ঢেকে রাখে। ঐ মুখ একদিন না একদিন উঁকি দেবেই নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশমান করার জন্য।

–আমরা তাহলে উঠি এবার, ওমর বলল।

আনিস মন্ডল হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন, বললেন, তা কি করে হয়? ভাইজান আপনাদের সম্পর্কে কি বলে গেছেন শুনবেন না?

www.pathagar.com

রোহানার বিস্ময়কর অনুভূতি মাখনের মত গলে নরম হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করল, তিনি কি কিছু বলার সময় পেয়েছিলেন?

–মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বলেছিলেন, ছেলেমেয়ে দুটো হীরক খন্ড, আমার আদর্শের, স্বপ্নের রূপায়ন। ওদের মনে হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, বৃহত্তর পরিমন্ডলে ওরা জীবনের স্বপ্ন দেখে। ওরা এলে যেন অযত্ন না হয়। আরো বলেছিলেন, বলে আনিস মন্ডল থামলেন, তারপর ছিঁড়ে যাওয়া সূতোর জোড় লাগিয়ে বললেন, আপনাদের যেন কিছুতেই ট্রেনে অথবা বাসে বেলোনিয়ায় যেতে না দিই। আমাদের নিজস্ব গাড়িতে করে যেন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেই, কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়।

তিনজোড়া চোখ একসঙ্গে টলমল করে উঠল পানিতে। মাটিতে পড়ল না, কিন্তু চোখের কোল ভিজিয়ে দিয়ে পলিমাটির সিক্ততায় আর্দ্র হয়ে উঠল।

–আপনারা আজ রাতটুকু বিশ্রাম করুন। শেষ রাতের দিকে আপনাদের রওয়ানা করিয়ে দেব। ভেতরে যাই চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

দক্ষিণের কোণের ঘরে ভদ্রলোক ওমর ও রোহানাকে নিয়ে গেলেন। রোহানা ইতস্তত করল, তারপর বলল, আমি না হয় ভেতরে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গিয়ে শুই?

ভদ্রলোক মুহূর্তে কথার মর্মার্থ বুঝে ফেললেন। বললেন, ও, হ্যাঁ, তাই করুন। ভাইজানের মৃত্যু আমাদের সাজানো সংসার ওলট পালট করে দিয়েছে। স্থির হয়ে কিছু করতে পারছি না। আপনার জন্য আলাদা একটা রুম সাজানো উচিত ছিল।

–আমি কিছু মনে করিনি। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কতুটুকুই বা সময়, ভাবী এবং ছেলেমেয়েদের কিছুটা সঙ্গ দেয়া দরকার।

–আপনারা খুব ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। খানা তৈরি হচ্ছে।

এই পরিবারটিকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল রোহানা এবং ওমরের। বারবার মনে হচ্ছিল, বড় আপনজনদের ফেলে যাচ্ছে এখানে। একজন চির অন্ধকারে, অন্যরাও বিপদসঙ্কুল আশ্রয়ে।

রাতের অন্ধকার এখনো কাটেনি। বড়জোর রাত তিনটে হবে। কিন্তু আনিস চাচা সতর্ক ব্যক্তি। পথ দীর্ঘ এবং নিরাপত্তাহীন। তাঁর বাড়িটাও এখন বিপজ্জনক স্থান। যদিও তিনি রাজনীতি করেন না, শত্রুদের ধারণা, তিনি তাঁর ভাইয়ের ভাঙ্গা হাল টেনে ধরতে পারেন।

হেড লাইট জ্বেলে গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলেছে পূর্ব দিকে। মফস্বল টাউনের ড্রাইভার হলেও সে আনাড়ি না, তার গাড়ি চালানো দেখলেই বোঝা যায়। তাছাড়া আনিস চাচা নিশ্চয়ই তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

–এই পথ কি আপনার চেনা? ওমর জিজ্ঞেস করল।

–হ্যাঁ। কথা বলবেন না, চুপ করে বসে থাকুন।

–এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

–ভয় আমার জন্য না, আপনার জন্য।

–আমি কি করলাম?

–আপনি বাঙ্গালী নন। পাঞ্জাবী অথবা বিহারী।

–কি করে বুঝলেন?

–আমি নিজে বিহারী।

–বলেন কি? আপনার কথা শুনে বোঝার উপায় নেই।

–অন্য কেউ হয়তো আপনাকেও বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমি বুঝেছি। বাঙ্গলা ভাষার শুদ্ধ টান আপনার গলায় এখনো আসেনি।

–কেউ এ পর্যন্ত বলেনি।

–অভিজ্ঞ কানে ধরা পড়ে।

–ভয়ের কিছু আছে?

–তাতো আছেই। এই যে রাস্তা দিয়ে চলেছি, এত ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল দেখছেন, এগুলো মুক্তি ফৌজদের আড্ডা।

– বলেন কি?

–ঠিকই বলছি। কাছেই যুদ্ধ হচ্ছে, এরা থাকবে না? দরকার মত দ্রুত বেগে বের হয়ে শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

–ওরা কি আমাদের উপর নজর রাখছে?

–রাখতে পারে। তাইতো গাড়িতে স্পীড দিয়েছি একশ মাইল।

রোহানার কাতরোক্তি, গাড়ি খুব ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

–খাবেই তো, রাস্তা ভাল না। কেউ কখনো এদিকে আসে না। নেহাৎ যুদ্ধ হচ্ছে, তাই জায়গাটার দাম বেড়েছে।

–এত খারাপ রাস্তা ভাবিনি।

–সহ্য করুন মা। ঠিকমত পৌছে যাওয়াটাই বড় কথা।

–এই যে বললেন, আপনি বিহারী, বিপদ হলে তো আপনারও হবে।

–তা তো হবেই।

–তাহলে লাকসামেও তো আপনি নিরাপদ নন।

–তা তো নই-ই। বড় সাহেব বেঁচে থাকতে আমাকে পাহারা দিয়ে রাখতেন। অথচ নিজের পাহারার কথা ভাবেননি। তার ধারণা ছিল, তার কোন শত্রু নেই।

–এখন আপনি কি করবেন?

–দিনের বেলায় এদের বাসায়, রাতে বিহারী পট্টিতে চলে যাব।

www.pathagar.com

–সেখানে কি আপনি নিরাপদ?

–না, বাঙ্গালীরা দলে ভারি। মরলে এক সঙ্গে মরব, এই আর কি!

–পাকিস্তানে চলে গেলেই তো পারেন।

–পথ বন্ধ। যারা আছে তারাই তো ইদুঁরের যাঁতাকলে পড়ে মরবে।

সাব্বির খান চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তার অভিমান ভরা কণ্ঠ শোনা গেল আবার, দুই পুরুষ ধরে এখানে বাস করেও আমরা বাঙ্গালীদের আপন হতে পারলাম না।

রোহানা চৌধুরী নিচু স্বরে কবিতার দুটো বিষণ্ন লাইন আবৃত্তি করল,

আমি ভাবি মাটি আপন, মাটি ভাবে পর
এই মাটিতে বাঁধতে নারলাম নিজের আপন ঘর।

–মা, এই কবিতা কার লেখা?

–আমার নিজের।

–আপনি কি জানতেন, আমাদের এই দুর্দশা হবে? আমরা আপন ঘরে পরবাসী হবো?

–জানতাম না। কিন্তু পৃথিবীতে বারবার এই ঘটনা ঘটছে। মানুষ মানুষকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করছে। কখনো তাকে নির্বাসিত করছে পরদেশে। কখনো তার ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলছে।

–কারা করছে এসব?

–যাদের শক্তি আছে, দর্প আছে, অন্ধ বিবেকের অহংকার আছে।

–এদের বিচার হয় না?

–হয়, নিয়তির বিচার এড়ানো যায় না। দেরিতে হয়।

–আপনারা এত ভাল জানতাম না।

–কি করে বুঝলেন আমরা ভাল?

–ভাল না হলে আমার সাহেবের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব হলো কি করে?

–শুধু পথের দেখা।

–ওমন করে বলবেন না। উনি মরতে মরতেও আপনাদের কথা বলে গেলেন।

–আপনি কি করে জানেন?

–তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আমি তার শয্যাপাশে ছিলাম।

স্বজন হারানোর বেদনা নিয়েই যে তারা লাকসাম ছেড়েছে একথা সাব্বির খানকে বলতে গিয়েও বলল না রোহানা। খামাকা বেচারার দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি? যত এগুচ্ছে বেলোনিয়ার দিকে তত পাক সেনাদের আনাগোনা বেশি দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারের আইডেনটিটি কার্ড দেখে ছেড়ে দিচ্ছে ওরা। রোহানার মুখে মিষ্টি হাসি, সাব্বির মামা, এদের কাছে আপনার দেখি বেশ খাতির। এদিকে আগে এসেছিলেন নাকি?

www.pathagar.com

–না।

–আপনি বিহারী বলে পাক সেনারা খাতির করছে আপনাকে?

–আমার নামের পাশে কি বিহারী শব্দটা লেখা আছে?

রোহানা দারুণ লজ্জা পেল এই অর্ধ শিক্ষিত লোকটির কাছে। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত না হয়ে পারল না।

–সরি, কিছু মনে করবেন না মামা।

–মা, আপনি আসল ব্যাপারটা বোঝেননি।

রোহানার উৎসুক দৃষ্টি পড়ল স্টিয়ারিং হুইল ধরা লোকটির উপর।

–আপনারা যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন পাক সেনাদের বেলোনিয়ার আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে ছোট সাহেব ফোন করেছিলেন।

–বলেন কি! ওমর বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না।

–তাছাড়া লাকসাম পাক আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণ পর্যন্ত যে গাড়িটা আমাদের ফলো করছিল ওটা লাকসাম পাক আর্মিদের পেট্রোল কার।

–আপনি লক্ষ্য করেছেন সব?

–হ্যাঁ, ব্যাক মিররে দেখা গেছে।

–আমাদের জানান নি কেন?

–জানিয়ে লাভ কি? আপনাদের ভয় বাড়ত। অবশ্য ওরা আমাদের নিরাপত্তার জন্যই ফলো করে আসছিল।

–গাড়িটা এখন দেখা যাচ্ছে না।

–ফিরে গেছে। কেউ নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করবে না। আমরা বেলোনিয়ার সীমায় ঢুকে গেছি। এখন এদের আর্মি ফোর্স আমাদের উপর লক্ষ্য রাখবে।

–বাঃ আমরা দেখছি ভি, আই, পি হয়ে গেছি।

–আপনারা কি এত সহজে বেলোনিয়ার রক্ষা ব্যূহে ঢুকতে পারতেন? বড় সাহেবের শেষ অনুরোধে ছোট সাহেব এসব ব্যবস্থা নিয়েছেন।

বিস্ময়কর ভাললাগার বেদনায় ওমর এবং রোহানা চুপ। হঠাৎ নীরবতা ভাঙ্গল রোহানা, আপনার ফিরে যাওয়ার সময়ে কি হবে?

–হুকুম আছে আপনাদের নিয়েই ফিরব।

ওমর জবাব দিল, আমাদের অন্য কোন প্রোগ্রাম নেই। মামুকে দেখা একমাত্র প্রোগ্রাম।

–তাহলে তো ঝক্কি-ঝামেলা চলে গেল। ভাববেন না নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে একথা বলছি। আপনাদের নিরাপদে ফিরিয়ে নেয়াটাই আমার প্রধান দায়িত্ব। অবশ্য সবই আল্লাহ ভরসা।

www.pathagar.com

–জ্যান, ছোট্ট মন্তব্য করল ওমর।

বেলা গড়িয়ে এখন বিকেল। সরাসরি আর্মি ক্যাম্পে ঢুকে রিপোর্ট করল সাব্বির খান। একজন বেরিয়ে এলেন, গাড়ির কাছে এসে বললেন, নামুন।

নেমে এল দু'জনে। তীক্ষ্ণ চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি বিগ্রেডিয়ার মাসুদ খানের ভানজা?

–হ্যাঁ।

–আইডেনটিটি কার্ড আছে?

ওমর কার্ড বের করল।

–ইনি কে?

–রোহানা চৌধুরী, জার্নালিস্ট।

–ওকে গাড়িতেই থাকতে হবে। নামতে পারবেন না। এখানে জার্নালিস্টদের প্রবেশাধিকার নেই।

ঢোক গিলল ওমর, কি বলতে কি বলে ফেলল। অফিসারের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কিছু বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

রোহানা ওমরের বিব্রত ভাব কাটিয়ে দেয়ার জন্য বলল, ওকে, আই শ্যাল ওয়েট ইন দি কার। লেট হিম গো।

ওমর রোহানার দিকে তাকাল, মুখে কোন কথা যোগাল না। আফিসার ওমরকে কর্কশ ভাষায় নির্দেশ দিল, ফলো মী।

রোহানার কোন দুঃখ এবং রাগ হয়নি। ওমর যা বলেছে সত্যি কথাই বলেছে। এই কঠিন মুখের অফিসারটিকে কেমন করে বলা যাবে, এই মেয়েটা আমার প্রিয়তমা। যুদ্ধের পর বেঁচে থাকলে আমাদের বিয়ে হবে।

ব্যাক সীটে শুয়ে পড়তে পারলে শরীরটার বিশ্রাম হতো। মনটাও চাঙ্গা হতো। এখন কিছু করার নেই। ড্রাইভার সাব্বির খানও নেই। অফিসার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে যে বাঙ্গালী, তা কি অফিসার বুঝতে পেরেছে? নয় কেন? ওমর যেমন তার গায়ের রং, চোখের রং বদলাতে পারে না, সেও তার শ্যামলা গায়ের রং আর চোখের কালো রং ঢাকতে পারে না। দরকারই বা কি? বিধাতা যে অঞ্চলের লোককে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটাই তাঁর সৃষ্টি কৌশল, গৌরব এবং অনন্য বৈচিত্র।

একটু পরেই অফিসারটি ফিরে এল, মুখ অধিক গম্ভীর এবং গুমড়ো। তিক্ত কণ্ঠে বলল, গেট ডাউন এন্ড ফলো মী।

–থ্যাঙ্কস, রোহানা ভদ্রতাবোধ হারাল না।

অফিসার রোহানার মুখের দিকে এবার ভাল করে তাকাল। কণ্ঠে বিনীত ভাব এনে বলল, আই এ্যাম সরি ফর ডিলে।

–নেভার মাইন্ড। ইউ হ্যাভ ডান ইয়োর ডিউটিজ প্রপারলি।

www.pathagar.com

–বেঙ্গলী?

– ইয়েস প্লীজ।

–ইউ হ্যাভ কাম টু কালেক্ট নিউজ অব ওয়ার?

–নো। আই হ্যাভ কাম টু সী দি উন্‌ডেড আঙ্কল।

–আঙ্কল?

–আই এ্যাম বিট্রোদ্‌ড্ ব্রাইড অব ওমর বাট।

অফিসার ফিরে তাকিয়ে থেমে পড়ল। রোহানাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে প্রশ্ন করল, ইউ ডেয়ার সো?

–হোয়াই নট? উই লাভ ইচ আদার।

হাত বাড়িয়ে দিল অফিসার, কনগ্রাচুলেশনস্।

হেসে রোহানাও হাত বাড়িয়ে দিল।

বিগ্রেডিয়ার মাসুদ খানের ঠোঁটে অদ্ভুত এক মিষ্টি হাসি। শুয়ে আছেন কাঠ দিয়ে তৈরি টেমপোরারি বিছানায়। মুখ মলিন, বিষাদময়। ক্লিষ্ট ঠোঁটে এক টুকরো হাসি। হাত বাড়িয়ে ইশারা করলেন, বৈঠ যাও বেটি।

চমকে উঠেছিল রোহানা, এ যে বয়স্ক ওমর বাট। মামা ভাগ্নের চেহারায় এত মিল। সুন্দর, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বল। কিন্তু চোখ দু'টো নিষ্প্রভ। হয়তো অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্যই। মৃদু আর্তনাদ করতে করতেই হাসছিলেন। ওমরের দিকে মুখ ফেরানো, বেটা তুম ঝুট্ বাত বোলা হ্যায়। সী ইজ লাভলী এন্ড ব্রাইট। আই লাইক হার ভেরি মাচ্।

রোহানা বুঝল, ওমর তার সম্পর্কে মামাকে মজাদার কিছু বলেছে, মেয়েটা কালো, পেত্নী, কুৎসিত। তোমার পছন্দ হবে না মামা। তবে আমার চোখ দিয়ে যদি দ্যাখো, তাহলে পছন্দ হবে। ওমর বলছে, মামু তুমি ভাল হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।

–বেটা, আমি সৈনিক, আমার কি হয়েছে তা তো আমি জানি।

–মামুজী, অসুস্থ মানুষের জানাটাই শেষ জানা নয়, আল্লাহ আছেন।

–মেরা পিয়ারে ভান্‌জা, সামরিক বিভাগে মিথ্যা বলার নিয়ম নেই। ডাক্তার আমাকে জবাব দিয়ে গেছেন।

যে ওমর বাট এত বিপদ-আপদেও ভেঙ্গে পড়েনি কোনদিন, সে আজ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মনে হলো তার হৃদপিন্ড টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কষ্টের তীক্ষ্ণতম চাপে।

–বেটা মাত রোতো। হ্যাভ পেসেন্স মাই বয়।

রোহানা বলল, মামুজী আমরা আপনাকে ঢাকা নিয়ে যাব। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। এরা কেন যে আপনাকে এখনো ঢাকায় পাঠায় নি?

–আমি বাঁচব না বলেই পাঠায়নি। মৃত মানুষের জন্য হাঙ্গামা করে লাভ নেই বেটি। তোমাদের হাতে এরা আমাকে কখনো ছেড়ে দেবে না, এটা নিয়ম না।

www.pathagar.com

–তোমাকে রক্ত দেয়া হয়েছে মামু? ওমর জানতে চাইল।

–হ্যাঁ, জওয়ানরা দিয়েছে, কাজ হচ্ছে না।

–মামানীকে খবর দেব?

–না বেটা, এটাও নিয়মের বাইরে। আমি মারা যাওয়ার পরে এরা পিন্ডির আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে খবর পাঠাবে। তোমার মামীকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করবে।

মরণোন্মুখ ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের কণ্ঠে বেদনার সঙ্গে শেষ পরিণতির নিঃসঙ্গতা বেজে উঠল করুণ রাগিনীর মত।

–মামুজী, মামানীকে আর কিছু বলব?

–বলো, আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তানকে যেন খাঁটি সৈনিক তৈরি করে।

–মামুজী, তুমি নিজেও একজন খাঁটি সৈনিক।

–না বেটা, আমরা আমাদের কতর্ব্য পালন করতে পারলাম না। দেশটা স্বাধীন হোক সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু একটা মুসলিম দেশ অজগরের পেটে চলে যাবে তা কোন সাচ্চা মুসলমান চাইতে পারে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ফ্রম ফ্রাইং প্যানটু ফায়ার, তাই আর কি। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বাঙ্গালী ভাইদের ঠকিয়েছি এটা সত্য কথা। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদটা আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভাল হতো।

–মামুজী এ দেশের লোক যা চাইবে তাইতো হবে।

–হ্যাঁ বেটা তাই হবে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না। আমরা একদিন শত্রু বনে যাব, ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্তপাত ঘটাব, এটা কে জানতো? বেটি রোহানা, তুমি কিছু মনে করছ না তো?

–না মামুজী, এক হাতে কখনো তালি বাজে না। ইতিহাস এর পুনঃমূল্যায়ন করবে। আমরা এই মুহূর্তে তা করতে পারব না।

–ঠিক বলেছ বেটি, এই মুহূর্তে আমরা কিছুই করতে পারব না। এখন আমরা শুধু আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ করব। হানাহানি করব, কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বেশি মারতে পারলাম তার হিসেব কষবো।

বিগ্রেডিয়ার মাসুদ খান ক্রমশঃ নিঃস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে উঠছে। বারবার তা জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। রোহানা গ্লাসে পানি নিয়ে চায়ের চামচ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢেলে দিচ্ছে আড়ষ্ট জিহ্বায়। চোখ দুটো প্রায় ঘোলাটে।

শেষ চেষ্টা করলেন কথা বলতে, বাঃ একটি বাঙ্গালী মেয়ে আমাকে মৃত্যু শয্যায় সেবা করেছে, অথচ একজন বাঙ্গালী ভাইয়ের আঘাতে আমি প্রাণ হারাচ্ছি।

–মামুজী, রোহানা বলে, আসলে আমরা কেউই খারাপ নই। আমরা অবস্থার

www.pathagar.com

শিকার। নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্ব পরিস্থিতির ভাগ্যাহত মানুষ।

–তুমি ঠিক বলেছ বেটি। আমরাই পরিস্থিতির সৃষ্টি করি, আবার আমরাই তার শিকার হই।

ওমর অনুরোধ করে, মামু কথা বলবেন না, আপনার কষ্ট হচ্ছে।

মলিন হাসি ফুটে উঠল ব্রিগেডিয়ারের ঠোঁটে, বেটা আর কতক্ষণ কষ্ট করব? বেশি সময় নেই। আমি তওবা পড়ছি মনে মনে। তবে এ কথাটার মীমাংসা করে যেতে পারলাম না, আমরা কি শহীদ বলে গণ্য হবো, নাকি আমরা প্রত্যেকেই নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছি।

–আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

–হ্যাঁ, তাই বেটি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করে কি বলছেন। মনে হলো কলেমা পড়ছেন। হাত পা খিঁচে আসছে। গলায় মৃদু ঘড় ঘড় শব্দ। ওমর কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। রোহানা তাকে শক্ত হাতে ধরে আছে। রোহানার চোখে পানি নেই, জ্বালা করছে অসম্ভব।

ডাক্তার এসে তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করতেই ব্রিগেডিয়ারের লাশ তৎক্ষণাৎ বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন মেজর গোছের অফিসার এসে ওমরকে বেশ শক্ত ভাষাতে বলল, আপনারা এখন চলে যান। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবেন না।

ওমর বলল, জানাজা পর্যন্ত থাকি।

কঠিন-কণ্ঠ মেজরের, না।

ক্যাম্পের বাইরে চলে এল ওমর এবং রোহানা। গাড়ি পার্ক করা আছে। সাব্বির খান নেই। দু'জনে নির্বাক হয়ে বসে রইল গাড়ির ভেতরে। আগের সেই অফিসার গাড়ির কাছে এসে বলল, আমার নাম মেজর ইমরান। আপনারা মেজর ইউনুসের কথায় কিছু মনে করবেন না। এখন সন্ধ্যা, মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালালো বলে। আপনাদের নিরাপত্তাহীনতা উনি চাইছেন না, কেবলমাত্র আপনারা ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের আত্মীয় বলে। পাক আর্মিতে এমন কোন অফিসার ও জোয়ান নেই যে তাঁকে ভালবাসত না। তিনি আমাদের গর্ব ছিলেন।

–ওর লাশ দেশে পাঠানো যায় না? ওমর চোখ থেকে পানি ঝরাতে ঝরাতে বলল।

–ইট ইজ ইমপসিবল্, অল কমুনিকেশনস আর কাট অফ। আমরাই তো এখন বাংলাদেশের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আছি।

–আই এ্যাম সরি মেজর।

–আমি আপনার সেন্টিমেন্ট বুঝি মিঃ বাট, কিন্তু আমরা নিরুপায়। সময় সেভ করার জন্য আমরা আগেই ওর জন্য কবর খুঁড়ে রেখেছিলাম।

আঁৎকে উঠে চোখ বন্ধ করল ওমর। রোহানা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল

www.pathagar.com

ওমরকে। যে ওমর এত শক্ত, ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণু সে আজ এইটুকু বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারছে না। প্রিয়জনের মৃত্যু নির্মম সত্যকেও ভুলিয়ে দেয়, ভুলিয়ে দেয় জীবনের রূঢ়তাকে। সৈনিকের জন্য মৃত্যু কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, ট্র্যাজেডিও নয়, বিশেষ একটা পরিণতি মাত্র। তবু যারা বেঁচে থাকে, এই মৃত্যু তাদের সমস্ত অস্তিত্বকে প্লাবিত করে অশ্রুর বন্যায় ডুবিয়ে দেয়। মানুষের হাতে মানুষের খুন করুণাঘন বিষাদে নিমজ্জিত করে আপনজনদের।

এই বিচ্ছেদ কি ভালবাসার বেদনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? পারে কি নিদারুণ ক্ষতের উপর প্রলেপ মাখিয়ে দিতে।

সাব্বির খান এসেছিল অনেক পরে। তাকে না দেখে মেজর ইমরানও বলল, আমি যাচ্ছি, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কারো দেখা নেই।

সাব্বির খান এল, তার মাথায় সাদা টুপি। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠ, ভাইজানের জানাজা পড়ে এলাম।

ওমর বিপুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। হতভম্ব রোহানা চুপ। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল সাব্বির খান, জানাজা পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে কেফায়া, কাজেই সুযোগ পেলে প্রত্যেক মুসলমানের তা পড়া উচিত। তাছাড়া ভাইয়ার জানাজা না পড়ে থাকি কি করে? খাকি ড্রেস পরা, সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম নামাজীদের লাইনে, কে কাকে চেনে?

ওমরের ভেজা কণ্ঠ, সাব্বির মামা আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার হয়ে মামুজানের উপর আপনি কর্তব্য পালন করেছেন।

–আরে ভানজা, এত ফর্মালিটিজের কি আছে? আপনার আত্মীয় মানেই তো আমার আত্মীয়।

–আমি তো পরলাম না সাব্বির মামা।

–আপনি চুরি চুট্টামি করবেন কি করে? এগুলো আমাদের কাজ।

–ওমন করে বলবেন না। ছোট ছোট কাজেও অনেক সময়ে মহত্ত্ব থাকে। থাকে উদারতার স্পর্শ।

–অত করে বলবেন না। পারলে ভাইয়ার লাশ কাঁধে করে নিয়ে আসতাম। লাকসামে আমাদের পারবারিক গোরস্তানে দাফন করতাম।

এটা যে কত অসম্ভব, সে কথা বুঝে কেউ কোন কথা বলল না। কিন্তু সবার মনে একই প্রশ্ন, বেলোনিয়ার যুদ্ধ যখন শেষ হবে মামুজানের কবরের কোন চিহ্ন থাকবে না।

রোহানা শক্ত হাতে ওমরকে ধরে আছে। রাতের অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটে চলছে উল্কার মত।

–এত স্পীড দিয়েছেন কেন? রোহানা ভয় পেয়ে বলল।

www.pathagar.com

–কথা বলবেন না। জায়গাটা তাড়াতাড়ি পার হওয়া দরকার। আলামত ভাল ঠেকছে না। মনে করুন এসেছি দিনের বেলায়, সারাটা পথ যেতে হবে রাতের বেলায়।

কথা শেষ না হতেই গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। প্রথমে মনে হলো, মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে, জোর বাতাস উঠবে। কিন্তু এসব কিছু না। শুধু রাতের আকাশকে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ হতে লাগল। আগুনের ঝিলিক ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারের বুক চিরে দিয়ে। সাব্বির খান ক্ষিপ্র হস্তে হেড লাইটের আলো নিভিয়ে দিল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, নেমে পড়ুন, মাথা নিচু করে নেমে পড়ুন। গাড়ি কভার দিয়ে শুয়ে পড়ুন, কোন শব্দ করবেন না।

কানে হাত দিয়ে ওমর এবং রোহানা পাশাপাশি শুয়ে আছে। সাব্বির খানকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জানে, সে তাদের ফেলে বেশি দূরে যাবে না। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের এত কাছে ছিল কে জানতো? পাক সেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালিয়েছে তারা। প্রত্যুত্তর দিচ্ছে পাক আর্মিরাও। দুই পক্ষের গুলীর শব্দ, রকেট নিক্ষেপের ভয়াবহ বিস্ফোরণ যেন কেয়ামতের ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মাটি কাঁপছে, আকাশে আগুনের হল্কা ছড়িয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের নৈঃশব্দ খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। পাখিরা ডানা ঝাপটে উড়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে।

এই মুহূর্তগুলোতে রোহানার মনে হলো, ওমর তার এত কাছে, আবার ওমর কত দূরে, জীবনের এই বিপর্যস্ত মুহূর্তের অগ্নিময় পরীক্ষায়। ওমর তাকে ভালবাসার উষ্ণতায় ধরে নেই। ধরে আছে সতর্কতার তীক্ষ্ণ ঢালের আড়াল দিয়ে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হচ্ছে। রাতের গভীরতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভয়, আশঙ্কা এবং জীবনের অনিশ্চয়তা গাঢ় এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গুলী এবং বিস্ফোরণের শব্দ এবার থেমে থেমে হচ্ছে। বাতাসে গুলী ছুটে যাওয়ার ছরর্ ছরর্ শব্দ। অন্ধকারে চমকে দেয়া আলোর ফুলঝুরি। চোখ ধাঁধানো আলোয় কোন উজ্জ্বল তারকার সৌন্দর্য দ্যুতি নেই। বরং মৃত্যুর পূর্বে মানুষ ঘোলাটে চোখে পৃথিবীর যে আলো রশ্মির হলুদ বর্ণচ্ছটার বিভ্রান্তি দেখে ওমর ও রোহানা তাই দেখছিল। মারণাস্ত্রের এই সব ভয়ঙ্কর শব্দের মধ্যেও রোহানার ফিসফিস কণ্ঠস্বর শোনা যায়, গোলাগুলী সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।

–বিলোনিয়ার এই যুদ্ধের একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন আছে। দুই পক্ষই তাই এখন মরিয়া। ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা রাজ্যের হরিণা ইয়ুথ ক্যাম্পে যেসব বাঙ্গালী ছেলেদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ভারতীয়রা, তাদের এখানে আক্রমণে নামানো হয়েছে। ওমর কম্পিত গলায় ছোট ছোট করে রোহানাকে বোঝাতে লাগল।

পাক আর্মিরা দু'দিকে অবস্থান নিয়েছে, এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য উত্তরে, অন্য ব্যাটেলিয়ন দক্ষিণে। এরা অনেক জায়গা জুড়ে মাইন পেতে রেখেছিল, ওগুলো এখন ফাটছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছ রোহানা।

–এত বিচিত্র শব্দের মধ্যে মাইন ফাটার আলাদা শব্দ বুঝতে পারছি না। তাহলে

www.pathagar.com

কি মুক্তিযোদ্ধারা এখানে হেরে যাবে?

–না। এ ব্যাপারে বাঙ্গালী কমান্ডারদের মাথা খুব পরিষ্কার। উত্তর এবং দক্ষিণের মাঝামাঝি মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটি গেড়েছিল। এরা মাঝখানের সুবিধেজনক অবস্থান থেকে উভয় দিকের পাক সেনাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

–তুমি এত কথা জানলে কি করে?

–মামুজী বলেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেমন করে তিনি আহত হলেন। সবিস্তারে বর্ণনা দিলেন তিনি। তিনি দক্ষিণ দিকের কমান্ডে ছিলেন।

–আমি তখন কোথায় ছিলাম?

–মামুজীর জন্য খাবার তৈরি করছিলে।

–মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানকে সুবিধাজনক বলছ কেন? দুই দিকের চাপে তারা তো স্যান্ডউচড্ হয়ে যেতে পারে।

–তা হবে না। মধ্য অঞ্চলটুকু বেশ বিস্তৃত। তারা এখান থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে দুই দিকের ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করছে।

–সহজে তাহলে যুদ্ধ থামবে বলে মনে হয় না।

–আমারো তাই মনে হয়।

–ওমর, আমাকে তুমি এভাবে চেপেচুপে রেখেছ কেন? আমার কষ্ট হচ্ছে।

–হোক, গুলী তোমার গায়ে না লাগে।

–তোমার তো লাগতে পারে।

ওমর চুপ করে রইল। রোহানার চাপা কণ্ঠস্বর, ওমর তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে কভার দিচ্ছ।

–ক্ষতি কি?

–আমি একা বেঁচে থাকলেই কি আমার ভাল হবে?

–জানি না, এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা।

–বাঁচার সার্থকতা থাকা চাই ওমর। আমার কাছ থেকে সরে যাও।

ওমর রোহানার মাথার উপর থেকে নিজের মুখ ও মাথা সরিয়ে নিল। নিজের হাতের তালু দিয়ে আবার তা ঢেকে দিল।

–আঃ হাত সরাও।

–বিরক্ত হচ্ছো কেন?

–ভালবাসা ভাল, আদিখ্যেতা ভাল না।

–আমাকে ভুল বুঝে কষ্ট দিয়ো না রোহানা।

মাটির উপর মুখ চেপে ধরে রোহানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

–কাঁদছ কেন?

–একসঙ্গে বাঁচা এবং মরার কথা তুমি ভাবতে পার না কেন ওমর?

www.pathagar.com

অস্ত্রের ভয়াবহ শব্দের মধ্যেও শান্ত এবং সংযত শোনাল ওমরের কণ্ঠস্বর, রোহানা, মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু এভাবে নির্ধারিত হয় না। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর জন্য সময় এবং ক্ষণ নির্দিষ্ট থাকে।

–তাহলে আমাকে বাঁচাবার জন্য তোমার এত প্রচেষ্টা কেন?

–আমার ইচ্ছে হয় তোমার মধ্য দিয়ে আমি বেঁচে থাকি।

–দু'জনে বেঁচে থাকলেও তা সম্ভব।

–কেন যেন মনে হয়, আমার এখানে বেঁচে থাকার কোন অনুকূল পরিস্থিতি নেই।

রোহানা বলতে পারল না, তাহলে তুমি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাও। ওমর তাহলে বেশি কষ্ট পাবে।

–মামুজী তোমাকে আর কিছু বলেছেন?

–তোমাকে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে বলেছেন।

–তুমি কি বললে?

–যা সত্যি তাই বললাম। তুমি নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না।

–জবাবে মামুজী বলেন নি, তাহলে তুমি একাই চলে যাও?

–স্টুপিড, মামুজী ওরকম লোক ছিলেন না। তিনি বোম্বের একজন অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। মহিলা স্বেচ্ছায় নিজের অভিনয় পেশা ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন। মামুজী তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন, অভিনয় ছাড়লে কেন? তুমি মাঝে মাঝে বোম্বে যাও, অভিনয় কর। মামী অনড়। শেষে মামুজী বললেন, তাহলে পাকিস্তানেই অভিনয় চালিয়ে যাও। মামী তাতেও গররাজি। মামুজীকে ছেড়ে মামী একটি দিনের জন্যও কোথাও যাননি। যুদ্ধে এই তাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি। এই মামী মামুজীর মৃত্যু সংবাদ কিভাবে নিবেন তাই ভাবছি।

ওমরের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের তপ্ত বাতাসের সিরসিরানির মধ্যে রোহানা উত্তর দিল, অল্প সময় হলেও মামুজীকে আমি চিনতে পেরেছিলাম।

ওমরের হাসির শব্দ শুনল রোহানা, তাহলে মামুজী সম্পর্কে তুমি ওমন অদ্ভুত প্রশ্ন করলে কেন?

রোহানা চুপ।

–আমি জানি, কেন করেছিলে। আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে পার করে দেয়ার একটা অজুহাত খুঁজছিলে, তাই না?

–তুমি যেমন আমাকে বাঁচাবার জন্য অহরহ চেষ্টা কর, আমিও যদি তোমার ব্যাপারে একটা কিছু করতে চেষ্টা করি, অপরাধ হবে?

ওমর রোহানার মাথা নিজের বুকে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বলল, কোন অপরাধ নেই। শুধু ব্যর্থতায় কষ্ট পাওয়া। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারলে কবেই তা সম্ভব হতো।

www.pathagar.com

ওমর অনুভব করল, রোহানার চোখের পানিতে বুক ভিজে যাচ্ছে তার।

রোহানার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ওমর বলল, রোহানা, তুমি কোনদিন এমন ছিলে না। এত সহজে কখনো কাঁদনি।

–ওমর, মানুষ জীবনে দুই সময়ে কাঁদে। খুব সুখের সময়, আর বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতার গ্লানি বহন করার কষ্টের সময়।

ওমর কথা বলল না। চুপ করে গোলাগুলীর শব্দ শুনতে লাগল। একটা শেল তাদের কাছে ফাটল। মনে হলো, কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে দিল।

দু'জনে নিশ্চল। কিন্তু একজনের অস্তিত্ব অন্যজন গভীর মমতায় উপলব্ধি করছে। দুলছে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। রাতের অন্ধকার তা শুষে নিচ্ছে চোষ কাগজের মত। চোখে জ্বালা জ্বালা ভাব। রোহানার কণ্ঠস্বর শুনল ওমর, সাব্বির খান কোথায় অনুমান করতে পার?

–না।

–বেঁচে আছে তো?

–জখম হলে আর্তনাদ শুনতাম।

–দূরে থাকলে কেমন করে শুনব?

–আমাদের ফেলে রেখে সে দূরে যাবে না।

–তার নড়াচড়ার শব্দ তাহলে পাচ্ছি না কেন?

–এ সময়ে ওরকম করাটা বোকামী।

–বড় ভয় করছে, ওর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

–সেও হয়তো আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করছে।

–অথচ আমরা কত নিরুপায়।

–এই মুহূর্তে এইটেই সত্যি কথা।

–নাম ধরে ডাকব?

–না, কাছাকাছি পাক সেনা নয়তো মুক্তিযোদ্ধারা থাকতে পারে। শব্দ লক্ষ্য করে গুলী ছুড়বে।

–আমরা কে জানতে চাইবে না?

–না। অত সময় কারো হাতে নেই।

ভোর হয়ে আসছে। অন্ধকারের গায়ে ধূসর বর্ণ ফুটে উঠছে। পূব দিকে ফিকে আলোর আবছা আবছা রূপ। কি সুন্দর এই দৃশ্য। আকাশের বুকে প্রথমে ফুটে ওঠে আলোর সাদাটে স্পর্শ। তারপর সূর্যোদয়ের সোনালী রং উজ্জ্বলতা মাখিয়ে দেয় সেই সাদা রংয়ের উপর জরির ফিতের মত। এর সংগে মেশে লাল্‌চে রং। তিনটি রংয়ের সমন্বয়ে পূব আকাশের বুক বধূ বরণের মত লাজুক ভাব নিয়ে কোমল হয়ে ওঠে। অন্ধকার বিদায় নেয় আলোর হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে।

www.pathagar.com

গোলাগুলী থেমে থেমে চলছে। এক ফাঁকে মাথা উঁচু করে রোহানা। দীর্ঘ সময়ের অন্ধকার তার চোখে যেন ধূসর বর্ণের ঝাপসা পর্দা টানিয়ে দিয়েছে। চোখ রগড়ে সেই আবছা আবছা অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করে। কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে এবং গাছপালায় এখনো পাতলা অন্ধকার লেপটে আছে। নিশাচর পাখির ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ নেই, ওগুলো বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সরে পড়েছে দূরে। এই যুদ্ধ ফ্রন্ট হট্টগোলের মধ্যেও বিষণ্ন এবং সময়ের চাপে ক্লিষ্ট। আজানের শব্দ নেই। ধারে কাছে গৃহস্থ বাড়ির মোরগের কুক কুরু কুউ স্বরে সুরেলা আওয়াজ নেই। এমন কি ভয়ার্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে শেল ফাটার শব্দ বিষণ্নতার বুকে চিড় খাইয়ে ভীতিপ্রদ অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে তুলছে।

রোহানার কণ্ঠস্বর নিঃশব্দতাকে ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠল, সাব্বির খানকে এখনো দেখতে পাচ্ছি না।

–আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলে দেখতে পাবে।

–ততক্ষণে আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। ওমর, আমাদের তিনজনের নিরাপত্তা এখন একই সূতোয় গাঁথা। তুমি কি গাড়ির ওপাশটায় একবার দেখবে?

–চেষ্টা করি।

–হামাগুড়ি দিয়ে যেয়ো। চল আমিও আসি।

–খামাখা কেন বিপদ বাড়াতে চাও?

রোহানার হাসির শব্দ ভেসে এল, গাড়ির এপাশটা নিরাপদ এমন ভাবছ কেন?

দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে এ পাশে এসেই ভয়ার্ত চিৎকার দিল, সাব্বির মামা।

–মাত্ ডরো বেটি। ম্যায় আভিতক জেন্দা হো।

–তুমি ভাল আছ?

–হ্যাঁ বেটি।

–কিন্তু তোমার শরীর এত ভিজে কেন? তুমি এত ঘেমেছ কেন?

সাব্বির খান চুপ।

–আমার হাতে চটচটে কি লাগছে এসব? মামা তুমি কি আহত হয়েছ?

–হাঁ বেটি।

–কোথায় লেগেছে?

–মনে হয় পাঁজরে।

–তুমি আমাদের ডাকনি কেন মামা?

–ডাকলে তোমাদের বিপদ হতো। গায়ে গুলী লাগতে পারতো। এতক্ষণ তো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসছিল।

–মামা তুমি উঠতে পারবে?

–মনে হয় না। তোমরা কেউ গাড়ি চালাতে পার?

www.pathagar.com

–না।

–তাহলে সামনে আরো বিপদ। মুক্তিযোদ্ধারা ধেয়ে এল বলে। এরা জিতেছে। পাক সেনারা কুমিল্লার দিকে পালিয়েছে।

–তুমি জানলে কি করে?

–আমার বোধশক্তি প্রখর বেটি। কোন পক্ষ কি ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করেছে বুঝতে পেরেছি। পাক সেনাদের আক্রমণ সম্পূর্ণ থেমে গেছে। এখন শুধু মুক্তিযোদ্ধারা সতর্কতামূলক গুলী করছে।

–তাহলে চিন্তার কারণ নেই। ওরা আমাদের সাহায্য করবে।

–কেন করবে বেটি। যদি জিজ্ঞেস করে, এখানে কেন এসেছিলে, কি জবাবা দেবে?

–সত্যি কথা বলব।

–এতে ওমর বাবাজী বিপদে পড়বে। আমার কথা না হয় বাদই দিলাম।

রোহানা কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি ঠিক বলেছ মামা। সত্যি কথা বলা যাবে না। সাংবাদিক হিসাবে আমরা যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলাম, তাই বলব।

–খুব কি গ্রহণযোগ্য হবে? ওমর সংশয় প্রকাশ করল।

–আমার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দাও, আমি সব ম্যানেজ করব। তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনা নেই, চমৎকার বাংলা বলতে পার। মামা তুমি চুপ করে থেকো। তুমি গুরুতর আহত, তোমার কথা বলার দরকার নেই।

–আচ্ছা বেটি, যো হুকুম।

ভোরের আলো ভাল করে ফুটে উঠতেই রোহানা এবং ওমর দেখল, সাব্বির খানের আহত স্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। বাঁ দিকের মাটি রক্তে থক্ থক্ করছে। রোহানার পরণে একটাই শাড়ি। বাড়তি শাড়িটা নোংরা, কাদায়–রক্তে লেপটানো, ধোয়ার সময় হয়নি। রোহানা অসহায় ভাবে তাকাল ওমররের দিকে।

ওমর বলল, ফ্লাস্কে চা আছে, ধুয়ে দেব?

–যদি ক্ষতি হয়।

–অত চিন্তা করলে রক্ত বন্ধ করা যাবে না।

শাড়ি ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল রোহানা। ব্যাগে ছোট একটা কাঁচিও পাওয়া গেল। ট্রেন এ্যাকসিডেন্টে আহতদের ব্যান্ডেজের গজ কাটার জন্য কোন ভলান্টিয়ার তাকে দিয়েছিল। ফেরৎ দিতে মনে নেই। ব্যান্ডেজ কিছুক্ষণের মধ্যে ভিজে উঠল। আবার নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল রোহানা। ওমরকে বলল, মামুর গোঁফটা একটু ছোট করে ছেঁটে দাও। বিষাদময় হাসি হাসল সাব্বির খান, দাও বেটি, এত বছর এখানে থেকেও যখন বাঙ্গালী হতে পারলাম না, তখন গোঁফ ছোট করে যদি হতে পারি।

www.pathagar.com

–মামা, তুমি মনে কষ্ট পেলে?

–না বেটি, সময়ে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।

–মামা তোমাকে আমরা ভালবাসি।

–জানি।

ভোরের আলো ফুটল। সোনালী আলোয় ভরে গেল চারদিক। রণাঙ্গন শান্ত। ভয়াবহ নিথর ভাব, অসহ্য। সাব্বির খানের ব্যান্ডেজ বাবরার ভিজে উঠছে। কিন্তু সাব্বির খানের কণ্ঠে কোন কাতরোক্তি নেই, শুধু অনুশোচনার আক্ষেপ, বেটা তোমাদের আমি জায়গা মত পৌঁছে দিতে পরলাম না।

ওমরের চোখে পানি, মামু তোমার কোন দোষ নেই, এ আমাদের তক্‌দিরের লিখন। আমাদের এখন একটাই ভাবনা, তোমাকে চিকিৎসা করানো।

–বেটা আমি এখন চিকিৎসার বাইরে।

–এমন কথা বলো না মামু। রোহানা চারদিক ঘুরে দেখতে গেছে যদি কাউকে পাওয়া যায়।

–ওকে পাঠিয়ে ভাল করনি বেটা।

–আল্লাহ্ ভরসা। ও সিচুয়েশন ট্যাকল করতে পারবে।

–আমি ওর জন্য ভাবছি না, বড় মজবুত দিলের মেয়ে। আমি তোমার কথা ভাবছি।

–আমার জন্য? কেন মামু, বিস্ময় ওমরের কণ্ঠে।

–এখন যদি মুক্তি ফৌজ এ দিকে আসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। বেটা আল্লাহ্ পাকের দেয়া চেহারা বদলানো যায় না। তোমাকে এক নজর দেখেই আমি বুঝেছিলাম তুমি বাঙ্গালী নও। তুমি যা ছিলে তাই আছ।

ওমর গভীর চিন্তায় মগ্ন। মামুর জবান বাংলা উর্দু মেশানো জগা খিচুড়ি। চেহারা অবিকল বিহারী। এ অবস্থায় মুক্তি ফৌজ এসে পড়লে তাদের দু'জনের কাউকেই রেহাই দেবে না।

ওমরের মন নিজের অজান্তেই অতীতে ফিরে গেল। ময়মনসিংহের ই.পি.আর ক্যাম্প। আন্দোলনের তখন প্রথম পর্যায়। যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি। বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী দু'দলই ক্ষেপে আছে একে অপরের উপর। একদিন আগে ডি.সির অফিসে মিটিং হয়ে গেল উভয় পক্ষের নেতাদের নিয়ে। কেউ কাউকে অযথা আক্রমণ করবে না। শহরে শান্তি এবং শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। এই শর্তে উভয় পক্ষই রাজি। ই.পি.আর-এর কমান্ডার, রাজনৈতিক নেতারা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। দি শাইনিং স্টারের পক্ষ থেকে ওমর বাটও ছিল। সেই দিনের শেষ রাতেই প্রচন্ড গোলাগুলীর শব্দ। সার্কিট হাউজের স্প্রিংয়ের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল ওমর। গুলীর শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ল। মনে হলো, খুব

www.pathagar.com

কাছে গুলী হচ্ছে।

বেলা আটটায় থেমে গেল গুলীর শব্দ। ওমর রাতের পোষাক বদলে বাইরে বের হয়ে এল। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার কথা মনে হলো না। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। থমথমে ভাব। তবে এখানে সেখানে লোকজন জটলা পাকিয়ে উত্তেজিতভাবে কি সব আলোচনা করছে। ওমর একে ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, কেউ কোন কথার উত্তর দিল না। সবার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

হঠাৎ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ওমর। সে বাঙ্গালী নয়, এই প্রথম মনে হলো তার। সে সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনল। দোকানী ভাংতি দিতে না পারায় পুরো টাকাটা দিয়ে দিল তাকে। লাইটার পকেটে ছিল না। দোকানে টানানো দড়ির মাথা থেকে আগুন ধরিয়ে সিগারেট টানতে টানতে গত রাতের গুলীর ঘটনা জানতে চাইল ওমর।

দোকানীর কণ্ঠে বিস্ময়, কোহান থাইকা আইছেন জনাব, কোন খবর রাহেন না?

বিপজ্জনক আলামত টের পেল ওমর। বিনীত কণ্ঠে বলল, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখার দরকার কি?

এসব কথায় কান দিল না দোকানী। সে ভাল শ্রোতা পেয়েছে। অতএব গল্পের দুয়ার খুলে দিল, শালার পাঞ্জাবীদের খতম কইরা দিছে আমাদের জোয়ান ছাওয়ালরা।

–পাঞ্জাবীদের পেল কোথায়?

–ক্যান, ই.পি.আর ক্যাম্পে? এক শালাকেও রেহাই দেয় নাই। ইন্দুরের বাচ্চার মত খেলাইয়া খেলাইয়া মারছে।

ওমরের আর শুনতে ইচ্ছা হলো না। পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কিনে রওয়ানা দিল ই.পি.আর ক্যাম্পের দিকে। সবার চোখে রহস্যময় কৌতুক এবং মুখে উত্তেজক আলোচনা।

লোকাল কাগজের ক্যামেরাম্যানরা ক্লিক ক্লিক ফটো তুলছে। দেয়ালগুলো অসংখ্য গুলীতে ঝাঁঝরা। ই.পি.আরদের সীমিত অস্ত্র এবং গোলাবারুদে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সারেন্ডার করেছিল। তখন বাঙ্গালীরা ভেতরে ঢুকে ব্রাশফায়ার করে সবাইকে শেষ করে ফেলেছে। এ সবের মধ্যেও একটা গল্পের জন্ম হয়ে গেল। লোকজন বলাবলি করছে, কেউ হাসাহাসি করছে, শালা বাবুর্চি হাতজোড় করে বারবার বলছিল, মুঝহে মাত্ মার ডালো। মেরা কিয়া কসুর হ্যায়? ম্যায় তো গরীব আদমী হ্যায়। কিচেন মে সেরেফ খানা পাকাতা। ম্যায় কোই কসুর নেহি কিয়া।

পায়ে গুলী খেয়েও লোকটির বিলাপ থামেনি, মেরা ঘরমে বুড্ডা আম্মি হ্যায়, বহু, পাঁচ লাড়কা লাড়কি। মুঝকো মার ডালনে ছে ওলোগ কো কিয়া হালত হোগা, মুঝকো বাঁচাইয়ে বাবুজি। হাসাহাসি করছিল আক্রমণকারীরা, শালা তোমার বউঝিদের কি হবে সে ভাবনা তোমাদের ইয়াহিয়া খানের। গোল্লায় যাও।

www.pathagar.com

গুলীর শব্দ হলো। তখনো বাবুর্চির হাত জোড় করা, বাঁচাও বাবুজি বাঁচাও, মেরা কই কসুর নেহি হ্যায়। দু'চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে। দাড়ি থেকে পানি ঝরছে টপ টপ টপ। মনে হচ্ছে এইমাত্র ওকে কেউ জমজমের পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিয়েছে।

ট্রাক বোঝাই করে পাক সেনাদের সব লাশ ব্রহ্মপুত্র নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। সার্কিট হাউজের বাবুর্চি দুপুরের খানা দিতে এসে ওমরকে এসব কথা জানাল। লাশগুলো ট্রাকে এমন চাপাচাপি করে রাখা হয়েছিল যে কারো হাত, কারো পা বাইরে ঝুলেছিল। ফর্সা, বলিষ্ঠ, সুন্দর হাত পা। রক্ত জমে নীল হয়ে গেছে। খাকি ড্রেসে রক্ত মাখামাখি। বাবুর্চি রহিমের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে।

–তুমি কাঁদছ কেন? ওরা তো তোমার জাত ভাই বাঙ্গালী না, জিজ্ঞেস করে ওমর।

–সাহেব ওরা তো মুসলমান।

–শত্রুর আবার জাত ধর্ম কি?

–সাহেব, নজর খান আমার জন্য যা করেছে তা কেউ করবে না।

–কে নজর খান?

–বাবুর্চিটির নাম। এই যে এখানে যাঁরা আসেন, আমার পাকানো খানার প্রশংসা করেন, সবই তো নজর খানের কাছ থেকে শেখা।

–তুমি বাঙ্গালী মানুষ, অবাঙ্গালীদের রান্না শিখতে গেলে কেন?

–সাহেব বিরিয়ানী, মোসাল্লাম, মোগলাই পরোটা, কাবাব সবই তো মোগল পাঠানদের কাছ থেকে বাঙ্গাল দেশে এসেছে।

–তুমি দেখছি ইতিহাসের অনেক কিছু জান।

–সাহেব আমি গরীব অশিক্ষিত মানুষ। ইতিহাস, রাজনীতি কিছুই জানিনে। শুধু এইটুকু জানি, বুঝি, মানুষ মানুষকে মায়া–মমতা করবে, ভালবাসবে।

–তোমার মত সবাই যদি হতো রহিম মুন্সী, ওমরের কণ্ঠ বিষণ্ন শোনাল।

রহিম মুন্সীর কণ্ঠ আবেগে ভারি, শুধু রান্না শেখা নয়, কত যে খেয়েছি নজর খানের বাবুর্চি খানায়, মুরগীর রোস্ট, কাবাব, পোলাও, বিরিয়ানি, রেজালা, দই বড়া, দিল্লীকা নিহারী, তার ইয়ত্তা নেই। একদিন বললাম, নজর খান, এ রকম চুরি করে খাওয়ানো কি ঠিক?

–তওবা, তওবা, নজর খান গালে হাত দিল, চোরি হবে কেন, সাহেবদের পারমিশন আছে, আমার কোন রিস্তাদার এলে আমি তাকে খাওয়াতে পারব।

–আমি তোমার কোন রিস্তাদার নই।

–আরে ভাইয়া, এ্যায়সা মাত্ বলো। রিস্তাদার কি গাছে গজায়, নাকি জমিন ফুঁড়ে বের হয়? দীলে দীলে মহব্বত হলেই রিস্তাদার হয়।

–আমার তবু ভয়, কমান্ডার সাহেব যদি জানেন, কিছু বলেন, তাহলে তোমার

www.pathagar.com

এখানকার নোকরি যাবে আর আমার যাবে সার্কিট হাউজের চাকরি।

—ডরো মাত্। সাহেব আমাকে যত খুশি যখন খুশি খেয়ে নিতে বলেছে। তো মনে কর, আমার ভাগটাই তোমাকে দিলাম।

—তুমি তাহলে উপোস করে থাকবে?

—উপোস করব কেন? সাহেবদের খাওয়া হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকে তাও অনেক। তখন খেয়ে লিব। এসবের কোন হিসাব নেই। সাহেবের কথা হলো, যত খুশি খাও, লও, মগর খানা আচ্ছা হোনা চাহিয়ে। অবাক হলাম, বলে কি নজর খান, আমাদের সার্কিট হাউজে এক মুঠ ভাতেরও হিসেব আছে। যদি কোনদিন কিছু বাঁচে তার ভাগাভাগি নিয়ে কি ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি, কাড়াকাড়ি, চৌকিদার, বেয়ারার, নাইট গার্ড, এমন কি জমাদারেরও হিস্যা থাকা চাই।

—কিয়া শোচ রহে হো রহিম ভাইয়া?

—না না, কিছু না, মনের ভাব চাপা দিয়ে রাখলাম।

তা একদিন কমান্ডার সাহেব দেখেই ফেললেন, আমার পাতে পোলাউ আর রোস্টের স্তুপ। ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম, সালাম দিলাম।

—আরে আরে মাত্ ওঠো। খানেকে ওয়াক্ত এইস্যা করনা ঠিক নেহি হ্যায়।

নজর খান আমার পরিচয় দিল।

খুশি কমান্ডার সাহেব, বললেন, নজর খান, মেহমান কো পেট ভরকে খানা খিলাও। কই গাফলতি মাত করো, ইনাম দেও, বলে দশ টাকার একটা নোট টেবিলের উপর রাখলেন।

—আচ্ছা রহিম মুন্সী, ম্যায় আভি যানা হো। তুম শরমাও মাত্। তোমহারা দোস্তকা পাস যেত্না খুশি আ যাও।

রহিম বাবুর্চি কথা শেষ করে ওমরের সামনে ডুককে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

—রহিম এমন করলে তুমি নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

—কেন সাহেব, কাঁদতেও কি মানা?

—হ্যাঁ। তুমি ওদের জন্য কাঁদলে বাঙ্গালীদের কাছে শত্রু বনে যাবে। তোমাকে মেরে ফেলবে।

—বলেন কি সাহেব, মানুষ তার ভাই–বেরাদরের জন্য কাঁদবে না?

—এখন আর ভাই-বেরাদর নেই। ভাল চাও তো মুখ বন্ধ রাখ।

—তাহলে তো আপনারও বিপদ সাহেব।

—আমি আজই চলে যাব।

—স্টেশনে একা যাবেন না, বাইরে নানা রকম জট্‌লা হচ্ছে।

—যেতেই তো হবে।

—আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

www.pathagar.com

–কেন নিজের বিপদ বাড়াবে?

–আমার সন্তান হলে তাকে কি আমি বিপদের মুখে একা ছেড়ে দিতাম?

–রহিম মামা, তোমার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে। ভয় পেয়ো না। সন্ধ্যার পরে ডি.সি.–র গাড়ি আসবে। আমি ওতে চড়ে যাব।

–আলহামদুলিল্লাহ, আপনার জান-মাল হেফাজত হোক।

গাড়ি এল না। ওমর ফোন করল সার্কিট হাউজ থেকে। ডি.সি. বাংলোতে নেই, অফিসেও নেই। তার পি.এ. জবাব দিল, সরি, গাড়ি দেয়া সম্ভব না। শহরে উত্তেজনা, সরকারি গাড়ি রাস্তায় বের করার হুকুম নেই।

–ডি.সি. সাহেব কথা দিয়েছিলেন।

পি.এ ফোন ছেড়ে দিল। রিক্সা করে একাই বের হলো ওমর। একটু পরেই দেখল, অন্য এক রিক্সায় রহিম মুন্সী পেছন পেছন আসছে। যেখানে যেখানে লোকজনের জটলা দেখছে, চিৎকার করে বলছে, ওরে ভাগ্নে রাগ করে চলে যাসনে। বুড়ো মামুটার দিকে ফিরে চা। আচ্ছা যা, আজকালকার ছেলে-ছোকরা, মুরুব্বিদের কথা তো আর শুনবি না। তবে তোর মা, অর্থাৎ আমার বোনটার দিকে একটু খেয়াল রাখিস।

রাস্তার লোকজন মামা ভাগ্নের মান-অভিমান দেখে হাসাহাসি করছে। বলাবলি করছে, ছোকরার বেশ ভূষা দ্যাখো লাট বাহাদুরের মত। চোখে আবার সান গ্লাস, তাও এই সন্ধ্যায়। এদিকে মামুর পরণে লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবী। ছোড়াটাকে ধরে দেব নাকি ধোলাই?

–আরে বাদ দাও। ছোটলোকদের ব্যাপারে নাক গলিয়োনা। আমাদের হাতে এখন অনেক বড় কাজ। ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করার দরকার নেই।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় ওঠে ভেতর থেকে দরজা লক্ করে দিল ওমর। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল। প্ল্যাটফরমের ম্লান আলোয় রহিম মিয়ার মুখ অস্পষ্টভাবে ভেসে আছে। ওমরের চোখের পানিতে জানালার কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না।

বর্তমানে ফিরে এল ওমর বাট। আজ এমন কোনো রহিম মুন্সী আছে কি, যে মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে এবং সাব্বির খানকে বাঁচাবে? দূরে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখানকার মাঠ ঘাট, রাস্তা সব অসমতল। গাড়িটা যেন ঘেঁষতে ঘেঁষতে এগুচ্ছে। সাব্বির খানের কণ্ঠ, আওয়াজ মালুম হোতা হ্যায়?

–হ্যাঁ।

–শত্রু না মিত্র?

–আমাদের এখন শত্রু মিত্র নেই। সব কিছু ভাগ্যের উপরে নির্ভর করছে।

–একটা কথা বলব বেটা?

–বলুন।

–আমাকে এখানে রেখে তোমরা দু'জন গাড়ি নিয়ে চলে যাও। তোমার গাড়ির

www.pathagar.com

পার্টস সম্বন্ধে ধারণা আছে?

–আছে।

– আমি বলে দিচ্ছি। তুমি ট্রায়াল দাও।

–ঠিক আছে, চেষ্টা করি। এখানে তিলে তিলে নিঃশেষ হওয়ার চেয়ে পথে যদি এ্যাকসিডেন্ট হয়ে মরি তাও ভাল।

–বেটা, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

গাড়িতে উঠে বসল ওমর। গাড়ি দু'চার বার দুলে উঠল, ঘড়ঘড় করে একটু এগোয় আবার পিছোয়। সাব্বির খান দুর্বল কণ্ঠে নির্দেশ দিতে লাগল, ক্লাচ্, গীয়ার, স্পীডোমিটার, এ্যাকসিলেটর, স্টিয়ারিং হুইল, এর এই কাজ, ওর এই কাজ। ক্লাচে চাপ দাও বেটা, গীয়ার সামনের দিকে এগিয়ে আনো, শক্ত হাতে হুইল ঘোরাও ইত্যাদি।

পনের মিনিটের মধ্যে গাড়ির পূরো নিয়ন্ত্রণ হাতে এল ওমরের। গাড়িতে সে একেবারে কোনদিন হাত দেয়নি এমন না। সেই ছেলেবেলায় পিতাজীর সরকারি জীপে চড়ে বালক ওমর নওয়াবপুরের উর্দু স্কুলে যেত। ড্রাইভার কলিম খান কেমন শক্ত এবং দৃঢ় হাতে জীপ চালাত, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত বালক ওমর। কৌতূহল এবং আগ্রহ তার দুই চোখে অদম্য ইচ্ছার জন্ম দিল। কলিম খানকে ধরে বসল, তাকে জীপ চালানো শেখাতে হবে।

কলিম খানের বিস্ময়, এতনা ছোটা লারকা ক্যায়সে জীপ চালানে সাক্‌তা।

–জরুর চালানে সাক্‌তা।

–নেহি পিয়ারে বাচ্চা। এ্যাকসিডেন্ট হো যায়েগা। তোমহারা পিতাজী বহুত গোস্‌সা হোগা।

–পিতাজীকো মাত্ বল্‌না।

–হা নসিব, ঝুট বাত ক্যায়সে বলেঙ্গে।

–ঝুট ওউর সাচ্ বাত কুচ্ নেহি বলো।

–আচ্ছা সমঝ্ গিয়া। ঠিক হ্যায় বেটা, ময়দান মে প্রাকটিস করেগা যব তোমহারা পিতাজী বাহার যায়েগা।

তাতেই রাজি ওমর। তখন সে ক্লাস সেভেনের ছাত্র, বয়স এগারো বছর। তখন তার গাড়ি চালানোর হাতে খড়ি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই কেমন করে যেন পিতাজীর কানে কথাটা গেল। সেই যে তিনি গাড়ির চাবি পকেটস্থ করলেন আর কখনো কলিম খানের হাতে দেননি। কলিম খানের কপালে করাঘাত, হ্যায় খোদা, মনিবকা পাস ম্যায় বেঈমান বন্ গিয়া।

ভ্যান এগিয়ে আসছে। পুরনো এবং নড়বড়ে। ড্রাইভিং সীটে একজন মুক্তিযোদ্ধা, পাশে রোহানা। রোহানা নির্লিপ্ত মুখে ওমর এবং সাব্বির খানের পরিচয় দিল। ক্যাপটেন আহসান হাত বাড়িয়ে দিল ওমরের দিকে। ভেতরে ভেতরে বিস্ময়কর অনুভূতি ওমরের।

www.pathagar.com

রোহানা নাম ধাম পেশা কিছুই লুকোলো না। ক্যাপটেন আহসান বলল, আমি শাইনিং স্টার দৈনিক পড়তে পছন্দ করতাম। আপনার প্রতিবেদন খুব ভাল হতো।

–ধন্যবাদ, ওমর বলল। রোহানার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করল ওমর, পাতানো স্বামী–স্ত্রীর সে পরিচয় দেয়নি। আসল পরিচয় প্রদানের ঝুঁকি সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাব্বির খানের দিকে ক্যাপটেনের সন্দিহান দৃষ্টি ওমরের আনন্দ ঝড়ের ঝাপ্টায় উড়িয়ে দিল।

–আপনাদের একবার আমাদের হাইকমান্ডের অফিসে যেতে হবে।

–কেন বলুন তো?

–আপনারা এদিকে কেন এসেছিলেন তা আমাদের অফিসকে জানাতে হবে।

বিপদের গুরুত্ব বুঝাতে পেরে রোহানা উত্তর দিল, আমি আগেই বলেছি, আমরা যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলাম।

–ওমর বাট এখন সাংবাদিক নেই। কাগজটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে।

–উনি আমার দর্শন পত্রিকায় কাজ করছেন।

–আপনার দর্শন পত্রিকা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। আপনি মিত্রশক্তির প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সমর্থন করছেন না।

–মিঃ আহসান, সাংবাদিক হিসাবে আমি যা সত্য ভেবেছি তাই তুলে ধরছি। নিরপেক্ষ এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া সাংবাদিকের ধর্ম।

–যুদ্ধের সময়ে আপনাকে স্বদেশের পক্ষ নিতেই হবে।

–আমি স্বদেশের পক্ষেই আছি। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আমি আপোষহীন। আমার দেশ নীতি সঠিক নিচ্ছে না ভ্রান্ত নিচ্ছে তা বলা আমার নৈতিক দায়িত্ব। আচ্ছা বি.বি.সি., ভোয়া, রয়টার কত সংস্থা কত রকম খবর পরিবেশন করছে তাদের ব্যাপারে আপনারা কিছু বলছেন না, অথচ আমার ব্যাপারে মারমুখী।

–এগুলো বিদেশী সংস্থা।

–দেশী সংস্থার স্বাধীন সত্তা থাকবে না, এ কথা কে বলল?

–কথাগুলো আমাদের মেজর সাহেবকে বোঝাবেন।

–জনে জনে বোঝানো আমার দায়িত্ব না।

–বোন আপনার ভালোর জন্যই বলছি। গতকাল থেকেই আমাদের পেট্রোল পার্টি আপনাদের উপর নজর রাখছে।

ওমর মরিয়া হয়ে বলল, এই আহত লোকটা কি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?

–আমাদের ক্যাম্পে এসে দেখুন, কত আহত মুক্তিযোদ্ধা উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কাতরাচ্ছে।

–আপনাদের ক্যাম্পে ডাক্তার নেই?

–আছে, তবে চিকিৎসা সরঞ্জাম পর্যাপ্ত নেই। ব্লাড দরকার, জটিল অপারেশনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা থাকা দরকার, তা নেই।

–যুদ্ধে আপনাদের জয় হয়েছে। আপনারা কি এখন অন্য ফ্রন্টে অথবা হেড কোয়ার্টার্সের দিকে ফিরে যাবেন না?

–এসব টপ্‌ সিক্রেট ব্যাপার, জিজ্ঞেস না করাই ভাল।

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে সাব্বির খানকে গাড়ির পিছনের সীটে উঠিয়ে দিল। সামনে ওমর ও রোহানা। পিছন পিছন আসছে মিলিটারি ভ্যান।

ফিস্‌ফিস করে বলল রোহানা, তুমি গাড়ি চালাতে পার আগে বলনি কেন ওমর?

–চালাতে জানতাম না। এই মাত্র শিখেছি।

–হাউ ইজ ইট পসিবল?

–সাব্বির মামা বুদ্ধিটা দিয়েছে। তার ডিক্‌টেশন মত বারবার ট্রায়াল দিয়ে কৌশল রপ্ত করেছি।

–এই বুদ্ধিটা আগে কেন হলো না? তাহলে ওদের ফাঁদে পা দিতাম না।

–এর কোন ব্যাখ্যা নেই রোহানা। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

–এখন কি হবে?

–ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

–যদি তোমাকে এবং সাব্বির মামাকে আটকে রাখে?

–রাখতে পারে।

–এখান থেকে পালানোর বুদ্ধি বের করতে পার?

–না, ওরা গুলী করবে।

একটানা ছয় ঘণ্টা গাড়ি এবং ভ্যান চালিয়ে তারা এসে পড়ল একটা লম্বা টিনের ঘরের সামনে, সামনে মাঠ।

–কোথায় এলাম, জিজ্ঞেস করতে পারি? সসংকোচ প্রশ্ন ওমরের।

–এটা পরশুরাম স্কুল।

গাড়ির পেছনে তাকাতেই ওমর চমকে উঠল। রোহানার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনাল। সাব্বির খানের হাত ঝুলে আছে সীটের পাশে। ব্যাণ্ডেজ খোলা। রক্তে সব একাকার।

ওমর এবং রোহানা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকাল, মুখ বিবর্ণ এবং রক্তহীন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বেশ কষ্ট করেই সাব্বির খান ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলেছে। রক্ত ছুটেছে তীরের মত। একটু উঃ আঃ করেনি, পাছে তারা টের পায়। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করেছে। কেন এই আত্মহনন, তা দুর্বোধ্য নয়।

বুক ফেটে কান্না আসল রোহানার, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, মামা, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তুমি এই করেছ? যুদ্ধের দুঃসহ সময়ে কেউ কি কাউকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে? কেন তুমি এমন করলে মামা?

www.pathagar.com

–ক্যাপটেন আহসান বলল, দি সাস্‌পেক্‌টেড পার্সন ইজ ডেড।

আগুন ছুটল রোহানার চোখ দিয়ে, দি মোস্ট ইনোসেন্ট পার্সন ইজ ডেড ফর আওয়ার নেগলিজেন্স।

ক্যাপটেন আহসান কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রোহানার দিকে, কিছু বলল না। লাশ নামিয়ে স্কুলের বারান্দায় রাখা হলো। ওমর এবং রোহানা একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটাকে দেখে মনে হলো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অফিসের ঘর। কাঁচের আলমারিতে বই ঠাঁসা। সব টেক্সট বুক। দেয়ালে ওয়ার্লর্ড ম্যাপ ঝুলছে। রিভলভিং চেয়ারে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সৌজন্যমূলক সালাম বিনিময় হলো।

–আমি মেজর ইব্রাহিম।

–মনে হচ্ছে ইনটারোগেশন করবেন।

–কতকটা তাই।

–যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে এসেছি এটা কি অপরাধ সাংবাদিকের জন্য?

–আমাদের হাইকমান্ডের অফিসে জানিয়ে রাখলেই পারতেন।

–জানানো কি সম্ভব?

–পাক আর্মি কমান্ডকে তো জানিয়েছিলেন।

–কেমন করে বুঝলেন?

–আপনাদের ড্রাইভার নামক ব্যক্তিটি পাক আর্মিদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিল।

–তাতে কি প্রমাণ হয় আমরা পাক আর্মিদের সঙ্গে জড়িত?

–আপনাদের লোক ওখানে প্রবেশাধিকার পেল কি করে?

–ও যদি আমাদের অনুপস্থিতিতে ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে থাকে সে দায়িত্ব আমাদের না। আমরা তখন ওদের ক্যাম্প থেকে এক কিলোমিটার দূরে ছিলাম। এই দেখুন ওর পরিচয়পত্র। ও জাতে বিহারী।

খুব মনোযোগ দিয়ে মেজর ইব্রাহিম সাব্বির খানের পরিচয় পত্র দেখলেন। জন্ম পাটনায়। পিতা মরহুম মাহমুদ খান।

–একে আপনারা কোথায় পেলেন?

লাকসামে আমাদের এক ব্যাবসায়ী বন্ধুর ড্রাইভার। আমাদের অনুরোধে গাড়ি এবং ড্রাইভার দিয়েছিলেন।

–বন্ধুর নাম ঠিকানা বলুন।

ওমর কাল্পনিক নাম ঠিকানা বলল।

রোহানা মনে মনে উদ্বিগ্ন। ওমর মিথ্যাবাদিতা ঘৃণা করে। কিন্তু রোহানার নিরাপত্তার জন্য নিঃসঙ্কোচে এতগুলো মিথ্যা বলল। একজন বাঙ্গালী মেয়ে একজন আহত পাক অফিসারকে দেখতে যাবে এটা এরা সহজভাবে কিছুতেই নেবে না। এমনকি কেরামত মণ্ডলের নামও উল্লেখ করেনি। করলে পরিবারটি মুক্তিযোদ্ধাদের রোষে পড়বে। উপকারী বন্ধুর অপকার করা যায় না। মানুষগুলো বড় ভাল।

এই মুহূর্তে ওমরকে আদর করতে ইচ্ছা করল রোহানার। মনে মনে বলল, ওমর, আমার জন্য তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠাকেও বিসর্জন দিলে?

www.pathagar.com

–ঠিক আছে, আপনারা যান। সাব্বির খানের পরিচয়পত্র আমার কাছে থাক।

–আমরা কি লাশ নিয়ে যেতে পারব?

–না। আপনাদের আমি বিশ্রাম নিতে বলেছি। ক্যাপটেন আহসান আপনাদের ঘর দেখিয়ে দেবেন।

–লাশের কি হবে?

–আপাতত ওখানেই থাকবে।

–একজন মুসলমানের লাশ এভাবে পঁচবে?

–ব্রাদার, আরো কত মুসলমানের লাশ এভাবে পঁচছে। আমি এখন ওয়ারফিল্ডে যাব পাক আর্মিদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তার খোঁজ করতে হবে।

–আমরা কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?

একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন মেজর ইব্রাহিম। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, যেতে চাইছেন কেন?

–পাক আর্মিদের ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য।

–সে বিবরণ তো আমার কাছেও পেতে পারেন।

–কারো মুখের কথায় সাংবাদিকরা রিপোর্ট করে না। স্বচক্ষে দেখে।

–সঙ্গে ক্যামেরা আছে?

–আছে।

–জমা দিয়ে যান। ছবি তুলতে পারবেন না।

–কেন? শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি দেখাতে পারলে তো আপনাদের কৃতিত্ব বাড়বে।

–আপনারা যেমন আমাদের বিশ্বাস করেন না, তেমনি আমরাও আপনাদের করি না। কোন ফাঁকে আমাদের আহত নিহতদের ছবি তুলে ফেলবেন।

–ক্ষতি কি?

–যুদ্ধের কতগুলো টপ্ সিক্রেট ব্যাপার আছে। ওগুলো প্রকাশ হলে শুধু আর্মিদের মনোবল ভাঙ্গে না, জনসাধারণেরও মনোবল ভেঙ্গে যায়।

–তেমন ঘটনা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় এখনো ঘটেনি।

–ধন্যবাদ। তবে সব সময় সাবধান থাকতে হয়।

ওমর তার কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে জমা দিয়ে দিল। ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের ফিল্ম সে আগেই সরিয়ে রেখেছিল।

বেলোনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য রোহানা জীবনে কোনদিন ভুলবে না। এত করুণ, বিষায়ময় এবং রক্তাক্ত। সারা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে পাক সেনাদের মৃতদেহ। মুভিতে দেখা পার্লহারবারের দৃশ্য ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। নিহত এবং আহত সৈন্যদের ছড়াছড়ি। শত্রুপক্ষ আহতদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে রাইফেলের কিরিচ দিয়ে। ভেসে উঠছে মরণ চিৎকার। এর মত অমানবিক যুদ্ধ দৃশ্য রোহানা চৌধুরী আর কখনো দেখিনি। রোহানা কথাটা বলেও ফেলল সবার সামনে।

www.pathagar.com

গম্ভীর কণ্ঠস্বর মেজর ইব্রাহীমের, আমরা কাউকে খুঁচিয়ে মারতে আসিনি। ওদের যারা আহত হয়েছে তাদের ওরা সঙ্গে করে নিয়েই গেছে। যারা মারা গেছে তাদের এত লাশ বহন করার ওদের ক্ষমতা ছিল না। দাফন করার সময়ও পায়নি। আরো তীব্রতর আক্রমণের আশঙ্কায় ওরা তড়িঘড়ি পালিয়ে গেছে।

–এতগুলো লাশ এভাবে পড়ে থাকবে?

–উপায় নেই।

–আপনারা দাফন করতে পারবেন না?

–সময় নেই। সময় থাকলেও করতাম না।

–মৃতদের উপর ঘৃণা এবং বিদ্বেষ রাখতে নেই।

–এসব এথিক্স যুদ্ধক্ষেত্রে খাটে না।

–জীবনের মূল্যবোধ ক্ষেত্রবিশেষে বদলায় না।

–আপনার কথার উত্তর দেয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না।

–পরিবেশ দূষিত হবে।

–হবে হয়তো। লাশগুলো শেয়াল কুকুরে খেয়ে ফেরবে।

–এটা কি আপনার মনের কথা?

–আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না, তবু বলছি, অত দরদ থাকলে ওরাই কাজ শেষ করতে পারত।

–আপনিই বলেছেন, অত সময় ওদের হাতে ছিল না।

–আপনি কি করতে চান? বিরক্ত কণ্ঠ মেজরের।

–আমি আশপাশ থেকে লোকজন ডেকে এনে জাস্ট একটা গণকবর খুঁড়ে এদের মাটি চাপা দিতে চাই। তা না হলে পঁচা লাশের গন্ধ অনেক দূর ছড়াবে।

–আপনার এই ইচ্ছেটাই কি বড়, নাকি শত্রুপক্ষের উপর দরদ?

–আপনার অনুমান কোনটাই সত্য নয়। আমার মানবতাবোধটাই বড়।

মেজর ইব্রাহীম গম্ভীর এবং নীরব। রোহানা বলল, একটা কথা কেন ভাবতে পারছেন না, আমাদের নিহত ছেলেদের দেশের মাটিতে কবর হচ্ছে, এদের সেটুকুও কপালে জুটছে না। পর দেশে দেহের বিলুপ্তির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত থাকছে না।

–পরদেশ আক্রমণকারীদের অবস্থা এমনিই হয়।

–মৃতদের ব্যাপারে এসব ভেদবুদ্ধি আমার বিবেচনায় আসছে না।

–তাহলে হিটলারকে আমরা কি এখন পূজো করব?

–হিটলারকে ঘৃণা করছেন, ওদিকে লেলিন এবং স্ট্যালিনকে পূজো করছেন। এরা এদের নিজস্ব মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোটি কোটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে।

–আপনার কথাগুলো নিয়ে দার্শনিকরা ভাবতে পারে, সৈনিকরা নয়। আমাদের নীতি হলো, মারো না হয় মরো।

–সৈনিক তো একজন মানুষই।

–যুদ্ধের সময়ে সৈনিক তার মানুষ–অস্তিত্ব ভুলে যায়, সে তখন একটা মারণাস্ত্র।

www.pathagar.com

–আমি তা ভাবি না। সে তখনো তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং বাবা-মা'র কথা ভাবে। তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়। আসলে কি জানেন, আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা মুখোশ পরে নিই। মুখোশের নিচে আসল মানুষটা অবিকল তেমনি থেকে যায়।

মেজর ইব্রাহীম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, চলুন ফেরা যাক।

রোহানা বুঝল, আর কিছু করার নেই। বলল, চলুন।

গাড়িতে বসে মেজর ইব্রাহীম বললেন, সাব্বির খানের লাশের পোস্টমর্টেম এতক্ষণে হয়ে গেছে। ফিরে গিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করব।

–পোস্টমর্টেম? ওমর এবং রোহানা উভয়েই বিস্মিত।

–নয় কেন? লোকটাকে আপনারা মেরে ফেলেছেন নাকি আত্মহত্যা করেছে, শত্রুপক্ষ অথবা আমাদের গুলীতে মারা গেছে? এই রিপোর্টের উপর অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

–এর অর্থ আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস করেননি?

–বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক।

এই মুহূর্তে ওমর এবং রোহানা উভয়েই বুঝল, এদের হাতে তারা দু'জনেই নজরবন্দী।

সাব্বির খানকে সত্যি সত্যি এরা দাফন করল। মেজর ইব্রাহীম এসে বললেন, আমার সঙ্গে আপনারা দুপুরে লাঞ্চ করবেন।

বিদ্রূপ ফুটে উঠল ওমরের কণ্ঠে, বন্দীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সম্রাট তাঁর ভোজ সভায়? ব্যাপারটা বিচিত্র এবং অভিনব নয় কি?

–কে বলল আপনারা বন্দী? যে ভাইবোনদের মান-ইজ্জত এবং নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের সুখের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি, জান দিচ্ছি তাদের অবমাননা করব?

–তাহলে আমাদের যেতে দিচ্ছেন না কেন?

–আপনাদের নিরাপত্তার জন্য।

–বুঝলাম না।

–পাক বাহিনী মুন্সির হাট, ছাগলনাইয়া ইত্যাদি অঞ্চল হয়ে হাসানপুর সড়ক পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে। চলে গেছে ফেনীর দিকে। মাঝে মাঝে পরিখা খনন করে রেখেছে। বাঁশের সেল তৈরি করেছে। যেই মাত্র আপনারা রওয়ানা হবেন, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে ঝাঁঝরা করে দেবে আপনাদের। তাছাড়া স্থল মাইন যে কোন সময়ে বিস্ফোরিত হতে পারে।

–সরি, এত কিছু জানতাম না। কিন্তু আপনারা কি করবেন?

–আমরা বুঝে সুঝে এগুবো। না এগিয়ে এখানে থেকে গেলে ওরা এখানে এসে আমাদের খতম করবে। এটা একটা অস্থায়ী ক্যাম্প। অস্ত্রের মজুদ বিশেষ নেই। আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। বিপজ্জনক পয়েন্টগুলো পার হতে পারলেই আপনাদের ছেড়ে দেব। যেখানে খুশি যাবেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সদস্যরা অলরেডি মাইন অপসারণের কাজে লেগে গেছে।

www.pathagar.com

–ধন্যবাদ মেজর ইব্রাহীম।

খাওয়া শেষে ওমর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি জানেন, আমি বাঙ্গালী নই।

–জানি।

–আমাকে কিছু বলছেন না যে?

–আমার বাঙ্গালী বোন রোহানা চৌধুরীর জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারি। উনি এ দেশের একজন মশহুর সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। তিনি পাঞ্জাবী বিয়ে করবেন কি ইউরোপীয়ান বিয়ে করবেন এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

–আপনার মত সবাই কিন্তু এত উদার না।

–স্বাভাবিক। যুদ্ধ একটা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ব্যাপার। সাধারণ মানুষ তাই সব সময় উত্তেজক কিছু খুঁজে বেড়ায়। এগুলো তাদের ইনস্পিরেশন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা তা নয়। আমরা স্বাধীনতা চাই। তার জন্য যা করা দরকার তা হিসেব মত করতে চাই। আপনি অনেকদিন এ দেশে আছেন। এ দেশের জন্য করেছেনও অনেক। আপনি আপাতত কোন পক্ষ নিচ্ছেন না। অতএব আপনাকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কিন্তু একদল আছে যারা উত্তেজনার খোরাক সংগ্রহের জন্য আপনাকে ইস্যু করছে। ওমর সাহেব সাবধান।

ওমর নিজের আসন্ন বিপদের কথা ভুলে গিয়ে ভাবল, আসলে কোন মানুষ খারাপ নয়। মানুষ শুধু অবস্থা এবং পরিস্থিতির শিকার। সে শুধু কারক হয়ে কাজ করে। কারণ যখন দূরে সরে যায় তখন সে একাকী হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি ঠিক কাজটি করেছি?

মাঝ রাতে তারা ফেনী অভিমুখে রওয়ানা হলো। রোহানাকে মেজর ইব্রাহীম বলল, বোন, আপনারা কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? আপনাদের গাড়ি কিন্তু অচল হয়ে পড়ে আছে।

–আমি ওটা চালিয়েই তো এলাম, ওমর বলল।

–আপনাদের ভাগ্য ভাল, এ্যাকসিডেন্ট হয়নি। গুলী সাব্বির খানের পাঁজর ভেদ করে পেট্রল ট্যাংকে লেগেছিল। সারারাত পেট্রল লিক করেছে। সামান্য যা ছিল তাই দিয়ে কয়েক ঘন্টা গাড়ি চালাতে পেরেছেন। গাড়িতে আগুন লেগেছিল। আমাদের লোকজন নিভিয়ে দিয়েছে। ক্ষতি কম হয়নি। মেরামত এখন সম্ভব না।

রোহানা এবং ওমর একই সময়ে ভাবল, গাড়িটা তাদের নয়, কেরামত মণ্ডলের। তিনি নেই, ড্রাইভার সাব্বির খান নেই, গাড়িটাও গেল।

রাস্তায় কয়েক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা কনভয়ের গাড়িগুলোকে থামতে হলো। কোথাও কোন বাধা নেই। বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া, যুদ্ধ, প্ল্যান তৈরি ইত্যাদি কাজ চলল। বিকেলের দিকে আবার একটানা চলল তারা। লক্ষ্য হাসানপুর। তারপর ফেনী। মেজর ইব্রাহীম ড্রাইভারকে হঠাৎ নির্দেশ দিলেন, থাম। পিছনের গাড়িগুলোও থেমে গেল।

–মনে হচ্ছে সামনে একটা নালা কাটা হয়েছে। এখানে এটা থাকার কথা না।

রোহানা বলল, ভাইয়া, এটা তো নদী নালার দেশ, ম্যাপে কি খাল বিলের চিত্র

www.pathagar.com

থাকে?

–এ অংশটা আমরা আগেই জরিপ করে গেছি। তখন ছিল না। মনে হয় বেরিকেড সৃষ্টি জন্য পরিখা খনন করা হয়েছে। আপনারা বসুন। আমি নামছি। পাশেই পানের বরজ। এত ঘন বাঁশের ছাওনি যে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। মেজর ইব্রাহীম পরিখার পাশে এসে দাঁড়ালেন। হাতে বায়নোকুলার। আশপাশ ভাল করে দেখে নেবেন।

হঠাৎ পানের বরোজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল কনভয়ের উপর। কোথা দিয়ে কি হলো কেউ টের পেল না। সবাই মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করতে লাগল। কোন কোন গাড়ি থেকে পাল্টা গুলী বর্ষণ হচ্ছে। পেছনের গাড়িগুলো ব্যাক করে অনেক দূরে চলে গেছে। একজন পাক অফিসার এসে বলল, উতার যাও। নেমে এল ওমর এবং রোহানা।

–ইধার লেডি কাঁহাসে আয়া?

ওমর আজ নিজে উপযাচক হয়ে বলল, আমার স্ত্রী।

–তোমলোগ মুক্তিযোদ্ধা হো?

–জ্বি নেহি।

–এ গাড়ি মে তব কিস লিয়ে আয়া?

–আমরা সাংবাদিক। তোমাদের পাল্লায় যেমন এখন পড়লাম তেমনি এদের পাল্লাতেও পড়েছিলাম। আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। কথা ছিল এরা আমাদের সুবিধামত জায়গায় নামিয়ে দেবে।

–আই সী। তবে তোমাদের সব কথা বিশ্বাস করা যায় না। চল আমাদের সঙ্গে।

প্রিজন ভ্যানের বিরাট কালো গাড়িতে দু'জনকে ওঠানো হলো। এর চারদিক ঢাকা। শুধু বাতাস প্রবেশের জন্য শক্ত লোহার জালি দেয়া ঘুলঘুলির মত ছোট্ট জানালা। অন্ধকারে কিছু ঠাওর করতে পারে না ওমর ও রোহানা। অন্ধকারে হাত পায়ে অনেক মানুষের শরীরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল।

–আপনারা কে কে এখানে? ওমর প্রশ্ন করল।

–আমরা আহত মুক্তিযোদ্ধা।

অন্ধকারের জমাট ঘনত্ব ভেদ করে কর্কশ কণ্ঠ বেজে উঠল, বাত মাত্ করনা।

সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় রাইফেল ঠোকার আওয়াজ।

আহতদের অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল ওমর ও রোহানার কানে। চাপা কান্নার আওয়াজ, গাড়ির ঘসঘস শব্দ, অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ভয়ার্ত অভিব্যক্তি। অন্ধকার সয়ে এল চোখে। ঘুলঘুলি দিয়ে আসা সামান্য আলো অন্ধকারের কালো মুখকে ম্লান করে দিল। বীভৎস দৃশ্য ভেসে উঠল। সবাই গুরুতর আহত। তাজা রক্ত চুঁইয়ে চুইয়ে পড়ছে। গাড়ির মেঝেয় থক থকে রক্তের ঘনত্ব লাল কার্পেটের উঁচু নিচু নক্সার মত। দু'হাতে চোখ ঢাকল রোহানা।

মনে হচ্ছে অন্তহীন সময়। এর যেন শেষ নেই। রাস্তা ভাল নয়, ঝাঁকুনির সঙ্গে আহতদের উঃ আঃ বিলাপ। ঘুলঘুলির মত জানালা দিয়ে বাইরের কিছু দেখা যাচ্ছে না,

www.pathagar.com

গাছপালা, ঝোপঝাড়, সবুজ প্রান্তর। মৃত্যুগুহার মত এই প্রিজন ভ্যানকে রোহানার মনে হচ্ছে ফাঁসির আসামীর অন্ধকার সেলের মত ভয়ানক এবং নিষ্ঠুর। রোহানার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল, শাস্তি বিধাতার বিচারের দন্ডের বিধান। তোমরা নিরপরাধদের শাস্তি দেয়ার কে?

রাত কত কেউ বলতে পারবে না। প্রিজন ভ্যান কোথায় এসে থামল তা জানা নেই। আহতদের টেনে হিচড়ে নামানো হলো। স্ট্রেচারের বালাই নেই। যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভরে উঠল সেই স্থান। কে একজন নিম্ন পদমর্যাদার অফিসার এসে রোহানা এবং ওমরকে হুকুম করল, উতার যাইয়ে।

নেমে এল তারা। এক অন্ধকার কক্ষ, অন্য কেউ সেখানে নেই, বাকীদের কোথায় রাখা হলো জানা নেই। ঠান্ডা মেঝে, সারারাত মশার কামড়, আলোহীন অন্ধকারের নীরবতা, সব মিলিয়ে অনিশ্চয়তার এক ভয়াবহ ভবিষ্যত ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলে দুলে শুধু জীবনের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিল। মশার কামড় অসহ্য। আত্মরক্ষার জন্য বারবার গায়ে শাড়ি জড়াল রোহানা। ঘরের ভ্যাপসা গরমে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, দেহমনে ক্ষুধা, গ্লানি, ক্লান্তি।

–রোহানা, তক্‌দির মানো? ওমরের ফিসফিসে কণ্ঠ, যেন কেউ শুনে ফেলবে।

–মানি।

–আগামীকাল কপালে কি আছে কে জানে?

–অনুমান করে লাভ কি? যা হবার হবে।

–মনে হয় তোমাকে ছেড়ে দেবে, আমাকে দেবে না।

–তাতে আমার লাভ?

–কেয়ামতের দিন সবাই ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করবে। এটা না হয় দুনিয়াতেই করলে। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো।

কোন উত্তর এল না।

–শুনছো রোহানা?

–আঃ চুপ কর।

–জীবনে কোন কোন সময়ে এমন মুহূর্ত আসে যখন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দেয়া ভাল।

–তোমার কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।

–আমিও তাই চাচ্ছি। আমার সঙ্গটাও যেন তোমার ভাল না লাগে।

–তুমি চুপ করবে নাকি গলায় শাড়ির আঁচলের ফাঁস লাগিয়ে আমি মরব?

–বাঃ নাটকের ডায়োলগ ভালই বলছ।

অন্ধকারে শব্দ করে হাসল রোহানা। পরমুহূর্তে ভেঙ্গে পড়া কান্নার প্রচন্ড শব্দ। হৃদয় নিংড়ানো কান্নার উষ্ণ বাষ্পের ঘূর্ণাবর্ত অন্ধকারে পাক খেতে লাগল। দাহ সৃষ্টি করল না। কিন্তু ওমরের অন্তরকে গলিয়ে দিয়ে আবেগের সমুদ্র সৃষ্টি করল বিস্তৃত মোহনায়। জীবনের সব মমতা এবং ভালবাসাকে মুক্ত করে দিয়ে সে যদি রোহানাকে

www.pathagar.com

আজ গ্রহণ করতে পারত হয়তো কিছুটা শান্তি পেত। কিন্তু তা সম্ভব না। তাদের ভালবাসা পবিত্র এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ। পাপ, মালিন্য, অশুচি দূরে সরে যায়। আবেগ বেদনায় হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং আকাঙ্ক্ষাময়।

কোথা দিয়ে ভোর হলো তারা জানে না। পাখির ডাক শোনা যায়নি। ভোরের মিষ্টি বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়েনি গায়ে। আলো মুগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়নি মুখে। কবরের মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের নীরবতায় শুধু একজন আরেকজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছে, অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছে গাঢ় ভালবাসার অন্তহীন মমতায়।

ওমর ইচ্ছে করেই রোহানার কাছে সরে আসেনি। আবেগেরে উৎসমুখ তাহলে খুলে গিয়ে ভাসিয়ে নেবে ধর্ম, নীতি, অনুশাসন। এই ভাল, তারা দু'জন একে অপরকে ভালবেসে কষ্ট পাচ্ছে। জ্বালাময় অনুভূতির তীব্র দহনে পুড়ছে। এ পৃথিবীতে কত নর নারীকে ভালবেসেছে। প্রকৃতি ভালবেসেছে বিচিত্র প্রাণী জগতকে। সব ফুল প্রজাপতির স্পর্শ পায় না। সব নদী সমুদ্রের মোহনায় পড়ে না। সব মেঘ বৃষ্টি হয়ে বর্ষিত হয় না ধরণীর ধূলোয়। পৃথিবীর সব নারী নূরজাহান, মমতাজ, ক্লিওপেট্রা হয় না। লাইলী মজনু, শিরি ফরহাদ এবং রোমিও জুলিয়েটের সংখ্যাই বেশি। বিরহের আগুনে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেউ খবর রাখে না। শুধু বাতাসের স্তরে স্তরে ভাসতে থাকে তাদের অতৃপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্বপ্নের নীল নীল ছায়া।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমর এবং রোহানার মুখের উপর। চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়। চোখ ডলে ডলে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। একজন সিন্ধি সৈনিক, হাতে খাবারের ট্রে। দু'কাপ চা, দু'টুকরো পাউরুটি নামিয়ে রাখে। বলে, ব্রেক ফাস্ট খা লিজিয়ে। তার কণ্ঠস্বর নরম এবং ভদ্র।

–আমরা এখন কোথায়? রোহানা জিজ্ঞেস করে।

–ইয়ে ভি.আই.পি. সেল হ্যায়। আপলোগ শরীফ আদমী, ইস্‌লিয়ে ইধার ভেজ দিয়া।

–আপ মেহেরবানী সে বাতাইয়ে মেজর ইব্রাহীম জিন্দা হ্যায়? ওমর অনুনয় করে বলে।

–হা জ্বী।

–ও কিধার হ্যায়?

সৈনিকটি এদিক ওদিক তাকায়। তারপর নিম্নস্বরে বলে, উসকো টরচার সেল মে ভেজ দিয়া।

স্তব্ধ রোহানা এবং ওমর। সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, জখমী আদমী লোগ কিধার হ্যায়?

–বহুত আদমী মর গিয়া। বাকী আদমী লোগকো হসপিটাল মে ভেজ দিয়া। দেখিয়ে জ্বি, যিয়াদা বাত মাত কিজিয়ে। খানা খা লিজিয়ে। ম্যায় ফের আউঙ্গা। আপলোককো লে যায়ে গা। ইনটারোগেশন হোগা। আভি চুপ রহনা।

পাথরের মূর্তি বনে যায় দু'জনে। দরজা বন্ধ হয়। আবার অন্ধকার ঘিরে ফেলে

www.pathagar.com

কক্ষটিকে।

–রোহানা কেন যে তুমি মামুজীকে দেখতে এসেছিলে! ওমরের কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে ওঠে।

–ছিঃ এভাবে বলতে নেই। মামুজী বড় ভাল লোক ছিলেন। তবু তো আমরা একসঙ্গে আছি।

–বেশীক্ষণ থাকব না। ওরা ভুলে আমাদের একত্রে রেখেছে। রোহানা মামুজীকে দেখতে এসেছিলাম এ কথা ওদের বলো না।

–কিন্তু তুমি বিগ্রেডিয়ার মাসুদ খানের ভাগ্নে এ কথা ওরা জানতে পারলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে।

–না।

এত জোরে না শব্দটি উচ্চারণ করল ওমর যে রোহানার কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জোগাল না।

–রোহানা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও।

–খেতে ইচ্ছে করছে না।

–খাও, শরীরে জোর পাবে। গতরাত থেকে অনাহারে।

–তুমি খাও ওমর।

–এসো দু'জনে খাই।

–আধো অন্ধকারে চায়ের কাপ তুলতে গিয়ে ছল্‌কে চা খানিকটা পড়ে গেল। হাত পুড়ল না। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ওমরকে ইনটারোগেশনের জন্য আগে নেয়া হলো। ক্যাপটেন সরফরাজ জেরা করলেন, তোমহারা নাম?

–ওমর।

–হিন্দু না মুসলমান?

–নাম শুনে বোঝ না?

–তোমার চেহারা ছুরত বাঙ্গালীর মত না। তুমি ইণ্ডিয়ান স্পাই?

–তুমি যদি তাই মনে করে থাকো তাহলে আমার কি বলার আছে?

–এ্যাই সিপাহী, উসকো দুসরা কামরা মে লে যাও, দেখো হিন্দু ইয়া মুসলমান।

ওমর বুঝল, তার খত্‌না হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হবে।

–এইভাবে বেইজ্জতি না করে আমার মুখ থেকে দোয়া কালাম শুনতে পার।

–ওসবে আমাদের বিশ্বাস নেই। স্পাইরা আগে থেকে এসব শিখে রাখে। তিরিশ বছর যাবৎ মসজিদে ইমামতি করেছে সেই লোক ইণ্ডিয়ান স্পাই, ধর্মে হিন্দু। এক মহিলা মুসলমান বিয়ে করে চারটি ছেলে মেয়ে পয়দা করেছে সেও হিন্দু এবং ইণ্ডিয়ান স্পাই, অস্বীকার করতে পার?

ওমর শুনেছে এসব লোক উনিশ শ' পয়ষট্টি সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে ইস্ট পাকিস্তানে ধরা পড়েছিল। সে জবাব দিল, জানি।

–তব্ যাও।

www.pathagar.com

একটু পরেই দু'জনে ফিরে এল। সিপাহী ঘোষণা দিল, মুসলমান হ্যায়!

–এবার বল, তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থেকে কি করছিলে?

–ওটা ঘটনাচক্র। ওদের সঙ্গে ইচ্ছে করে আসিনি। সাংবাদিক হিসাবে যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলাম। ওদের কবলে পড়ে গিয়েছি। দি শাইনিং স্টার পত্রিকার নামও বলল।

–কাগজটা বন্ধ হয়ে গেছে।

–আমি রোহানা চৌধুরীর দর্শন পত্রিকায় কাজ করছি।

–ওই আওরতের কথা বলো না। সব মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে লিখে। ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ।

–কথাটা ঠিক না। সাংবাদিক হিসাবে ও খুব নিরপেক্ষ। তোমরা যদি যুদ্ধে হেরে যাও ও কি লিখবে তোমরা জিতে গেছ?

–তুমি ওই আওরতের সাফাই গাইছ?

–ভদ্রভাবে কথা বল। সী ইজ এ রেসপেক্টেবল লেডি।

প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত পড়ল ওমরের মুখে, ব্লাডি ফুল, তোমাকে কারো ওকালতি করার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়নি।

ব্যাপারটা এত দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে ওমর সরে যাওয়ার অবসর পায়নি। মুখ চেপে ধরে বলল, শুনেছি তোমরা নিরপরাধ লোকদের উপরেও অত্যাচার কর, আজ প্রমাণ পেলাম।

ক্যাপ্টেন সরফরাজ ওমরকে সঙ্গে সঙ্গে চিৎ করে ফেলে দিয়ে সিপাহীকে হুকুম দিল, উস্‌কা সিনা পর জোরসে বৈঠ্‌ যাও।

নিজেও ওমরের বুকে চেপে বসে মাথাটা মেঝেতে বার বার থেতলাতে লাগল। এমন সময় মেজর তওসিফ খানের প্রবেশ। টরচার করা দেখে বললেন, ও কৌন হ্যায়?

–ওমর।

–ওমর বাট?

–মালুম নেহি।

–ওতার যাও।

ওমরকে ভাল করে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, এ তুম কেয়া কিয়া? ও তো বিগ্রেডিয়ার মাসুদ খানের ভান্‌জা।

–আপ কেয়া বল্‌ রাহা?

–ইয়ে ঠিক বাত হ্যায়।

–লোকটা নিজের পরিচয় সাফ সাফ বলেনি।

–আদবসে বাত করো। ইফ হী ডাইজ, ইউ উইল বী রেসপনসিবল। সেণ্ড হীম টু দা হসপিটাল ইমেডিয়েটলি।

স্ট্রেচারে তোলা হলো ওমরকে।

কতদিন অচেতন ছিল ওমর বাট তা সে নিজেও জানে না। একটা অন্ধকার ঘরে নিজের অস্তিত্ব টের পেল। সব কিছু মনে করতে চেষ্টা করল। মাথাটা পাথরের মত

www.pathagar.com

ভারী। মুখের চোয়ালে ব্যথা। ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল রোহানা, রোহানা।

কেউ উত্তর দিল না। দুপুরের দিকে দরজা খোলার শব্দ। ঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে আবছা আলোর মুখ দেখা গেল। চোখের পাতা ভারী এবং ক্লিষ্ট। কষ্ট করে চোখ মেলল ওমর। ঘর খালি, কেউ নেই। শুধু সিপাহীর হাতে খানার ট্রে। নামিয়ে দিয়ে বলল, আপ উঠনে সাক্‌তে হো?

–নেহি।

–তব্‌ এ্যায়সেই খানা খা লিজিয়ে।

–ম্যায় কিধার হো?

–ইয়ে ভি.আই.পি সেল হ্যায়। আপকা উপর কোই টরচার নেহি হোগা।

ওমরের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, শালা টরচার তো আগেই করে ফেলেছ। কিন্তু কিছুই বলল না ওমর। জিজ্ঞেস করল, রোহানা চৌধুরী কিধার হ্যায়?

–মালুম নেহি।

–ম্যায় মোলাকাত করনে সাক্‌তে?

–এইসে হুকুম নেহি হ্যায়। আপ খানা খা লিজিয়ে।

দরজা বন্ধ হলো। চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে। পেটে ক্ষিধে, কণ্ঠে পিপাসা। পানির গ্লাস টানতে গিয়ে অর্ধেক পানি ফেলে দিল। বাকীটুকু গলায় ঢালল একটু একটু করে। ইচ্ছে করছিল একসঙ্গে সবটুকু খেয়ে ফেলে। বিষম লাগার ভয়ে খেল না। খানার ট্রে সিপাহী তার হাতের নাগালে রেখে গেছে। আটার রুটি, ডাল, সবজি। দুঃখ ছাপিয়ে হাসি ফুটল ওমরের ঠোঁটে। ভাতের বদলে রুটি দিয়ে অবাঙ্গালীর স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। আশ্চর্য ভাগ্যের পরিহাস। যুদ্ধের আগ পর্যন্ত, এ জীবনে সে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, বিহারী সবার কাছেই মায়া, মমতা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব পেয়েছিল। কোন্‌ কালো দৈত্য এসে সব ছারখার করে দিল। প্রতিদিন এই দানব মানুষ গিলছে। রক্ত চক্ষু বের করে হুংকার দিচ্ছে। বিকট জিহ্বা বের করে লালসার সিক্ততা ছড়াচ্ছে। তীক্ষ্ন নখর বের করে উন্মত্ত আস্ফালনে হিংস্রতা ছড়াচ্ছে। এই সোনার দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মানুষ প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে দৌড়াচ্ছে বনে জঙ্গলে, গ্রামে, বিলে, প্রান্তরে। রোহানার কথা মনে হলো। বিড়বিড় করে বলল ওমর, রোহানাকে ওরা যদি টরচার করে?

এই যুদ্ধে তার এবং রোহানার ভূমিকা সাংবাদিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে, বিবেকের সজাগ প্রহরী হিসাবে, অতন্দ্র দেশপ্রেমের জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে। প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে প্রতিবেশী দেশের চেহারা। তাদের মুখোশ পরা স্বার্থান্ধতা, আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে লুটেরার বখরা বুঝে নেয়ার নীল নক্‌শা। কিন্তু যারা আগুনে ঝাঁপ দেয় তারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না। লোভের ফাঁদে পা দেয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের কথাও তারা ভাবে না।

রুটি গিলতে গিয়ে ওমর পারে না। গা গুলিয়ে উঠল। বমি করে ফেলল। খাবারের ট্রে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কণ্ঠনালী চেপে গেছে। মনে হয় জীবনে খাবার গিলতে পারবে না। সুস্থ হবে না, রোহানাকে দেখতে পাবে না। হয়তো ওর উপরেও টরচার

www.pathagar.com

হচ্ছে যেমন যুদ্ধের সময় সব দেশেই হয়ে থাকে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল ওমরের। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন চোখ মেলল, অনুমান করল আগের ঘরেই আছে। কি হয়েছিল ভাবতে চেষ্টা করল, পারল না। অন্ধের কাছে যেমন সব দৃশ্যই লেপে-মুছে একাকার, তেমনি তার স্মৃতির ভাণ্ডার শূন্যতায় ভরা। সব ভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। নৈরাশ্যের বেদানদায়ক যন্ত্রণা নিয়ে চুপ করে রইল ওমর।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খোলার শব্দ। ঝপ্ করে একরাশ আলো এসে ঢুকল ঘরে। চোখ বন্ধ করে আবার খুলল। এক সিপাহীর সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। গলায় ঝুলানো স্টেথিসকোপ। মনে হলো ডাক্তার।

পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কেমন আছেন ওমর সাহেব?

–আপনি কি বাঙ্গালী?

–হ্যাঁ।

–ডাক্তার?

–বুঝতে পারছেন না?

–পারছি। আপনাকে ওরা এখানে কেন পাঠিয়েছে?

–আপনার চিকিৎসার জন্য।

–বিশ্বাস করল আপনাকে?

–উপায় কি? ওদের ডাক্তার কম। আহতদের সংখ্যা বেশি, কুলিয়ে উঠতে পারে না।

–আপনার নাম?

–ডাঃ মুসা।

–ডাঃ মুসা আমার কি হয়েছে?

–আপনার উপর টরচার হয়েছিল।

–আমি যেন শুনেছিলাম আমাকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা।

–পাঠানো হয়েছিল নামকাওয়াস্তে। মেজর তওসিফ যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যাওয়ায় আপনাকে ফের এখানে আনা হয়েছে। তাছাড়া ওদের ডাক্তারের অভিমত, আপনার আঘাত গুরুতর না।

–ক্যাপ্টেন সরফরাজের এত রাগ কেন আমার উপরে?

–ওর এক ভাই মারা গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

–উনি তো জানেন, আমি বাঙ্গালী নই।

–কিন্তু বাঙ্গালীদের সঙ্গে মেশেন, তাদের ভালবাসেন। ওঁর ঘৃণা তাই এত প্রচণ্ড।

–আপনার কি অভিমত, আমার আঘাত গুরুতর না?

–অন্যান্য টরচারড্ রোগীদের তুলনায় নয়।

–আপনি আর কোন্ কোন্ টরচারড্ রোগীর চিকিৎসা করছেন?

–আপনি কি আমার চাকরিটা খাবেন?

–এদের আণ্ডারে চাকরি করাটা খুব প্রয়োজন আপনার?

–হ্যাঁ।

www.pathagar.com

–ছিঃ।

বিষন্ন হাসলেন ডাঃ মুসা। ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে বললেন, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ চাকরিতে জয়েন করেছি। আমার অত্যাচারিত বাঙ্গালী ভাইদের আমি যেভাবে চিকিৎসা করব ওরা তা করবে না।

–মাপ করবেন, বুঝতে পেরেছি।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ওমর, রোহানা চৌধুরীকে চেনেন?

–চিনি। দেখেছি।

–কেমন আছে ও? কাতর শোনাল ওমরের কণ্ঠ।

–ভাল আছেন।

–ওর উপর টরচার হয়েছে?

–না।

–আর ইউ শিওর?

–ইয়েস।

–তাহলে ওকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?

–রোজ ওর ইনটারোগেশন হয় তবে ওঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা হয়। চেয়ার দেয়া হয় বসতে। ভাববেন না ওমর সাহেব, মেজর তওসিফ ফিরে এলে মিস চৌধুরী ছাড়া পেয়ে যাবেন।

ওমরের চোখে পানি।

–উনি কি আপনার আত্মীয়?

–এ দেশে আমার সবচেয়ে আপনজন। ওকে আমি ভালবাসি।

ডাঃ মুসা চুপ করে রইলেন।

–আপনি মেজর ইব্রাহীমকে দেখেছেন, ওমর ফের জিজ্ঞেস করে।

থতমত খেয়ে গেলেন ডাঃ মুসা। আম্‌তা আম্‌তা করে কি বললেন, বোঝা গেল না।

–বলুন চেনেন কিনা?

–উনি মুক্তি ফৌজের লোক। আপনি ওঁর সম্পর্কে এত ইন্টারেস্টেড কেন?

–ওঁর সঙ্গেই তো আমরা আসছিলাম এ পথে। পাক আর্মি পথে এ্যামবুশ করল। জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেল তাঁকে। বড় ভাল লোক।

–থাক না এ সব কথা ওমর সাহেব।

–থাকবে কেন? ওঁর ঋণ আমি একদিন পরিশোধ করতে চাই।

–সুযোগ পাবেন না। উনি মারা গেছেন।

–টরচার সেলে?

–হ্যাঁ।

–আপনি ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন?

–হ্যাঁ। চিকিৎসার প্রহসন মাত্র।

–খুলে বলুন।

www.pathagar.com

–আঃ ওমর সাহেব, দেয়ালেরও কান আছে।

–প্লীজ ডক্টর, প্লীজ। না জানলে আমার কষ্ট বাড়বে।

–তাহলে, শুনুন, এমন অমানুষিক অত্যাচার আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, ভারতের কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ তোমরা, তোমাদের পরবর্তী আক্রমণের টার্গেট ছিল কোথায়? মেজর ইব্রাহীম লা জবাব। তাঁর তলপেটে লাথির পর লাথি মারা হতো।

তিনি যখন দুমড়ে মুচড়ে যেতেন তখন আমাকে ডাকা হতো চিকিৎসার জন্য। একটু সেরে উঠলেই আবার ডাক পড়ত, অস্ত্র কোথায় রেখেছ? এত অস্ত্র আসছে কোন পথে? মেজর ইব্রাহীম নিরুত্তর। তাঁর দুটো পা মুচড়ে দেয়া হলো, তিনি আর কখনো ভাল করে হাঁটতে পারেননি। পরদিন টরচার সেলে নিয়ে গিয়ে সিগারেটের আগুনে সারা শরীর স্যাকা দেয়া হলো। সেদিন তিনি গোঙাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি আর আপনার চিকিৎসা করব না। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি চোখ মুছতে মুছতে বললাম, চিকিৎসায় আপনি একটু ভাল হলেই তো ওরা আপনাকে টরচার করে দ্বিগুণভাবে। লাভ কি?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মেজর ইব্রাহীম।

শেষ দিন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোথায় কোথায় গেরিলারা অবস্থান নিয়েছে? উত্তর দিলেন না মেজর ইব্রাহীম। তখন তাঁর মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পা বেঁধে দেয়া হলো ইলেকট্রিক পাখার সঙ্গে। সুইচ অন্‌ করে দেয়া হলো। তাঁর দেহ বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগল। যখন তাঁকে নামানো হলো জ্ঞান নেই। জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। আমাকে পরীক্ষা করতে বলা হলো। দেখে বললাম ডেড্‌। ডেথ সার্টিফিকেট দিতেও বাধ্য করল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ্ পাক আপনার আত্মাকে শান্তি দিন।

ওমরের চোখে শূন্য চাউনি, ওরা কি আমাকেও এমনিভাবে টরচার করবে?

–আরে না। আপনি ওদের সগোত্র।

–আপনিও এভাবে কথা বললেন?

–সরি, আমি এভাবে বলতে চাইনি। আপনি ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের ভাগ্নে। আপনার উপর ওদের দায়িত্ব আছে। মেজর তওসিফ চাচ্ছেন, আপনি সুস্থ হয়ে চলে যাবেন।

–কেন চাচ্ছেন উনি? আর কেউ তো চায় না?

–মিঃ বাট, একটা দেশের সব লোক খারাপ হয় না। এই ডিভিশনে মেজর তওসিফের মত লোক হয় না। ভদ্র সজ্জন, কর্তব্যপরায়ন। তাছাড়া...

–বলুন।

–আপনার মামা মৃত্যুর সময়ে আপনার ও রোহানা চৌধুরীর নিরাপত্তার ব্যাপারে ওঁকে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ওমর চোখ বন্ধ করল, চোখের কোণে পানি।

ডাঃ মুসা পরের দিন আবার এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন?

–সারারাত ঘুমুতে পারি নি।

–আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম, খান নি?

–খেয়েছি। সারারাত পাশের ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনেছি। চাপা চিৎকার দেয়াল ভেদ করে আমার কানে এসেছে।

–এটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। কত কিছু ঘটে। আপনি শোনার, বোঝার চেষ্টা করেন কেন? চুপচাপ থাকুন, নিজে ভাল হতে চেষ্টা করুন।

–কি যে বলেন! কেমন করে চুপচাপ থাকব? দেশের এ প্রান্তে আগুন জ্বলছে আর পশ্চিম প্রান্তে মায়ের বুকে, বধূর বুকে আগুন জ্বলছে। পুত্র মারা যাচ্ছে, স্বামী–ভাই মারা যাচ্ছে অচেনা মাটিতে। কেউ তো আজ সুখে নেই। শুধু আমি সুখে থাকব?

–মিঃ বাট, আপনি যদি মরে যেতেন কে দেশের কথা ভাবত? এখন বলছি, আপনার মাথার আঘাত গুরুতর ছিল। আপনি যে সারভাইভ করবেন ভাবিনি।

ওমরের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, আমি মরে গেলে আপনি, রোহানা আরো দশজন দেশের কথা ভাববেন। আমার বাবা-মা-ভাই-বেরাদররা ভাববে। কখনো কোন স্থান শূন্য থাকে না।

ডাঃ মুসা একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, আপনি দেখছি বিপদ না বাঁধিয়ে ছাড়বেন না।

–দয়া করে বলুন, ওঘরে কি চলছে।

–চুপ করুন, সেপাই আসছে। সময় মত বলব।

দু'দিন ডাঃ মুসা এলেন না। মনে মনে ওমর অস্থির। এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সেই একমাত্র বন্ধু, হিতৈষী, স্বজন। সেপাইটি সিন্ধি, মন কিছুটা নরম, সরল। জিজ্ঞেস করল, আপ্ কিস লিয়ে ভুখা হ্যায়, খানা খা লিজিয়ে।

–তবিয়ত আচ্ছা নেহি। তুম ক্যাপটেন কো বাতাও, ডগদর ভেজ দেনেকো লিয়ে।

–আচ্ছা জ্বি, ঠিক হ্যায়। আপ খানা খা লিজিয়ে।

–নেহি ভাইয়া, আপ ওয়াপাস লে যাইয়ে।

ভাইয়া ডাক শুনে সিপাহী বিগলিত। শত হলেও ওমর সাহাব তার দেশী ভাই।

–ম্যায় ওয়াদা করতা, জরুর কোশেশ করেগা ডগদর ভেজ দেনেকো লিয়ে।

–শুকরিয়া।

কিছুতেই খানায় হাত দিল না ওমর। সিপাহী খাবারের ট্রে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

তৃতীয় দিনের মাথায় ডাঃ মুসা এলেন। হাসি মুখ, আপনি নাকি আমার জন্য হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছেন?

–ডাক্তারের জন্য।

–যদি অন্য ডাক্তার পাঠাত?

www.pathagar.com

–হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙ্গতাম না।

হো হো করে হেসে উঠেও হাসি বন্ধ করলেন ডাঃ মুসা।

–হুঁস্ আপনাকে উপদেশ দেই মুখ বন্ধ রাখতে, অথচ নিজের মনে থাকে না।

–হাসি বারণ নাকি?

–হাসলে ওরা মনে করে আমরা সুখে আছি। আমাদের উচিত শিক্ষা হয়নি।

ওমর শব্দ করে হেসে ফেলল।

–জানেন, এ দিকে কত কাণ্ড হয়েছে?

–না তো! বলুন।

–আপনাকে আগে চেকআপের কাজ সের নিই।

–না, ওতে সময় নষ্ট হবে!

ডাঃ মুসা গম্ভীর, আপনার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে তার কিছুটা ওদের কানে গেছে।

–বলেন কি? সর্বনাশ।

–কতকটা তাই। মেজর ইব্রাহীমের উপর যে টরচারের কাহিনী বলেছি, ভাগ্যিস সেটুকু ওদের কানে যায়নি। তাহলে আমাকে মেরেই ফেলতো।

–কেমন করে জানল?

–যুদ্ধের সময় স্পাইংয়ের নেটওয়ার্ক যে কত রকম তার ঠিক নেই। কোন বাঙ্গালীকেই যে ওরা বিশ্বাস করে না এটা তার প্রমাণ।

–এখন যে আমরা কথা বলছি তা কি ওরা শুনে ফেলবে?

–আগের সিপাহী বাংলা বুঝত, কিন্তু প্রকাশ করতো না। দরজার বাইরে থেকে সে আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছিল। তবে দয়া পরবশ হয়ে সবটুকু রিপোর্ট করেনি।

–দয়ামায়া তাহলে কিছু আছে?

–সবার মধ্যে নয়, কারো কারো মধ্যে। শর্ত হলেও মানুষ তো।

–এখন উপায়?

–ভয় পাবেন না। এই সিপাহীটি একটু লোভী। গোল্ড লীফের দু'প্যাকেট সিগারেট দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি।

–আপনাকে ওরা কি খুব অপমান করেছে?

–করুক, কয়দিন করবে? ক্যাপটেন সরফরাজের খুব রাগ আমার, আপনার এবং রোহানা চৌধুরীর উপরে।

–কেন বলুন তো? ওর ভাই মারা গেছে বলে? আর কারো ভাই মারা যায়নি? বাঙ্গালীরা মারা যাচ্ছে না?

–ভদ্রলোক সেন্টিমেন্টাল। এই ধরনের লোকরা যুক্তি মানে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। আপনাকে ভাল করে ধোলাই দিতে পারল না, রোহানা চৌধুরীকে আটকে রাখতে পারল না, আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে অপারগ। সব মেজর তওসিফের জন্য।

–কিসের চার্জ, ওমর ভয় পেয়ে বলল।

www.pathagar.com

–আমি নাকি বন্দীদের চিকিৎসার নামে খবর আদান প্রদান করি। আমার যা হোক, ওমর সাহেব সাবধান!

–কেমন করে সাবধান হবো?

–কারোর সমানে মুখ খুলবেন না। খাবার নিয়ে ঝামেলা করবেন না, ইন্টারোগেশনের সময়ে মেজাজ ঠিক রাখবেন, ইত্যাদি।

–আমি রোহানাকে দেখতে চাই।

–বলেন কি? তাকে তো কবেই ঢাকায় নিয়ে গেছে ওরা।

চমকে উঠল ওমর। বুক চেপে ধরে বলল, ওকে কি ঢাকায় আটকে রাখবে?

–না। মেজর তওসিফ নিজে নিয়ে গেছেন। মিস চৌধুরী যেখানে যেতে চাইবেন, সেখানেই ড্রপ করবেন।

–আমাকে কবে ছাড়বে?

ডাঃ মুসা চুপ।

–কথা বলছেন না কেন? আপনি যে একদিন বলেছিলেন আমি সুস্থ হলে ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে।

–রিকভারি সার্টিফিকেট দিয়ে দিন ডাঃ মুসা।

–শুনুন তাহলে। ওরা প্ল্যান বদলিয়েছে। মিস চৌধুরীকে সসম্মানে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আপনাকে দেবে না।

–আমার অপরাধ! বিস্ময়ে কণ্ঠ রোধ হলো ওমরের।

–আপনি মিস চৌধুরীকে বিয়ে করলে বাঙ্গালী পক্ষ হয়ে যাবেন। ঘর–শত্রু বিভীষণ বড় খারাপ জিনিস ওমর সাহেব, ওরা তাই ভাবে।

–আমাকে নিয়ে তাহলে কি করবে?

–ভয় নেই, টরচার করবে না। শুধু আটকে রাখবে। যুদ্ধ শেষ হলে আপনাকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবে। ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের ভাগ্নের জন্য এটাই নাকি সম্মানজনক ব্যবস্থা। আপনি নজরবন্দী হয়ে থাকবেন কোনো ক্যান্টনমেন্টে, আর কিছু না।

দম বন্ধ হয়ে আসছে ওমরের। এই ঘরটা এত গুমোট কেন? আলো নেই কেন? এটা কি পাহাড়ের অন্ধকার গুহা? নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এত কষ্ট।

ডাঃ মুসার মুখে উদ্বেগ, ওমর সাহেব এমন করছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

ডাঃ মুসার হাত চেপে ধরল ওমর, আমাকে বাঁচান ডাঃ মুসা? এখান থেকে আমাকে পালাতে সাহায্য করুন।

–আপনি কি পাগল হয়েছেন?

–হইনি,. তবে এভাবে আটকে থাকলে পাগল হয়ে যাব।

–সুস্থ হলে ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায় আপনি ভালই থাকবেন।

–আমি মুক্ত আলোয় বেঁচে থাকতে চাই, রোহানাকে দেখতে চাই।

–কি করে সম্ভব?

–আপনি শুধু লিখে দিন, আমি গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠানো প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ওখান থেকে আমি পালাব।

–যদি ধরা পড়েন?

–সে দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু এইটুকু করুন।

–ভেবে দেখি।

ডাঃ মুসার হাত ছাড়ল না ওমর। কথা আদায় করে ছাড়ল।

পাশের ঘর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। ওমর কান খাড়া করল, ওখানে কি হচ্ছে?

ডাঃ মুসার কণ্ঠে বিরক্তি, আপনি সব কিছু জানতে চান কেন?

–সরি।

ডাঃ মুসা গম্ভীর। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, ওখানেও টরচারড্ বন্দীদের রাখা হয়েছে। ওদের গায়ের চামড়া কেটে কেটে নূন মাখানো হয়েছে। এদের মধ্যে একজন গানের শিল্পী। স্বাধীনতার গান নিজেই রচনা করতেন, সুর দিতেন, গাইতেন। বড় গুণী লোক।

–বলেন কি?

–ওরা কাউকেই ছাড়ছে না। ওঁর ঘায়ে পূঁজ হয়েছে। তাই যন্ত্রণা বেশি। বাঁচবে বলে মনে হয় না। ওমর সাহেব সাবধান। পালাতে গিয়ে গুলী খেয়ে না মরেন।

–মারা গেলে যাব। এভাবে বাঁচতে চাই না।

–ক্যাপটেন সরফরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেই তো পারেন।

–কি ভাবে?

–বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবেন না, বাঙ্গালীদের দলে থাকবেন না, ওদের গুণগান গাইবেন, ইত্যাদি মুচ্‌লেকা লিখে দিন।

–আপনি ঠাট্টা করছেন?

–না।

–আপনি কখনো কোন মেয়েকে ভালবেসেছেন?

হেসে ফেললেন ডাঃ মুসা, আমার স্ত্রী ডাক্তার, একই ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী ছিলাম আমরা।

–ওঁকে আর ভালবাসবেন না। পাক আর্মিদের আণ্ডারে চাকরিটা পাকা করে নিন। সুযোগ মত এক সুন্দরী পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন।

হাসতে হাসতে ডাঃ মুসা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ডাঃ মুসা সত্যি সত্যি এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলবেন ওমর ভাবেনি। ব্রেন হেমারেজ হচ্ছে বলে সার্টিফিকেট দিয়ে হাসপাতালে পাঠানোর সুপারিশ করলেন। উপায়ন্তর না দেখে অজ্ঞান হয়ে থাকার ভান করল ওমর।

ক্যাপ্টেন সরফরাজ বিচলিত। মেজর তওসিফ রগচটা লোক। ওমর বাট মারা গেলে তাকে কোর্ট মার্শালে পাঠিয়ে ছাড়বেন। অন্য এক ডাক্তার ডাকল ক্যাপ্টেন সরফরাজ। ডাঃ চাত্তি বললেন, পালসের গতি খুব স্লো। হাসপাতালে পাঠানোই ভাল।

ওমর এখন হাসপাতালের একুশ নম্বর বেডে। আগামীকাল সকালে তার ব্রেন

www.pathagar.com

এক্সরে হবে। তার আগেই তাকে পালাতে হবে এখান থেকে। পেশোয়ারী নার্সটির সঙ্গে খাতির পাতাল ওমর। সে যে ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খানের ভাগ্নে এবং মেজর তওসিফের বিশেষ বন্ধু তা তাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ল। দবির খান সহজ আন্তরিকতায় বলল, মেরা সব কুচ মালুম হ্যায়। তোমহারা হালত এ্যায়সে কিউ হোয়া?

–বাঙ্গালী সমঝকে মার ডাল্‌নে কো লিয়ে কোশেশ্‌ কিয়া থা। ক্যাপ্টেন সরফরাজ হামকো বাঁচায়া। বহুত আচ্ছা আদমী ক্যাপটেন।

–ইধার্‌কা সবলোগ আচ্ছা হ্যায় জনাব।

–হা হা ঠিক বাত।

বার বার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে ওমরের। দবির খান বলছে, বেড প্যান লাগা দেগা?

–নেহি ভাইয়া। মেরে লিয়ে তক্‌লিফ মাত্‌ করো। হাম তো আচ্ছা হ্যায় আভি।

টয়লেট থেকে বারান্দা ঘুরে পালাল ওমর। এটা একটা অস্থায়ী ক্যাম্প। পালাতে বেগ পেতে হলো না। সবাই তাকে পাঞ্জাবী বলে চেনে। ঘোরাফেরায় বাধার সৃষ্টি করেনি।

রাতের অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না ওমর। এ দিকটা তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা। কোথায় তাকে এরা নিয়ে এসেছে তাও জানে না। শুধু ভাসাভাসা শুনেছিল এটা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া। অনুমান করে সে স্টেশনের দিকে ছুটল। সে ঢাকায় ফিরে যেতে চায়।

পথে সে ধরা পড়ল এক চেক পোস্টের কাছে। আবার সেই পুরাতন অন্ধকার সেলে। এবার সবার মুখ গম্ভীর। সিন্ধি সিপাইটিও আর ভাল করে কথা বলে না। খাবার ট্রে নিচে নামিয়ে রেখে চলে যায়। ডাঃ মুসার খোঁজ নেই।

অনবরত বমি করছে ওমর। দু'দিন কিছু খায় না। মাথা কেমন করছে। গা গুলিয়ে উঠছে, ঘামছে সে। ওমর জানে, এবার সত্যি কথা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। অথচ সত্যি তার শরীর খারাপ।

উপযাচক হয়ে সে বলে, মেরা তবিয়ত আচ্ছা নেহি হ্যায়।

–সমঝমে আতা, মগর আপকো লিয়ে কোই ডগদর নেহি মেলে গা।

–কিউ নেহি? মেরা কিয়া কসুর হ্যায়?

–কসুর জরুর হ্যায় ওমর সাহাব। আপ ভাগ গিয়া থা। আপকো লিয়ে এক মাসুম ডগদর জান দিয়া।

চমকে উঠল ওমর, কিয়া বল রাহা ভাইয়া?

–সাচ বল রাহা। আপকো লিয়ে ডগদর মুসা ঝুটা রিপোর্ট দাখিল কিয়া থা। উস লিয়ে উনকো গায়েব কর দিয়া।

–উনি বেঁচে নেই?

–এ্যায়সাই মালুম হো রাহা, উসকো কোই হদিস নেহি মিলতা।

www.pathagar.com

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ওমর। তারপর জ্ঞানহারা। যখন হুশ হলো, ঘর অন্ধকার। সিপাহী আলম খান অন্তর্হিত। চুল ভিজে। বুঝল, আলম খান তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য গ্লাসের পানি মাথায় ঢেলেছে। খাবারের ট্রে নেই। চোখ বুঁজল ওমর। অবিরল ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখের কোল বেয়ে। ঠাণ্ডা মেঝে ভিজতে লাগল।

ওমর যতদিন বেঁচে ছিল তার মন থেকে এই মহান হৃদয় ডাক্তার মুসার স্মৃতি কোনদিন মুছে যায়নি। প্রতিদিন রাতে তাঁর হাসি হাসি সদয় মুখ ভেসে উঠত চোখের সামনে। ওমরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কখনো যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন, কখনো আবেগ দিয়ে, শাসনও করছেন কোন কোন সময়। বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিতে অনুরোধ করছেন। ওমর শোনেনি। তার জিদের কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি নতি স্বীকার করেছেন হৃদয়ের স্নেহ, উদারতা এবং বন্ধুত্ব দিয়ে। ওমর তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। জীবনের এই গ্লানি, অপরাধবোধ সে কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে না।

এক প্লাবিত ভালবাসার কৃতজ্ঞতায় ওমরের মন ভরে ওঠে। হৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে আবেগ মথিত অশ্রু কলকল করে ওঠে। মনে মনে বলে, রোহানা, তোমার ভালবাসায় একজন ভাগ বসিয়েছে, সে একজন পুরুষ। যখন তোমাকে আমি আদর করব, ডাঃ মুসা হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলবেন, আমি তোমার জন্য জীবন দিয়েছি বলে তুমি আজ ওকে আদর করতে পারছ। যখন তোমার সব অস্তিত্ব আমার ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে, ডাঃ মুসা বলবেন, আমি তোমাদের কাছেই আছি। হাত বাড়াও, ছুঁয়ে দ্যাখো, অস্তিত্বে অস্তিত্বে কি নিবিড় বন্ধন। সত্যি সত্যি অন্ধকারে হাত প্রসারিত করে ওমর। শূন্যতার মধ্যে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

মেজর তওসিফ ফিরে এলেন ঢাকা থেকে। ওমরকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। ওমর মনে মনে প্রস্তুত। সে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু মেজর তওসিফ এসব প্রশ্নের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। বললেন, আপনি খাওয়া দাওয়া করছেন না কেন?

–আমার ইচ্ছে করে না।

–আপনি আমাদের বন্দী নন।

–তাহলে কি?

–জাস্ট হেফাজতে রেখেছি।

–এর নাম হেফাজত?

মেজর তওসিফ একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, চারদিক থেকে মুক্তিরা আমাদের ঘিরে রেখেছে। আমরাই বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি যাবেন কেমন করে?

–সে দায়িত্ব আমার।

–ব্রিগেডিয়ার মাসুদ খান যদি তাঁর মৃত্যুর সময়ে আপনার দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দিয়ে না যেতেন তাহলে তা সম্ভব হতো। এখন নয়।

–এ ভাবে কি মানুষ বাঁচে?

–হয়তো বাঁচে না। আমরা এ যাত্রা না বাঁচলে আপনিও বাঁচবেন না। বেরুবার

www.pathagar.com

পথ এবং উপায় খুঁজছি। যদি বেরুতে পারি আপনাকে ছেড়ে দেব।

–সাচ বাত?

–হ্যাঁ, এবার যান, খাওয়া দাওয়া করুন। ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিন।

চলে আসার হুকুম পেয়ে ওমর সামনে এগিয়ে পিছন ফিরল, মেজর।

–বলুন।

–ডাঃ মুসার কোন অপরাধ ছিল না, সব দোষ আমার।

মুহূর্তের মধ্যে মেজর তওসিফের চেহারা বদলে গেল। চোখ রক্তবর্ণ, মুখ কাল, চিৎকার করে উঠলেন, স্টপ ইট। যান।

ওমর অবাক। এক মুহূর্ত আগে যিনি ছিলেন বন্ধু ভাবাপন্ন এখন তিনি উগ্র এবং হিংস্র। কে জানে, কেন?

এক রাতের শেষ প্রহরে মিলিটারি কনভয়ের একটা জীপে ওমরকে ওঠানো হলো। দেখল অন্যান্যদের সঙ্গে মেজর তওসিফ বসে আছেন।

–আমরা কোথায় যাচ্ছি, ওমর প্রশ্ন করল।

উত্তর আশা করেনি ওমর, কিন্তু শুনল মেজর তওসিফ বলছেন, আপাতত মিরসরাই যাচ্ছি। ওখান থেকে সীতাকুন্ড হয়ে চিটাগাং। ওমর বাট, চিটাগংয়ের ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া বেশ সুরক্ষিত। ওখান পর্যন্ত যেতে পারলে আমরা নিরাপদ। তোমাকে ওখানে ছেড়ে দেব। তুমি ওখান থেকে ট্রেনে অথবা বাসে ঢাকায় চলে যেতে পারবে। মিস চৌধুরী বলেছেন, তুমি তোমার পুরোনো প্রিন্টিং প্রেসে ফিরে গেলে তাঁর ঠিকানা পাবে।

মুক্তির কথা শুনে আনন্দে ওমরের কেঁদে ফেলার উপক্রম। তাহলে ডাঃ মুসার কাছে যা শুনেছিল তার সবটা সত্যি নয়। এমনও হতে পারে, তিনি যা শুনেছিলেন সেই প্ল্যানের পরিবর্তন করেছেন মেজর তওসিফ। সুখে এবং উল্লাসে মেজর তওসিফকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেল ওমর।

কখনো গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে, কখনো নিভিয়ে কনভয়ের গাড়িগুলো চলতে থাকল নিঃশব্দে। গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ, আর কোন শব্দ নেই। কেউ কথা বলছে না। সবার হাতেই যুদ্ধাস্ত্র। আক্রান্ত হলেই আক্রমণ করবে, নচেৎ নয়। তবু রাতের অন্ধকার বিভীষিকাময়। গায়ে গায়ে যেন মিশে আছে বিপদ। অন্ধকারে ঝোপঝাড় বাতাসে একটু নড়ে উঠলেই সবার হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে ওঠে। জীবনের এই শিহরণমূলক যন্ত্রণা অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। শিরা উপশিরায় রক্ত টগবগ করে ভয়-বিহ্বল অনুরণের উত্তেজনায়। মস্তিষ্কে কেমন এক শূন্যতা। বিপদ সামনে অথচ বিপদ আসছে না, অনিশ্চয়তার এই ক্লিষ্টতা আবেগকে করে তোলে দহনময়। অনুভূতি বিবশ বেদনায় ম্রিয়মান। আকাশে তারাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কখনো মিটমিট করে, কখনো হারিয়ে যায় সুরমা রংয়ের মেঘের আড়ালে। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। সেও আজ আকাশের নীলিমা রহস্যে খেলা করছে। যুদ্ধের এই জীবন কত রহস্যময়, লীলাময়, অনিশ্চিত

www.pathagar.com

বেদনায় অশ্রুসিক্ত। এই আছে এই নেই, জীবনের এই পরম বিস্ময় জীবনকে করে তোলে বেপরোয়া, কোমলতা বর্জিত রুক্ষ মরুভূমি। পথিক হাঁটছে তপ্ত বালুকণা পেরিয়ে। যে কোন সময়ে ধূলোর ঝড় উঠে তার সমাধি রচনা করতে পারে। জীবনের এই রুক্ষতার মধ্যেও তার একটা লক্ষ্য থাকে মরুভূমির সীমানা পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো।

এই সব খাঁকি পোষাক পরা রুক্ষ তামাটে মুখের মানুষগুলোও ভাবে গৃহের আরামের কথা। প্রিয় মুখের স্নেহসিক্ত অভিব্যক্তির কথা। যুদ্ধ শেষে আবার তারা হারানো দিনগুলোর আনন্দঘন উৎসব এবং ভালবাসা ফিরে পেতে চায়।

নির্বিঘ্নে এতটা পথ তারা পাড়ি দেবে কেউই ভাবেনি। শুভপুরের কাছে এসে মেজর তওসিফ হুকুম দিলেন, সবাই নাম। এখানে একটা সেতু আছে। ড্রাইভারকে বললেন, সেতু পার হয়ে ওপারে যেতে।

ওমর বাট গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেতুটিতে নিশ্চয়ই মাইন ফিট করা আছে। কনভয়ের গাড়িগুলো সেতুর উপরে উঠলেই ব্রীজসহ এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। বিস্ময়কর ভাবে প্রথম গাড়িটি নির্বিঘ্নে পার হলো। তারপর একে একে সবগুলো গাড়ি। মেজর তওসিফ তাঁর সৈন্যদের এবং ওমর বাটকে সঙ্গে নিয়ে সেতু পার হলেন পাঁয়ে হেঁটে। সকলের মুখ তখন আনন্দোজ্জ্বল। এপারে এসে মেজর তওসিফ হুকুম দিলেন, সেতু ভেঙ্গে ফেল।

এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মেজরের কণ্ঠস্বরে হুকুমের দৃঢ়তা, যা বলছি তাড়াতাড়ি কর।

–মেজর, মাইন ফিট করতে সময় লাগবে।

অত সময় আমাদের হাতে নেই। দা, কুড়াল, শাবল যা আছে তাই দিয়ে সেতুটাকে অকেজো করে দাও।

–ইয়েস মেজর।

শেষ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে শব্দ হতে লাগল ঠুক্‌ঠুক ঠুক্‌ঠাক। স্তব্ধ প্রহরের বুকে মানুষের হাতের হাতিয়ার আঁচড় কাটতে লাগল বিড়ালের নখের মত। মেজর তওসিফ এক সময় নিজেও হাত লাগালেন কাজে।

নির্জন পাড়ে ওমর বাট একা দাঁড়িয়ে। সে ধীর মস্তিষ্কে ব্রীজ ভাঙ্গার কারণ খুঁজতে লাগল নিঃশব্দ গণনায়। একটাই কারণ হতে পারে, মুক্তি ফৌজ যাতে সহজে ব্রীজ পার হয়ে তাদের যাত্রার অগ্রগতি বিঘ্নিত না করে। ব্রীজ মেরামত করতে ওদের যে সময় লাগবে ততক্ষণে পাক বাহিনী গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে।

ওমরের দৃষ্টি অন্ধকারে মেলে আছে প্রসারিত অনেকগুলো হাতের ব্যস্তময় দক্ষতায়। ওদের চোখগুলো কি রাতের আঁধারে জ্বলজ্বল করছে বিড়ালের চোখের মত। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি এবং সজাগ ইন্দ্রিয় কি তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়ে উঠেছে ওদের অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে? কেমন একটা ভয় জড়িয়ে ধরল ওমর বাটকে। এই মুহূর্তে যদি মুক্তিযোদ্ধারা

www.pathagar.com

আক্রমণ করে, সবাইকে নিকেশ করে দেবে। দু'তিনজন গার্ড ছাড়া আর কারো হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। সবাই ব্যস্ত। একাগ্রতায় নিমগ্ন। শুধু গার্ড দু'জন ঘুরে ফিরে এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছে। মাঝে মাঝে শক্তিশালী টর্চের আলো এদিক ওদিক ঘুরছে বিদ্যুত চমকের মত। সামান্য শব্দেই গার্ডরা চমকে উঠছে, বুঝতে চেষ্টা করছে কিসের শব্দ। বুট জুতো ঠুকে বুক উঁচিয়ে অস্ত্র তাক করছে। ওমরের বলতে ইচ্ছে করছে, ওগুলো নিশাচর পাখি, ভয় পেয়ো না। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম নেই।

নিজের জীবনের জন্য আজ কেন যে এত ভয় ওমর জানে না। টরচার সেলেও সে এত ভয় পায়নি। তাহলে মানুষ কি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ভয়কে জয় করে? তা না হলে ফাঁসির আসামীরা ভয়ে ত্রাসে আগেই মারা যেত। বরং তারা দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভয়াবহ মৃত্যুকে বরণ করে। সে তখন বাঁচার স্বপ্ন দেখে না, মরণকেও ভয় পায় না। মানুষ যখন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পায় তখন সে আনন্দে হরিষে কেঁদে একাকার। জীবন তার কাছে ফিরে আসে সৌন্দর্যময় মাধুর্যের হাত বাড়িয়ে। তখন তার নতুনভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে, জীবনকে নতুনভাবে ভোগ করতে ইচ্ছে করে। এই আকাংখাময় পরিতৃপ্তির নামই হয়তো জীবন।

ওমর মুক্তি পাবে, রোহানাকে ফিরে পাবে, এই অদম্য ইচ্ছে রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে চলে ঝড়ো বাতাসের মত। রোহানার বুকে আশ্রয় পাওয়া হবে নিবিড় মগ্নতার বিস্ময়কর সুখ।

খোলা প্রান্তর সাঁতরে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে ঝাঁপিয়ে। কি ঠাণ্ডা আমেজ, ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এই শীতলতা মানুষগুলোর পরিশ্রান্ত মুখ ঠাণ্ডা করেনি। ঘামে ভেজা। খাকি পোশাকের উপর ভিজে আমেজ ভেসে উঠেছে। স্যাঁতসেতে মাটির মত। চুল লেপ্‌টে গেছে কপালের উপর। কাজ শেষ।

মেজর তওসিফের হুকুমে গাড়িতে উঠে বসল সবাই। এরা যেন মানুষ নয়, যন্ত্র। চাবি টিপলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। গাড়ির গতি এবার দ্বিগুণ। দূর থেকে কুমিরার পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে পাহাড়টা যেন কালো মাটির ঢিবি। গাছের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। এর ফাঁকে একটা বাড়ি ধূসর দেহ নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দুর্গের মত।

মেজর তওসিফ স্পষ্ট স্বরেই বললেন, মিঃ বাট, ঐ যে ধুঁয়ার মত অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছেন ওটা আমাদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি। ওখানে পৌঁছতে পারলেই আমরা নিরাপদ।

–আমরা প্রায় এসে গেছি, ওমরের খুশি খুশি ভাব।

–আমারো তাই মনে হয়।

কথা শেষ হতে না হতে মর্টারের শেল আর মেশিন গানের গুলী ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে লাগল গাড়ির চারপাশে।

মেজর তওসিফ হুকুম দিলেন, গেট ডাউন এ্যান্ড টেক পজিশন।

নামতে নামতেই দশ বারো জন পাক সেনা গুলী খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মেজর তওসিফ চিৎকার করে বললেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের আক্রমণ করেছে। মিঃ

www.pathagar.com

বাট, আপনি কোথায়? যেখানেই থাকুন, একটা গাড়ির কভার নিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ওমর বাট হতভম্ব। একটু আগেই সে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। মুক্তির স্বপ্ন, ভালবাসার স্বপ্ন। মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল। পাক সেনারাও পাল্টা গুলী ছুঁড়তে লাগল। লাভ হচ্ছে বলে মনে হলো না। পতঙ্গের মত মরতে লাগল তারা।

মুক্তিযোদ্ধাদের গুলী আসছে চারদিক থেকে। ওদের অবস্থান ভাল করে বোঝার উপায় নেই। এদিকে আবছা অন্ধকারে পাক মিলিটারি কনভয়ের গাড়িগুলোর ধাতব দেহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ির দেহ গুলীতে ফুটো হয়ে যাচ্ছে। তেলের ট্যাংকে গুলী লাগলে গাড়ি বিস্ফোরিত হবে। কভারে কোন কাজ হবে না।

গোলাগুলীর শব্দ ভেদ করে মেজর তওসিফের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওহ গড, উই আর কট ইন ট্র্যাপ। মিঃ বাট, আর ইউ ওকে?

গভীর কৃতজ্ঞতায় ওমরের অন্তর ভরপূর। এত কঠিন বিপদের মধ্যে তার খোঁজ নিচ্ছেন মেজর তওসিফ। সে বলে দিল, ইয়েস মেজর, ডোন্ট ওরি ফর মী। প্লীজ ডু ইয়োর ডিউটি প্রপারলি।

মেজর তওসিফের কণ্ঠস্বর ভেসে এল প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দের মধ্যে, আই হ্যাভ নাথিং টু ডু মোর দ্যান টু ডাই।

ওমর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আমি বাঁচতে চাই না।

–ডোন্ট বী চাইল্ডিশ মাই ফ্রেন্ড। নিজের পরিচয় দিয়ো, বাঁচতে চেষ্টা করো, গুড বাই।

ভোর হলো। জন আষ্টেক সৈন্য ছাড়া বাকী সবাই হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে। রক্ত জমাট হয়ে আছে ওদের ইউনিফরমে। হাতের রাইফেলগুলো আগেই নিয়ে গেছে মুক্তিফৌজরা। মেজর তওসিফকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। দু'হাত উঁচু করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একজন মুক্তি কমান্ডারের সামনে।

ভোরের সাদা আলোয় দু'জন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। বিস্ময়কর কণ্ঠে মেজর তওসিফ বলে উঠলেন, তুমি সুবেদার ফৈজী না?

অপর ব্যক্তির উত্তর, আমি মেজর ফৈজী। তোমার সম পদমর্যাদাভুক্ত।

ঊনিশ'শ পয়ষট্টি সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে আমরা লাহোর সেক্টরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। আমি তোমাকে কমান্ড করছিলাম।

–এখন আমি তোমাকে কমান্ড করবো, মেজর ফৈজীর উত্তর।

–ঐ সেক্টরের যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয় উল্লাসে আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

–ওটা অতীতের কথা।

–অতীত বর্তমানের ভিত রচনা করে মেজর ফৈজী।

–সব সময় করে না। অতীত নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর বর্তমান গড়ে ওঠে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন মেজর তওসিফ, হয়তো তাই। সেদিন ইন্ডিয়া আমাদের উভয়ের শত্রু ছিল আজ সে তোমাদের বন্ধু। আমরা তোমাদের শত্রু।

www.pathagar.com

–মেজর তওসিফ, অতীত ঘেঁটে সময় নষ্ট করার মত ইমোশনাল না হওয়াই ভাল।

–কি করতে চাও তুমি?

–পাহাড়ের ঐ ঘাঁটির উপর কত সৈন্য আছে তোমাদের?

–বলব না।

–তুমি যদি ওদের সারেন্ডার করতে বল, তাহলে রক্তপাত এড়ানো যায়। তুমিও প্রাণে বাঁচতে পার। তোমাকে শুধু বন্দী করে রাখব।

বিষন্ন হাসলেন মেজর তওসিফ। কোন উত্তর দিলেন না।

–তুমি রাজি?

–প্রলাপ বকো না মেজর ফৈজী।

–তাহলে......

–যা করার কর। শুধু একটা অনুরোধ, এখানে আধা বাঙ্গালী আধা বিহারী এক ভদ্রলোক আছে। সিভিলিয়ান, নির্দোষ। একটি বাঙ্গালী মেয়েকে ভালবাসে, বিয়ে করবে। পার যদি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখো, ও আহত। কথা শেষ হতেই মেজর ফৈজী রাইফেল তাক করলেন। গুলী খেয়ে মেজর তওসিফ লুটিয়ে পড়লেন পাহাড়ের ঢালে ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের উপর।

মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল ওমর বাট। কড়া হুকুম শোনা গেল মেজর ফৈজীর, মিঃ বাট এদিকে চলে আসুন।

ওমর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনুভূতিশূন্য। দু'জন মুক্তিযোদ্ধা ধরে নিয়ে এল ওমর বাটকে। মেজর ফৈজী হুকুম দিলেন, একে দূরে সরিয়ে রাখো। ওমর বাট মেশিন গানের গুলীর শব্দ শুনল, ছরর্ ছরর্।

বুঝল, বাকী পাক সৈন্যদের মেরে ফেলা হলো ব্রাশফায়ার করে।

জীবনের উপর এত বীতশ্রদ্ধ ওমর বাট আর কখনো হয়নি। কিছুক্ষণ আগেও সে জীবনের স্বপ্ন দেখছিল, বেদনাঘন আনন্দের স্বপ্ন দেখছিল। মুহূর্তে সব তছনছ হয়ে গেল। সব এখন বিস্বাদ এবং তিক্ত। মেজর তওসিফের মৃত্যু তার স্নায়ুকে বিবশ করে দিয়েছে। তাঁর মত ভদ্র, সজ্জন, উদার হৃদয়ের লোকও যুদ্ধে নিহত হয়। কে বাঁধায় এই যুদ্ধ? এই যুদ্ধ কি ধরনের কল্যাণ বয়ে আনে? শক্তিধরদের যুদ্ধ না বাঁধালেই কি চলে না? সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা আর আধিপত্যবাদ বিবেকের কাছে কেন পরাজিত হয় না? মানুষ কেন বোঝে না, একমাত্র বিশ্ব প্রভু সত্য, চিরস্থায়ী, চিরকল্যাণময়। আর সব অস্থায়ী, মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছেই ফিরে যেতে হবে, জবাবদিহিও করতে হবে কৃতকর্মের জন্য। অবিনশ্বর এই সত্য মানুষ ভুলে যায় বলেই যুদ্ধ বাঁধায়, ক্ষমতার বড়াই করে। সেই ক্ষমতার যুপকাষ্ঠে বলি হয় লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ।

–মিঃ বাট চলুন, মেজর ফৈজীর হুকুম।

–কোথায় যাব?

–আমাদের সঙ্গে।

–কোন অর্থ হয় না। ছেড়ে দিলে এখানেই দিন, নইলে গুলী করুন।

www.pathagar.com

–এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আপনার কাজ কর্ম আমাদের অজানা নয়। গুলী করলেও অপরাধ হবে না।

–গুলী করুন, না করেছে কে? কার্যকলাপ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?

–নিজে জানেন না? পাক আর্মিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ক্ষোভে ফেটে পড়ল ওমর বাট, বন্দী থাকাটা যদি সন্দেহের কারণ হয়, তাহলে এখন তো আমি আপনাদের হাতে বন্দী, পাক আর্মিরাও তাহলে এখন সন্দেহ করতে পারে।

–এত কথা শুনতে চাই না। ওই পাহাড়ী ঘাঁটি এখন আমাদের দখল করতে হবে। ওটা চাঁটগা দখলের স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট।

–এসব আমাকে বলছেন কেন? আমি কি যুদ্ধ বিশারদ? নাকি আপনাদের দলের লোক?

–কোন দলের লোক আপনি?

– কোন দলের নই। দু'দলই আমাকে নির্যাতন করছে। আমি মৃত্যু চাই না, লাঞ্ছনা গঞ্জনা চাই না। বারবার এই অত্যাচার চাই না।

–আপনার এই না চাওয়ারও খেসারত দিতে হবে একদিন, মনে করবেন না, নিরপেক্ষ থাকলেই শাস্তি এড়ানো যায়। আপনি এবং মিস চৌধুরী যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের লিস্টে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

–তাহলে ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন? মেরে ফেললেই তো পারেন।

–আপনাদের সময় দিচ্ছি।

–ফাঁসির আসামীকে সময় দেয়া একটা যন্ত্রণার ব্যাপার, এটুকু বোঝেন?

মেজর ফৈজী উত্তর দিলেন না, সৈন্যদের হুকুম দিলেন, মার্চ ফরওয়ার্ড।

আশ্চর্য, ঘাঁটিতে বেশি সৈন্য ছিল না। মেজর তওসিফের এক ডিভিশন সৈন্যের শোচনীয় পরিণতি দেখে অনেকেই ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চাটগাঁয়ের দিকে চলে গেছে। বাকী সৈন্যরা প্রতিরোধ করেছিল। সবাই মারা পড়ল। সহজেই ঘাঁটি মুক্তি ফৌজদের দখলে চলে এল।

মেজর ফৈজী গম্ভীর, মেজর তওসিফ পাহাড়ী এই ঘাঁটির অবস্থা জানতেন। যুদ্ধ হলে তারা হেরে যাবে তাও জানতেন। ঘাঁটি তাদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের জান বাঁচাতে পারতেন, করেননি। বিরাট শ্রদ্ধাবোধ ছেয়ে ফেলল মেজর ফৈজীর হৃদয়কে। অনেক টুকরো টুকরো মধুর স্মৃতি মনে পড়ল ঊনিশ শ' পয়ষট্টি সালের যুদ্ধকে ঘিরে। সেদিনও মেজর তওসিফ একজন খাঁটি যোদ্ধা, খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। মেজর ফৈজী নিজে সেদিন ছিলেন সামান্য হাবিলদার। কিন্তু মেজর তওসিফ তার নিম্নপদস্থ সৈনিক এবং অফিসারদের সম্মান এবং গুরুত্ব দিতেন। যুদ্ধের বাইরে ব্যবহার করতেন বন্ধুর মত। গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন মেজর ফৈজী। তারপর নিজের কাঁধের রাইফেল মাটিতে ঠক করে নামিয়ে পায়ের বুট ঠুকে নিচের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে স্যালুট দিলেন। ওখানে মেজর তওসিফের জীবনহীন দেহ পড়ে আছে নির্জীব ঘাসের উপরে।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে ওমর বাট নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। তার

www.pathagar.com

মাথার বাঁ পাশে গুলী লেগেছিল। বেশ কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধাও ছিল এই ওয়ার্ডে। মোটে একজন ডাক্তার, তিনজন নার্স আহতদের সেবায় নিয়োজিত। বেশ কিছু আর্মড মুক্তিযোদ্ধা পাহাড়টিকে ঘিরে রেখেছে, যাতে পাক আর্মিরা এই পাহাড়ী ঘাঁটিটা পুনরায় দখল করতে না আসে।

প্রথম দিন ডাক্তারকে দেখে ওমর বাট চমকে উঠল। আধা অচৈতন্য অবস্থায় বিড়বিড় করতে লাগল, ডাঃ মুসা, আপনি এখানে কেন?

বিরক্ত কণ্ঠের উত্তর এল, আমি ডাঃ মুসা নই। ডাঃ ঈসা।

–এক রকম চেহারা কেন?

–চুপ করুন।

বিকারের মধ্যেই ডাঃ ঈসার হাত টেনে নিয়ে ওমর বারবার চুমু খেতে লাগল। ডাঃ ঈসা হাত টেনে নিলেন। ওমর বাটের হাতে ইনজেকশন সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, শান্ত হয়ে ঘুমান।

ওমর বাট ঘুমে অচেতন। যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখল একজন নার্স তার মাথার কাছে বসে তার শারীরিক অবস্থার চার্ট লিখছে।

–ডাঃ মুসা কোথায়?

নার্সের চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, এই নামে এখানে কেউ নেই।

–তাহলে কি যেন নাম?

–আপনি সম্ভবতঃ ডাঃ ঈসার কথা বলছেন।

–হ্যাঁ।

–তিনি রাউন্ডে গেছেন। আপনার পাল্স স্বাভাবিক গতিতে চলছে। আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

–আমি ডাঃ ঈসার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

–আবার কি কথা? উনি আপনাকে দেখে গেছেন।

–আমি কথা বলার কথা বলছি।

–ডাক্তারদের গল্প করার সময় নেই। উনি অন্য জায়গায় ডিউটিতে গেছেন। আগামীকাল সকালে আসবেন। তখন বলবেন।

–আমি যদি তখন ঘুমিয়ে থাকি, ডেকে দেবেন?

–রোগী ঘুমিয়ে থাকলে ডাকার নিয়ম নেই।

–আমি বলছি।

–আপনি ডাক্তার নন। আমরা রোগীর হুকুমে চলি না, ডাক্তারের পরামর্শে চলি।

ওমর রাগ করে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করল।

নার্স হাসল। বলল, মিঃ ওমর, ডাঃ ঈসা অন্যরকম মানুষ। তাকে বিরক্ত না করলেই তিনি খুশি হবেন।

–কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

–কিছু না।

–আপনি খুলে না বললে আমি ওষুধ-পথ্য কিছু খাব না।

www.pathagar.com

–আচ্ছা ছেলেমানুষ তো?

ওমরের চোখে পানি।

–আচ্ছা আচ্ছা বলছি বাবা, মেয়েদের মত কাঁদবেন না। আপনি কি জানেন, ডাঃ ঈসা, ডাঃ মুসার ছোট ভাই?

ওমরের হৃদপিন্ড লাফিয়ে উঠল, বলেন কি?

–সত্যি, ডাঃ মুসার মৃত্যুর জন্য কে একজন বিহারী নাকি দায়ী। তাই ডাঃ ঈসা বিহারী পাঞ্জাবীদের উপরে বেজায় চটা, আপনি বিহারী, তাই না?

–আধা বিহারী আধা পাঞ্জাবী।

–সে আবার কি রকম?

–আমার পূর্ব পুরুষ বিহারী। আমি জন্মেছি পাঞ্জাবে।

–কথা একই, ডাঃ ঈসাকে এসব বলবেন না।

–সিস্টার একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

অপেক্ষা করে রইল সিস্টার।

–মানুষে মানুষে এত পার্থক্য কেন?

–এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে বৈচিত্র এবং বৈশিষ্ট ভিন্ন থাকবেই।

–উদারতা সব মানুষের মধ্যে থাকলে ক্ষতি কি?

–হঠাৎ এতসব ভাবছেন কেন? আপনি কি ডাঃ মুসাকে চিনতেন?

সিস্টারের মুখে সন্দেহের ছায়া, সতর্ক হলো ওমর বাট। কিছু সময় চুপ করে রইল সিস্টার, তারপর বলল, যদি ডাঃ মুসাকে চেনেনও, স্বীকার করবেন না। উনি তাহলে আপনার চিকিৎসা করবেন না। আপনার আরো কিছুদিন চিকিৎসা একান্ত দরকার।

–আশ্চর্য, আপনি কেন আমাকে এত সহানুভূতি দেখাচ্ছেন?

চুপ করে রইল সিস্টার, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর কথা বলল ধীর গতিতে, আমরা বাপ–মা মরা দু'বোন। ছোট বোনটাকে কোলে পিঠে করে আমিই মানুষ করেছি। হোমায়রা আমাকে মায়ের মতই জানতো। বড় হয়ে ও নিজের ইচ্ছেয় এক পশ্চিম পাকিস্তানীকে বিয়ে করে করাচীতে চলে যায়। দেশটা এখন দু'ভাগ হয়ে গেছে। হয়তো ও আর কোনদিন এদেশে আসতে পারবে না। প্রতিমাসে ও আমাকে চিঠি লিখতো, এই আট মাসে ওর আর কোন খবর জানিনা। বড় কষ্ট হচ্ছে ওমর বাট। সংসারে এই বোনটি ছাড়া আমার আর কেউ আপনজন নেই।

–তাই বুঝি আমাকে আপনজন ভেবে সাবধান করছেন।

–অস্বীকার করতে পারব না।

–সিস্টার?

–বলুন।

আপনার বোন যদি পশ্চিম পাকিস্তানী বিয়ে না করতো আপনি কি আমাকে ঘৃণা করতেন?

–ভাই, কিছু মনে করবেন না। মানুষ একই থাকে, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বদলে দেয়। আমি অন্য পরিস্থিতিতে কি করতাম, তা এখন বলতে পারব না।

www.pathagar.com

–ধন্যবাদ। সিস্টার আপনি খুব সত্যনিষ্ঠ। এমন মানুষরাই জীবনে কষ্ট পায়। মানুষ তাদের চিনতে পারে না, বুঝতেও পারে না।

সিস্টার মরিয়মের দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, ওমর বাট, আপনি বড় ভাল ছেলে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আবার, বলল, আসি তাহলে।

–আসুন।

পরের দিন সকাল আটটায় ডাঃ ঈসা হাসপাতালের ওয়ার্ড ভিজিটে এলেন, জেগে ছিল ওমর বাট। হাত বাড়িয়ে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাঃ ঈসা করমর্দন করলেন। হাতে উদাসীন শীতলতা। নিস্পৃহ কণ্ঠ, কেমন আছেন?

–আপনার কেমন মনে হয়?

–ভালই। তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাবেন।

–আবার কি আপনাদের কাফেলায় শরীক হতে হবে?

–আমাদের কোন কাফেলা নেই। ইচ্ছে করলে আজকেই চলে যেতে পারেন।

–চলে যাওয়ার মত কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে?

–তাহলে চুপ করে থাকুন। আবোল তাবোল বকবেন না।

–আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন?

–আমার ভ্রাতৃহন্তার সঙ্গে আর কিভাবে কথা বলব?

–দেখুন, ডাঃ মুসাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। এখনো ভালবাসি।

–ভালবাসার প্রতিদান তো ভালই দিয়েছেন।

–ওটা ডাঃ মুসার ভবিতব্য। উনিও জানতেন না, আমিও বুঝিনি। অন্তরে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্য ডাঃ ঈসা চুপ করে রইলেন। তারপর স্বগোক্তির মত বললেন, কত করে বললাম দুশমনদের আন্ডারে চাকরি না করতে, শুনলেন না। উনি বাঙ্গালী টরচারড্ বন্দীদের সেবা করবেন।

–ওর ইচ্ছা সফল হয়েছে। তাঁর সেবাযত্নে অনেক অত্যাচারিত বন্দী জীবন ফিরে পেয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন জেলে আছে। দেশ স্বাধীন হলে মুক্তি পাবে।

–কিন্তু আমার ভাইকে তো জীবন দিতে হলো।

–জীবন কোন না কোনভাবে যাবেই। তার এই ত্যাগের জীবন বিসর্জন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডাঃ ঈসার কণ্ঠে এখন কোমলতার স্পর্শ। বললেন, মিঃ বাট, প্রিয়জনের মৃত্যু ভাবাবেগের বিনিময়ে গ্রহণ করা যায় না, তা এত যন্ত্রণাদায়ক এবং দুঃখময়।

–জানি ডাঃ ঈসা। এই হাসপাতালও যুদ্ধ ঘাঁটি ছিল। দু'পক্ষের আক্রমণের মুখে পড়েছিল। তখন আপনি এখানেই ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি মারা যেতে পারতেন। ভাগ্য গুণে বেঁচে আছেন। গুলী খেয়ে আমি মরে যেতে পারতাম। কিন্তু বেঁচে আছি। আমি মারা গেলে যুদ্ধের সাধারণ ফলাফল হিসাবেই মানুষ ধরে নিত। আপনি মারা গেলে দেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল ত্যাগের দৃষ্টান্ত হিসাবে

www.pathagar.com

মানুষ গণ্য করতো। ওটাও হতো ভাবাবেগ।

ডাঃ ঈসা চুপ করে রইলেন। চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যাওয়ার সময়ে বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন। এত কথা বলবেন না। ব্রেনের ক্ষতি হবে। আমার মনে হয়, আপনার এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া ভাল।

–ধন্যবাদ ডাঃ ঈসা।

ডাঃ ঈসা নিজেই হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্য। এ হাত এখন কত উষ্ণ এবং কোমল।

পরদিন সিস্টার মরিয়ম এক গাল হাসিমুখ নিয়ে এগিয়ে এল, কি ডাঃ ঈসার সঙ্গে ভাব হলো?

–হ্যাঁ, চমৎকার লোক।

–প্রথম দিকে তার এটিচিউড কিন্তু খুব কড়া ছিল।

–স্বাভাবিক, প্রিয়জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু মানুষকে বড় কষ্ট দেয়।

–আপনি বোধহয় যাদু জানেন, এমন মেজাজকে ঠান্ডা করে দিলেন?

–আমার কোন ক্রেডিট নেই, ডাঃ ঈসাই খুব ভাল লোক।

–দেখতে হবে তো কার ভাই। ওমর বাট, আপনি নিজেও একজন ভাল লোক।

–কই! নাতো। আমি আধা বিহারী, আধা পাঞ্জাবী, বাঙ্গালীদের ঘৃণ্য শত্রু।

–ওমন করে ভাববেন না ওমর বাট।

–অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ কথা বলে, আমিও তাই বলছি।

–আপনি বেঁচে আছেন।

–আপনাদের দয়ার উপর।

ছলছল করে উঠল সিস্টার মরিয়মের চোখ।

ওমর বলল, সরি, মাপ করবেন।

দু'জনেই চুপ।

–একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ওমর নীরবতা ভেঙ্গে বলল।

–করুন।

–মেজর তওসিফের লাশ কি----?

সিস্টার হাত উঁচিয়ে কথা শেষ করতে দিল না। ফিসফিস করে বলল, ওর লাশ ওখানেই দাফন করে গেছেন মেজর ফৈজী। আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, এখানের সব লোক এক রকম না, বিপদে পড়বেন।

দু'জনের মধ্যে আবার নীরবতা নেমে এল। এবার সরব হলো সিস্টার মরিয়ম, আপনার তো পশ্চিম পাকিস্তানের কত লোকের সঙ্গে পরিচয়। ঠিকানা দিলে আমার বোনের একটা খবর এনে দিতে পারবেন?

ওমর বলতে পারল না, আজ সেটা সম্ভব না। শুধু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, পশ্চিম পাকিস্তানে কোন যুদ্ধ নেই। ওরা ওখানে ভালই আছেন। অযথা চিন্তা করবেন না।

–আমার ভগ্নীপতি ডিফেন্সের লোক। ওরা যদি তাকে এ দেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে? তার যদি কিছু হয়?

www.pathagar.com

–সিস্টার, সে এখানে থাকলে আপনাকে অন্ততঃপক্ষে একটা মেসেজ পাঠাতো।

–পাঠাবে না। আমি ওদের বিয়ে মেনে নিইনি। এখন বুঝতে পারছি, এটা ঠিক হয়নি। বোনটা এত আদরের, এতদূরে চলে গেল, বিয়ের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করল না, এই সব রাগ।

ওমর হেসে বলল, রাগ নয়, অভিমান।

সিস্টারও হাসল।

–তাহলে ঠিকানা দিই?

–দিন।

দিন পাঁচেক পরেই দুপুরের দিকে টিলার উপর থেকে ওমর বাট সমতল ভূমিতে নেমে এল। কেউ তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়নি। আহত মুক্তিযোদ্ধারা তার দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সিস্টার মরিয়ম তার হাতে রিলিজ অর্ডার গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ত্যাগ করেছিল। কেন, কে জানে?

নিঃসঙ্গ পথিকের মত ওমরের মন শূন্য। প্রান্তর খুব মসৃণ না, ঘাসে ঢাকা। এখানে ওখানে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা। ওমর এসবের ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে মেজর তওসিফের কবর খুঁজতে লাগল। সদ্য এক নতুন কবর খুঁজেও পেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ। কবরের মাটি খোড়া অবস্থায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মস্তবড় সুড়ঙ্গ। ভেতরে আস্ত লাশ নেই। জমাট বাঁধা কালচে রক্ত, ছেঁড়া ফাড়া কাফনের সাদা কাপড়, গলিত কিছু মাংস, হাড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এটা যে শেয়াল কুকুরের কাজ বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দু'হাতে মুখ ঢেকে ওমর বাট কবরের পাশে বসে পড়ল। হু হু করে কেঁদে উঠল শিশুর মত। তার হেচকি ওঠা কান্না প্রান্তরের বাতাসের সঙ্গে দূরে অনেক দূরে গড়িয়ে যেতে লাগল।

হায় যুদ্ধ! ভিন দেশে এসে সৈনিক প্রাণ হারায়। মাটি পায় না, কাফন পায় না। প্রিয়জনের অশ্রু সিক্ত মুখ দেখে না। শিয়াল, কুকুর, শকুন, কাক চিলের খাদ্য হয়ে যায়। কারা এসবের জন্য দায়ী? সাধারণ মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। কেন তারা বলি হয় যুদ্ধবাজদের উচ্চাশার কাছে?

ট্রেনে বসে দু'দিকের দৃশ্য দেখতে লাগল ওমর বাট। জীবনকে এতখানি শূন্য এবং অর্থহীন আর কোনদিন মনে হয়নি। সে ফিরে যাচ্ছে পরিচিত স্থান ঢাকায়। কিন্তু মুক্তির আনন্দ, রোহানার ভালবাসার উষ্ণতা, পরিচিত জীবনের হাতছানি কোনকিছুই তার মনকে উদ্বেলিত করছে না। মনে হচ্ছে তার জীবন থেকে মূল্যবান পাতাগুলো হারিয়ে গেছে।

মনে পড়ল ডাঃ মুসার কথা, মেজর ইব্রাহীম এবং মেজর তওসিফের কথা। তিনজনের করুণ মৃত্যুর কথা। এরা তিনজনেই অসম্ভব রকম ভাল মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ তাদের ছিনিয়ে নিয়েছে যন্ত্রণাদায়ক নির্মম এক পরিণতির মধ্য দিয়ে। একে একে

www.pathagar.com

দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল ওমর বাটের মনের পর্দায়। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করল। ট্রেনের কামরায় জানালার উপর মুখ রাখল ওমর বাট। কাঁদতে লাগল অসহায় হয়ে।

সকাল আটটায় ট্রেন থামল কমলাপুর স্টেশনে। আগের মতই লোকজন কম, ব্যস্ততা বেশি। কারোর চলাফেরায় শান্ত ধীর স্থির ভাব নেই, উদ্বিগ্ন চঞ্চলতা ঘিরে ধরেছে মানুষের অস্তিত্ব। পাক বাহিনী রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। সাধারণ সৈনিকরা জানেনা, ওদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। জোর গুজব ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকল বলে। যুদ্ধ জয়ের শেষ পর্যায়ে ওদের অনুপ্রবেশের কি প্রয়োজন বুঝল না ওমর বাট। সে এ দেশের মানুষ না। তার আন্তরিকতাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সে এ দেশে সাংবাদিকতা করেছে। একজন সাংবাদিকের বিবেক কথা বলে ওঠে। অথচ তার কণ্ঠরোধ করা হয় জোর করেই। আজ আর সে কেউ নয়।

রিক্সায় ওঠে সোজা নারিন্দার চান মিয়ার প্রেসে এসে ঢুকল ওমর। এতদিন পরে তাকে দেখেও কেউ কোন প্রশ্ন করল না। চান মিয়া প্রেসে ছিল না, সহকর্মীদের মুখে নীরব গাম্ভীর্যের ছাপ। ওমরের আবার মনে হলো, এ দেশে সত্যি সে অবাঞ্ছিত, অনেক বছর চাকরি এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার পরেও। সে খুঁজে রোকন মিয়াকে বের করল।

প্রথমে বিস্ময়, পরে উল্লাসের সঙ্গে ওমর বাটকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, ওমরও খুশি, ক্লান্তি ভাব কেটে গেল।

ওমর বলল, চাচা, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবো, আগে বলুন রোহানা কোথায়?

–মা ভালই আছেন, চিন্তা করবেন না, আপনি আগে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করুন। তারপর কথা হবে।

ওমরের মনে পড়ল, গতকাল থেকে সে কিছু খায়নি। তার ক্ষিধে পেয়েছে। ওমর বাথরুমে ঢুকল।

সামান্য খাবার, পাউরুটি, একটা সিদ্ধ ডিম, কলা। তাই কত স্বাদ, কত তৃপ্তি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ওমর বলল, রোহানার ঠিকানাটা বলুন চাচা।

রোকন সাহেব উঠে গেলেন। ফিরে যখন এলেন তার হাতে কাগজ। ঠিকানা মনে করে ওমর উঠে দাঁড়াল। রোকন সাহেব ওমরের কাঁধ ধরে আবার তাকে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে, বললেন, বসেই পড়ুন ওমর সাহেব। ওমর কাগজ খুলে দেখল, একটা চিঠি, রোহানার হাতের লেখা।

ওমর,

তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ জানি না। বেঁচে আছ কিনা বুঝতে পারছি না। ধরে নিয়েছি, তুমি বেঁচে আছ। মানুষের যখন আশা করার কিছুই থাকে না, তখন অনুমান নির্ভর আশা নিয়ে সে বেঁচে থাকে।

তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে তোমার আর কোন খবর

www.pathagar.com

পাইনি। তোমার জন্য ইহকালে এবং পরকালে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ নেই। কেন এমন হয় ওমর?

তুমি আমার সব।

এদেশে ছেলে মেয়ের বন্ধুত্বে কেউ বিশ্বাস করে না, স্বীকারও করে না। তাই তাড়াতাড়ি একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। আমরাও তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু হলো না। বাইরের বন্ধন নেই বলে মনে কিছু করো না। প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করি, তুমি এবং মা ছাড়া এই বিশাল পৃথিবীতে আমার কেউ আপনজন নেই। কেমন করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করাবো, আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে আছে তোমার প্রতি আমার অপরিমেয় ভালবাসা। এই ভালবাসায় দৈহিক কামনা নেই এ কথা বলব না। কিন্তু অন্তরের সব ঐশ্বর্যে তুমি দীপ্তিমান। যে দীপ অন্তরে জ্বলে, সেই দীপ দেহকেও আলোকিত করে। ওমর, আকাশের চাঁদ-তারা শুধু আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, অন্ধকারে পথিককেও পথ দেখায়। তাই, যদি বলি, তুমি আমার দেহের সৌন্দর্য, আর মনের মাধুর্য। দুইয়ে মিলে তুমি আমার অনুপম ঐশ্বর্য। তুমি ছাড়া তাই আমার ব্যক্তিত্ব বল, অস্তিত্ব বল, সবই অর্থহীন। ওমর, তুমি আমার কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

পুনশ্চঃ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছি, তখন রবার্টের প্রস্তাব এল, কামালপুর যুদ্ধ সেক্টরে যাওয়ার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ঘাঁটি। এর পতন হলে ঢাকা বিজয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহজ হবে। এ কথা পাক আর্মিরা জানে বলেই যুদ্ধ এখানে তীব্রতর হবে শোনা যাচ্ছে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ইন্ডিয়ান আর্মি এ দেশে ঢুকবে। তখন তো সোনায় সোহাগা। ওমর, তোমার হয়তো মনে আছে, আমার মার আদি নিবাস জামালপুরে, কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য আওড়ান, তিনি বলেন,

তৈয়ের ডালে দ্যাও বাগাড়
তেলে ঝোলে সুগন্ধ বাড়াও।

সুগন্ধ বাড়াবার সত্যি কোন প্রয়োজন ছিল কিনা, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ তা বিচার করবেন।

ওমর, আমি রবার্টের প্রস্তাবে রাজি হয়েছি। এখনো প্রতীক্ষা, ফিরে এসেও প্রতীক্ষা, মাঝের দিনগুলো কাজে লাগুক। ওমর তুমি ফিরে এসো।

ইতিঃ তোমার রোহানা।

ওমর চিঠি পড়া শেষ করে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। সে খুশি হলো না, হতাশও হলো না। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল। দুঃখ কষ্ট সয়ে যার জন্য এত আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসা, সে নেই। কবে ফিরবে জানা নেই।

রোকন সাহেব বললেন, মনে দুঃখ নিবেন না ওমর সাহেব। মা শিগগীর ফিরে আসবেন। একটুক্ষণ থেমে বললেন, একটা কথা বলব?

–বলুন।

–আপনার তো থাকার জায়গা নেই?

–না, ওমরের নিঃসঙ্কোচ উত্তর।

www.pathagar.com

–তাহলে রাতটা আমার ঘরে কাটান।

–অফিসের আবহাওয়া ভাল মনে হচ্ছে না।

–তা হোক, আপনি এখানে চাকরি করতে আসেননি। এক রাত আমার গেস্ট হয়ে থাকলে অপরাধ হবে না। এরপর কোথায় যাবেন?

–জানি না।

–আমার একটা প্রস্তাব আছে, শুনবেন?

মাথা নাড়ল ওমর।

–আমার এক বোন আছে। তার বড় ছেলে এবার ক্লাস টেনে। ওদের একজন গৃহ শিক্ষক প্রয়োজন। আপনি আমার ভাগ্নেকে পড়াবেন?

–পড়াব।

–বেতন ওদের সঙ্গে ঠিক করে নেবেন।

–বেতন লাগবে না। খাওয়া থাকা হলেই চলবে।

–ওরা বড় খুশি হবে। ছাপোষা মানুষ, সামান্য মুদি দোকান ভরসা।

–আমার জীবনের প্রয়োজন আজকাল খুব কম চাচা।

–ভালই হলো। আগামীকালই আমি আপনাকে নিজে নিয়ে যাব।

রবার্ট কোন সময় বেশি কথা বলে না। বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে সে সবচেয়ে গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু রোহানা চৌধুরীর কাছে তার অন্য এক চেহারা। দু'জনের বয়সের তফাৎ অনেক। কিন্তু খোলামেলা আলোচনায় বাধা নেই। রবার্ট গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল, কামালপুরে জয় লাভ করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কঠিন হবে।

রোহানা একমত হলো না। বলল, রবার্ট তুমি যুদ্ধের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছ? মুক্তিযোদ্ধারা এ পর্যন্ত কখনো হারেনি। কোথায়ও ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে, কোথায়ও কম। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি।

–এ পর্যন্ত হারেনি বলে যে কখনো হারবে না, এ কথা বলা যায় না।

–রবার্ট, যুদ্ধ একটা কৌশলগত ব্যাপার এটা ঠিক, কিন্তু মনস্তত্ত্বও কাজ করে দারুণভাবে। শত্রু একবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে ফিরে দাঁড়িয়ে বুক উচিয়ে আর দাঁড়াতে পারে না।

–তোমার কথার আবেগে বিশ্লেষণের সুন্দর একটা দিক আছে। কিন্তু আমি যা খবর পেয়েছি তাতে কামালপুর যুদ্ধক্ষেত্র একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ। পাক আর্মিদের বাংকারগুলো খুব মজবুত। লোহার বীম, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। ওরা ওখানে বসে নির্বিবাদে অনেকদিন যুদ্ধ চালাতে পারবে। এক বাংকার থেকে অন্য বাংকারে যাওয়ার জন্য টানেল তৈরি হয়েছে। এতে ভেতর থেকেই সৈন্য, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, খাবার-দাবার প্রয়োজনে যোগান দেয়া সুবিধে হবে।

–এক জায়গায় আটকে থেকে যুদ্ধ করার চেয়ে খোলা জায়গায় যুদ্ধ করা অনেক সহজ, রোহানা বলল।

–তাতে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।

–সেটুকু তো মানতেই হবে।

www.pathagar.com

–ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে অন্য রকম অসুবিধে আছে। ওরা বাংকারের সামনে বুবি ট্র্যাপ পেতে রেখেছে। তাছাড়া আছে মাইন। সমস্ত এরিয়ায় মাইন পেতে এরা এটাকে মাইন-ফিল্ড তৈরি করে ফেলেছে।

–দেখা যাক কি হয়। যুদ্ধ সুখকর ব্যাপার নয়। নইলে তোমার সঙ্গে বেট ধরতাম।

হেসে ফেলল রবার্ট, ধর, বেটটা টাকার না, বুদ্ধির, বিশ্লেষণের এবং দূরদর্শিতার।

–বেশ ধরলাম।

কামালপুর জায়গাটা সত্যি যেন ঢাকার প্রবেশ পথ। জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা মহাসড়কের পাশে। দু'পক্ষের এট্যাকটিং ট্রুপস থেকে অনেক দূরে রবার্ট গাড়ি পার্ক করল। এখানে একটা মাটির ঢিবি আছে। আশেপাশে গাছগাছালি। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গা। নির্জন, নীরব। বায়নোকুলার দিয়ে পাক আর্মিদের অবস্থান এবং চলাচল ভালই দেখা যায়।

–মুক্তিরা কোথায়? রোহানার বিস্মিত প্রশ্ন।

–তুমি কি ওদের দিনের বেলাতেই আশা করছ?

–দূরে হলেও তো থাকবে।

–ভুলে যেয়ো না, ওরা গেরিলা যুদ্ধ করছে। রাতের যে কোন সময়ে হঠাৎ এসে আক্রমণ করবে। আজ রাতে আক্রমণ নাও করতে পারে, আগামী রাতে করবে, অথবা পরের রাতে। তাদের আক্রমণটাই আকস্মিক এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন।

–তাহলে এত তাড়াতাড়ি এলাম কেন?

–মিস চৌধুরী, মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেয়োনা, আমরা সাংবাদিক, সিভিলিয়ান। দিনের বেলা আসাটাই স্বাভাবিক। রাতের অন্ধকারে এলে ক্রস্ ফায়ারিংয়ে পড়ে যেতে পারি। বেলাবেলি এলাম। দেখেশুনে নিজেদের একটা অবস্থান বেছে নিতে পারব।

–সরি রবার্ট, কিছু মনে করো না।

–মিস চৌধুরী, এসো কিছু খেয়ে নিই। আমি রেকি করতে বেরুবো।

–কেন তুমি মিছেমিছি বিপদ বাড়াবে রবার্ট, তুমি তো কোন পক্ষেরই লোক না।

–দু'দলের স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট ভাল করে জেনে না নিলে জয়-পরাজয়ের কারণ নির্ধারণ করা যাবে না। যুদ্ধে ভাষ্যকারের বিশ্লেষণের অনেক দাম।

–তাহলে আমিও যাব।

–তোমার প্রস্তাবে কোনদিন গররাজি হইনি, আজ হবো। তোমার যাওয়ার দরকার নেই।

–আমি মহিলা বলে কনসেশন দিচ্ছ?

রবার্ট হেসে ফেলল, বেশ রাগ করতে পারতো! তোমার বয়স কত কম। তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তোমাকে এত বেশি জীবনের ঝুঁকি নিতে দিতেন না। রোহানা, মাই ডার্লিং, সব সময় অন্ধের মত বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া বুদ্ধিমতীর কাজ নয়। ধর, আমি যদি পাক আর্মিদের হাতে বন্দী হই, তুমি অন্তত ফিরে গিয়ে আমার এ্যামবেসিকে

www.pathagar.com

জানাতে পারবে। তারা আমাকে ছাড়িয়ে নেবে। তাছাড়া আমি ফরেনার বলে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না।

রোহানা চুপ করে রবার্টের যুক্তি শুনল। শান্ত কণ্ঠ তার. বেশ তুমি যাও, আমি থাকব।

–জাস্ট লাইক এ গুড গার্ল। রবার্ট খাবারে মনোযোগ দিল।

সন্ধ্যা হয় হয়। এখনো আলো আছে, ধূসর এবং ম্লান। আবছা আবছা সব দেখা যায়। রোহানা বায়নোকুলার চোখে লাগিয়ে বসে আছে। চুপচাপ। রবার্ট বেরিয়েছে অনেক আগে। চমকে উঠল রোহানা, দু'জন মানুষ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। একজন কি রবার্ট? কিন্তু রবার্টের পরণে ছিল জীনসের প্যান্ট, গায়ে সাদা সার্ট। মোটা না হলেও রবার্ট স্বাস্থ্যবান এবং উজ্জ্বল। ওদের তেমন মনে হচ্ছে না। রোহানার বুকের ধুকধুকানি তবু থামছে না। কে তাহলে? একজন অন্যজনকে পেড়ে ফেলল। পিস্তলের গুলী বুকে লাগাবার আগেই কে একজন গাছের আড়াল থেকে ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে এল। স্টেনগান দিয়ে আঘাত করল আক্রমণকারীর মাথায়। সে তার রাইফেল ফেলে দিয়ে পালাচ্ছিল। পিছন থেকে গুলী করা হলো। লোকটা লুটিয়ে পড়ল। ততক্ষণে বাংকার থেকে গুলী আরম্ভ হয়ে গেছে। লোক দু'জন বাংকার লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে ছুড়তেই পিছনে হটলো। এক সময়ে মিলিয়ে গেল তারা।

বাংকার থেকে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাক সৈন্য বেরিয়ে এসেছে। কাউকে না দেখে আহত সৈন্যটিকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

রর্বাট ফিরে এল অনেক পরে। হাসতে হাসতে বলল, অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম।

–কি হয়েছিল? ওরা কারা?

–মুক্তি দু'জন বেরিয়েছিল রেকি করতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল সহযোদ্ধার জন্য। একজন পাক সৈন্য মারা গেল।

–তোমার কি হয়েছিল?

–আমাকেই প্রথম ধরেছিল পাক সৈন্যটি। ও টহলদার সৈন্য। পরিচয় দেয়ার পরেও ছাড়ছিল না। এমন সময় ওর চোখে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাটিকে। সে আমাকে ছেড়ে ওকে ধরল। পরের দৃশ্য তুমি দেখেছ।

–তাহলে ফাঁড়া যা হোক কাটল।

ব্রান্ডি খেতে খেতে প্রশান্ত মুখে রবার্ট বলল, আপাতত।

–কিন্ত তোমাদের ফাঁড়া কাটেনি।

–কি বলতে চাচ্ছ তুমি?

–পাক আর্মি দেশটা ধরে রাখতে পারল না। ছেড়ে যাওযার আগে ম্যাসাকার করে যেতে পারে।

–সে সুযোগ পাবে না। তার আগেই ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকে যাবে, তবে......।

–কথা শেষ কর মিস চৌধুরী।

–আমাদের ম্যাসাকার করলে ইন্ডিয়ান আর্মির কি এসে যায়? দু'পক্ষই চায়, বাঙ্গালীরা হতবল হয়ে যাক। দুর্বলতার সুযোগে লুটপাট সহজ হবে। রর্বাট, ইতিহাসে

www.pathagar.com

এমন প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে যে রক্ষক ভক্ষক হয়। আমাদের ইতিহাস বড় দুঃখের ইতিহাস। বৃটিশ বেনিয়ারা যখন এ দেশে ঢুকেছিল, তাদের বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ড রূপে। তখন ভারতীয় হিন্দুরা তাদের সাহায্য করেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যুগ যুগ ধরে মুসলিম নরপতিদের বন্ধুত্ব, উদারতা, সহযোগিতার কানাকড়ি মূল্য দেয়নি তারা।

–হ্যাঁ, তুমি এ ইতিহাস অনেকবার শুনিয়েছ, সিগারেট টানতে টানতে বলল রর্বাট।

–কাহিনী শুনিয়েছি, কিন্তু এর জের আজো যায়নি। সেই জগৎশেঠ, উমিচাদ, রায়বল্লভ এবং মীরজাফররা আজো রয়ে গেছে এ দেশে।

–তোমার কথা ঠিক। আবার এ কথাও ঠিক তোমাদের জাতীয়তাবাদে তোমরা কোনদিন এককাট্টা ছিলেনা। তোমাদের মধ্যেই বিভেদ এবং ষড়যন্ত্রের জন্ম।

–রর্বাট, তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের ব্যাপারে আমি অন্ধ নই। এমন দেশ পৃথিবীতে নেই যেখানে স্বার্থান্বেষীদের দল নেই। এসব লোকদের বল বৃদ্ধি হয় যখন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের হোতারা দেশীয় দালালদের সঙ্গে হাত মেলায়। দেশীয় ক্ষমতা লোভীদের সামনে লোভের টোপ ফেলে।

কথা বলতে বলতে রাত হলো। গাড়িতে বসেই দু'জনে রাতের হাল্কা খাবার খেয়ে নিল। রোহানা বলল, রর্বাট, এ জায়গাটার নীরবতা কেমন অশুভ বলে মনে হচ্ছে।

–এটা তোমার মনের সংস্কার। আজ রাতেই যদি মুক্তিদের এ্যাটাক হয়, তাহলে তোমার সংস্কারের সঙ্গে মিলে যাবে। আসলে ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স ছাড়া আর কিছুই হবে না।

–তুমি কি মনে কর, আজ রাতেই এ্যাটাক হবে?

–সেই রকমই মনে হয়, দেখছো না, মুক্তিরা রেকি করতে বেরিয়েছিল।

–ব্যাপারটা তো এইমাত্র ঘটল। কিন্তু তুমি কিভাবে শিওর হয়ে আজ রাতে যুদ্ধ দেখার জন্য ছুটে এসেছ?

রর্বাটের মুখ গম্ভীর, মিস চৌধুরী, সাংবাদিকরা যেমন নিজেরাই খবরের সোর্স তেমনি খবর পাওয়ার জন্য তাদেরও সোর্স আছে। এসব নিয়ে প্রশ্ন করো না।

–সরি রর্বাট।

রর্বাট কথা বলছে ধীরে ধীরে, তুমি ধরে নিতে পার, এখানে ফিয়ার্স ফাইটিং হবে। ধরে নিতে পার, চর্তুমুখী আক্রমণ হবে। প্রথমে আসছে মুক্তিযোদ্ধাদের ডেল্টা এ্যাটাকটিং কোম্পানী, তাকে ফলআপ করছে 'ব্রেভো' ব্যাটেলিয়ন গ্রুপ, তারপর জেড ফোর্সের 'আর' গ্রুপ। ফরমিং আপ প্লেসের জায়গাগুলো ওরা ঠিক করেই রেখেছে।

রোহানা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এত ডিটেলড খবর পেলে কি করে? পরমুহূর্তে সতর্ক হলো সে। রর্বাট এ ধরনের প্রশ্ন পছন্দ করে না।

জায়গাটার নীরবতা বাড়ছে। নৈঃশব্দ বুকের উপরে চাপানো পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছে। ঘড়ির সময় যাচ্ছে টিক টিক টিক। সেভেনটিন জুয়েলের রোমার ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। অথচ রোহানার মনে হচ্ছে, মহাকালের প্রান্তে

www.pathagar.com

এসে সময় থমকে গেছে। এর যেন গতি নেই, নড়চড় নেই। সময়ের নিথর দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছে ভীতি বিহ্বল আশংকার ক্রুর এবং নিষ্ঠুর চাউনি।

নীরবতা ভাঙ্গে রোহানা, রবার্ট, আমার যে ঘুম আসছে।

–পিছনের সীটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

–তোমার একা খারাপ লাগবে না?

–না, তুমি যাও। সময় মত আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।

–সত্যি দেবে তো? আদুরে গলায় ফের জিজ্ঞেস করল রোহানা।

রবার্ট বলল, সত্যি বলছি, তিন সত্যি।

হেসে ফেলল রোহানা, বাঙ্গালীদের এসব বুলি শিখলে কোথা থেকে?

উত্তর না দিয়ে হাসল রর্বাট। দরজা খুলে পিছনের সীটে চলে গেল রোহানা। তারপর গভীর ঘুমে অচেতন।

কত সময় চলে গেছে রোহানা জানে না। কে যেন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছে, ওপেন ইয়োর আইজ রোহানা।

রোহানা শিথিল এবং নিরুত্তর।

–ওপেন ইয়োর আইজ, এ্যাটাক উইল স্টার্ট সুন। রোহানা উঠে বস।

–আমি কোথায়?

–তুমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলে।

–তুমি কে? ঘুম জড়িত কণ্ঠস্বর রোহানার।

–আই এ্যাম রবার্ট।

রবার্ট বুঝল, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তায় রোহানা খুব বেশি ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত। কোন দ্বিধা না করে পিঠের নিচে হাত দিয়ে রোহানাকে সীটের উপর বসিয়ে দিল, বলল, এভাবে গাড়ির ভেতর শুয়ে থাকলে বিপদ হতে পারে। নিচে নেমে কভার নিতে হবে।

–আই এ্যাম সরি। আমার সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

–মিস চৌধুরী, তুমি সব সময় টেনশনে ভোগ। তাই এমন হয়।

–রাত কত হলো রবার্ট?

ঘড়ি দেখে রবার্ট, বলল, কোয়ার্টার পাস্ট থ্রী।

–এখনো সব নীরব। কেমন করে বুঝলে এখনই এ্যাটাক শুরু হবে?

–ওদের ওয়্যারলেসের উপরে একটা হিস্ করে শব্দ হয়েছে। শব্দটা আমি পরিকষ্কার শুনেছি। গভীর রাতে সামান্য শব্দও শোনা যায়। এটা হচ্ছে ওদের আর্টিলারি ফায়ারিং শুরু করার ইঙ্গিতবাহী শব্দ।

–বেশ চল, বাইরে যাই।

–আপাতত গাড়ির ভেতরে থাক।

–উহু। নেমেই পড়ি। যা হবার দু'জনের একত্রেই হবে।

–বেশ, দু'পক্ষই অনুমান করে গোলাগুলী ছুঁড়বে।

তোমাকেও তাই অনুমান নির্ভর হয়ে সব বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

রোহানা গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ফরমিং আপ প্লেস কোথায় হবে?

–বাঃ যুদ্ধের টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইতিমধ্যে বেশ বুঝে ফেলেছ।

–হু! তা আক্রমণের এইচ আওয়ার কখন?

আবার ঘড়ি দেখল রবার্ট। বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তুমি ফরমিং আপ প্লেসের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? আমরা এখানেই থাকব। গাড়িটা হবে আমাদের কভার। তবে প্রয়োজনমত মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে।

রবার্টের কথা শেষ না হতেই দু'পক্ষের আর্টিলারি ফায়ারিং আরম্ভ হয়ে গেল।

রর্বাট বলল, পাক আর্মিরা আগে গুলী আরম্ভ করেছে। অনেকগুলো পায়ের ধুপধাপ শব্দ শুনে ওরা দিক–নির্দেশ করে আক্রমণ আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ চুপচাপ। শুধু আহতদের গোঙানীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

–মনে হচ্ছে অনেক লোক আহত হয়েছে।

রর্বাট উত্তর দিল, মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় রকমের ভুল হয়ে গেছে। সব ছেলেরা একত্রে ফরমিং আপ প্লেসে জড়ো হতে পারেনি। পরে যখন এগুচ্ছিল, দু'দলের ক্রস ফায়ারিংয়ে পড়ে গেছে।

–কি হবে তাহলে?

–ভোর বেলায় অনেক লাশ দেখতে পাবে, মন তৈরি করে রাখো।

মন খারাপ হয়ে গেল রোহানার। কেন যে খারাপ হয় তাও সে বোঝে না। ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া যুদ্ধ হয় না। তবে যে দলেরই তা হোক না কেন, বীভৎস মৃত্যু দেখতে রোহানার ভাল লাগে না। অকথিত এক বেদনাদায়ক কষ্ট কুরে কুরে খায় তার ভেতরটা। এই বেদনামথিত দুঃখ কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য না, নির্দিষ্ট জাতির জন্য না, সমস্ত মানব জাতির জন্য। মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত। যেদিন মানুষ জন্মায়, সেইদিনই মৃত্যু সঙ্গে করে নিয়ে আসে। অথচ মানুষ নির্ধারিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে চায় না। হানাহানি করে, মারামারি করে, একের রক্তে অন্যে হাত রঞ্জিত করে।

গভীর রাতের অন্ধকার ভেদ করে চিৎকার এবং হট্টগোলের শব্দ শোনা যায়। রবার্ট কান খাড়া করে। জিজ্ঞেস করে, মিস চৌধুরী, হোয়াট ইজ রং উইথ দেম?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে শব্দ অনুসরণ করে চলল রোহানা। তারপর বলল, মুক্তিযোদ্ধাদের ওয়্যারলেস সেট খারাপ হয়ে গেছে। তাই কমান্ডার কোন ডায়রেকশন দিতে পারছেন না ওয়্যারলেস যোগে। খোলা গলায় চিৎকার করছেন মুক্তিযোদ্ধাদের ফরম আপ হওয়ার জন্য।

রবার্ট বায়নোকুলার দিয়ে অন্ধকারেই কি দেখতে চেষ্টা কলল। বলল, হ্যাঁ, তাইতো সবাই কেমন বিশৃংখলভাবে ছুটোছুটি করছে। মনে হচ্ছে ওদের ক্যাপটেন দু'জন হাত ইশারায় কি যেন ওদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন। এদের বিপর্যয় এড়ানো খুব কঠিন।

রোহানার প্রত্যয়ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রবার্ট তুমি ভেবো না। মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে যাবে না। এরা ক্ষতি স্বীকার করবে, হার মানবে না।

www.pathagar.com

–তুমি কি করে বুঝলে?

–বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস এবং ধ্যান ধারণা থেকেই এসব বলছি।

–দেখা যাক, কি হয়।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বায়নোকুলার বারবার হাত বদল হচ্ছে রবার্টের হাত থেকে রোহানার হাতে। ওদের ক্যাপটেন দু'জন কাউকে সার্টের কলার ধরে টেনে টারগেটের দিকে মুখ করে দিচ্ছেন। কাউকে স্টেনগানের বাট দিয়ে আঘাত করে লাইনের ফর্মে এনে দিচ্ছেন। কারো চোয়ালে মারছেন জোর ঘুসি। এক সময় এ্যাটাকটিং গ্রুপের ফর্ম আপ ঠিক হয়ে গেল। এর পরেই আর্টিলারি শেলিংয়ের ভয়াবহ কানফাটা শব্দ। দু' তরফের আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। রাতের আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগল আগুনের ঝলকে। গুলী ছুটতে লাগল বাতাস কেটে শোঁ শোঁ শব্দে। মাটি কাঁপতে লাগল ভূমিকম্পের দুলুনির মত। মনে হলো, অন্ধকারে গাছের পাতাগুলো ঝলসে যাচ্ছে আগুনের তাপে।

নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটে দূরে চলে যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলোর মিটমিটে আলো বার বার আড়াল হয়ে যাচ্ছে অস্ত্রের আগুনের লেলিহান শিখায়। প্রচন্ড এক গোলা এসে পড়ল রবার্টের গাড়ির কাছাকাছি। রবার্ট ফিসফিস করে বল, মিস চৌধুরী, মাটিতে শুয়ে পড়।

দু'জনে গাড়ির আড়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথা দু'জনেরই গাড়ির বাইরে রইল। যুদ্ধের এই দামামার মধ্যেও রবার্ট রসিকতা করতে ছাড়ল না, মিস চৌধুরী, গুলী পায়ে কিংবা হাতে লাগলে বেঁচে যাবে। কিন্তু মাথায় লাগলে ঘিলু ছিটকে পড়বে চারদিকে।

–তাহলে তোমার মাথা আগে সরাও রবার্ট।

–কিন্তু চোখ দু'টো যে মাথার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে চলে আসবে।

–আমারো তো একই সমসা রবার্ট।

–এ রকম যুদ্ধের দৃশ্য দেখাও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

–তাহলে মানছ, বাঙ্গালীরা মরে বাঁচতে জানে।

–তোমাদের প্রবাদগুলো বোঝা বড় কঠিন।

রোহানা কথাগুলো ইংরেজী করে বুঝিয়ে দিল রবার্টকে।

বায়নোকুলার তখন রোহানার হাতে, চিৎকার করে বলল, দ্যাখো দ্যাখো রবার্ট, পাক আর্মিরা প্রথম প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

রবার্ট বলল, তার মানে এই নয় যে ওরা হেরে যাচ্ছে। যুদ্ধের কৌশলগত ব্যাপারে মাঝে মাঝে পিছনে হটতে হয় এ্যাটাকটিং গ্রুপকে সংঘবদ্ধ এবং জোরদার করার জন্য। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ওরা বাংকার ছেড়ে উপরে চলে আসছে কেন?

–রোহানা বলল, আমার মনে হয়, মুক্তিরা এখন বাংকারে ঢুকে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করবে।

–তোমার অনুমান হয়তো সত্য। মুক্তিযোদ্ধারা যথেষ্ট পরিমাণে মারা পড়লেও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পাক আর্মিদের মনোবল শীগগীর ভেঙ্গে পড়বে।

www.pathagar.com

হঠাৎ সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে বোমা ফাটার প্রচন্ড এক শব্দ হলো। কানে হাত দিল রবার্ট এবং রোহানা। বারুদের গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠল। আবছা অন্ধকারে ধোঁয়া দেখা গেল না. কিন্তু অন্ধকার কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। অন্ধকারের এতক্ষণ তবু একটা রূপ ছিল। শেষ রাতের এই অন্ধকার সূচীভেদ্য নয়। এর ধূসর গায়ে আবছা আবছা ছবি ফুটে উঠেছিল প্রকৃতির। হয়তো এর অবয়ব স্পষ্ট নয়. কিন্তু রহস্যময়। এখন তাও রইল না। মর্টারের শেল, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং বোমার বিস্ফোরণে অন্ধকার তার নাটকীয়তা হারিয়ে বিষন্ন এবং কটু হয়ে উঠল।

ধোঁয়া সরে যেতেই মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তাক্ত দেহগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনেক মৃতদেহ। একজন ক্যাপটেনের মৃতদেহও এদের প্রাণহীন দেহগুলোর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে একত্রে শুয়ে আছে। চোখ জ্বালা করে উঠল রোহানার। বায়নোকুলার রবার্টের হাতে দিল। রবার্টও নীরব হয়ে গেল শব্দহীন মৌনতায়। যুদ্ধের তীব্রতা কমে গেছে। থেমে থেমে গুলী হচ্ছে। রাইফেলের গুলী। দু'পক্ষই প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। তবে মনে হয় দু'দলই নিরাপদ ব্যবধানে সরে গেছে।

ভোর হলো। পূর্বাকাশে সুবেহ সাদেকের সোনালী আলো ফুটে উঠল। পাখিদের কিচির মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরা ফিরে এসেছে ওদের নীড়ে। কিন্তু অনেক মানব সন্তান তাদের নীড়ে আর কোনদিন ফিরে যাবে না। ঠান্ডা মাটির উপরে শুয়ে আছে অনেক নির্জীব প্রাণহীন দেহ। বাংকারে শুয়ে আছে অনেক নীরব নিথর দেহ। সবাই মানব সন্তান।

দু'পক্ষের মৃত দেহগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সূর্য উঠেছে পূব আকাশে। আলো ছড়াচ্ছে। প্রান্তরের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। রক্ত শুকিয়ে যাবে। মাটি ঘাম শুষে নেবে। গোলা-বারুদের গন্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাবে। শুধু যুদ্ধের স্মৃতি বেঁচে থাকবে ইতিহাসের পাতায় কালো অক্ষরে বন্দী হয়ে।

ঢাকায় ফিরে রবার্ট জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কোথায় নামাব?

–যে কোন জায়গায়।

বিস্মিত হলো রবার্ট, তুমি থাক কোথায়?

–আপাতত কোন জায়গা নেই, খুঁজে নেব।

–তাহলে হোটেলে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করে যাও।

মাথা নাড়ল রোহানা, সরি রবার্ট, আমি এখন ওমর বাটের খবর নেয়ার জন্য পুরানো ঢাকায় যাব।

রবার্ট আর কথা বলল না।

–তুমি বরং আমাকে মহাখালীর বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দাও।

বাসস্ট্যান্ডে রোহানাকে নামিয়ে দিয়ে রবার্ট বলল, মিস চৌধুরী, আমি আর বেশিদিন এখানে থাকব না। যদি পার, আমার সঙ্গে আর একবার দেখা করো।

বিস্মিত রোহানার কণ্ঠস্বর ম্লান শোনাল, রবার্ট, ঢাকার যুদ্ধটাও তুমি দেখে যাবে না!

www.pathagar.com

–যা অবধারিত তা দেখার জন্য সময় নষ্ট করে লাভ কি? ঢাকার পতন হবেই।

–শিওর?

–হ্যাঁ, চারদিক থেকে কিলো ফোর্স, জেড ফোর্স ইত্যাদি এ্যাটাকটিং ফোর্সগুলো ধেয়ে আসছে ঢাকার দিকে।

–তাছাড়া...

–কথা শেষ কর রবার্ট।

–ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকে গেছে দেশের ভেতরে। এখন যৌথ কমান্ডে আক্রমণ চলবে।

–রবার্ট এই যৌথ কমান্ডের আক্রমণের রহস্য দেখেই যাওনা। কারা জীবন দিল, কাদের ক্ষয়ক্ষতি হলো, আর কোন বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল দেখবে না?

–মিস চৌধুরী, তুমি বানরের পিঠে ভাগের গল্প অনেকববার শুনিয়েছ। বড় নির্মম সত্য। তাছাড়া...

–বল, রবার্ট বল।

–অনেক লোক মারা পড়বে।

–তুমি যুদ্ধে হত্যাকান্ড দেখে অভ্যস্ত রবার্ট।

রবার্ট এক নিমিট চুপ করে রইল। তারপর ভেজা গলায় বলল, আমি শিশু এবং নারীদের মৃত্যু সহ্য করতে পারি না।

রোহানার চোখ অশ্রুসিক্ত, বুঝেছি রবার্ট, তোমার মেয়ের মৃত্যুর কথা আজো তুমি ভুলোনি।

–মিস চৌধুরী, তুমি বলেছিলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। তোমাদের প্রবাদ বাক্যগুলো বড় সুন্দর। শিশু নিষ্পাপ, ফুলের মত নির্মল, সুন্দর। নারী কোমল, প্রেমময়। এ দুইয়ের মৃত্যু ঘটানো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ। আমার মেয়ের মৃত্যুর পরে আমার স্ত্রী বেশিদিন বাঁচেনি।

–রবার্ট, আমারো বড় ভয় করছে।

–ভয় পেয়ে কি হবে মিস চৌধুরী। এ তোমার দেশ, সহ্য করতেই হবে।

অন্যমনস্ক হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল রোহানা। রবার্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থ একজন প্রিয় আত্মীয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ। সে যে বিদেশী এ কথা আজ বড় বেশি মনে হচ্ছে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সত্যি কি কোন প্রভেদ আছে? গায়ের রং আলাদা, বৈশিষ্ট্য আলাদা, আচার, রীতি, সংস্কৃতি আলাদা। তবু মানুষ কেন এত আপন হয়? হৃদয়ের অনুভূতির কোন আলাদা চেহারা নেই। স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, মৈত্রী, বন্ধুত্বে সব মানুষ এক।

–রোহানা, তুমি কাঁদছ? স্টপ ক্রাইং মাই চাইল্ড, আমি তোমাকে চিঠি দেব, প্রায়ই দেব। কথা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হলে তুমি আমার ওখানে বেড়াতে যাবে। আবার দেখা হবে।

রবার্টের চোখ ভিজে। পানি গড়িয়ে পড়ার আগেই সে গাড়িতে স্টার্ট দিল। খুব জোরে চালিয়ে দিল গাড়ি।

www.pathagar.com

চান মিয়ার প্রেসে গিয়ে ওমর বাটের ঠিকানা সংগ্রহ করল রোহানা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ওমর বেঁচে আছে, ফিরে এসেছে, আপাতত মাথা গোঁজার ঠাঁইও আছে। রোহানা রিক্সা নিয়ে ছুটল শরৎগুপ্ত রোডে। ঘন ঘিঞ্জি বসতি। রাস্তা সংকীর্ণ, নোংরা। বাসগৃহ সব জরাজীর্ণ। সারি সারি লেট্রিন রাস্তার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। কোন কোনটা চট দিয়ে ঢাকা।

বাসা খুঁজে বের করতে দেরিই হলো। পুরনো শ্যাওলা ধরা বাড়ি। যে কোন সময়ে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। বাসার কাজের ছেলেটি বলল, ওমর সাহেব বাজারে গেছে।

কেউ তাকে বসতে বলছে না, পরিচয়ও জিজ্ঞেস করছে না। অনেকক্ষণ পরে এক আটপৌরে শাড়ি পরা মহিলা জিজ্ঞেস করল, আপনি কারে চান?

–ওমর বাটকে।

–ওমর বাট বইলা তো কেউ নাই।

–আপনার কাজের ছেলেটা যে বলল, বাজারে গেছে।

–সে ওমর সাহেব। বাট পাট বইলা আমরা কারোরে চিনি না।

রোহানার এতক্ষণে মনে পড়ল, ওমর তার পদবী ব্যবহার করে না।

রোহানা বিনীত ভাবে বলল, দেখুন, আমার ভুল হলে গেছে। উনি ওমর সাহেবই।

–আপনি তার কেডা হন, পরিবার?

মনে রাগ চেপে রোহানা বলল, হ্যাঁ।

–তবে যে উনি বলেন ওর কোন পরিবার নাই।

–ঠিকই বলেছেন। আমি চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এসেছি।

–মান অভিমান হইছিল বুঝি?

বউটির সরল কথায় হেসে ফেলল রোহানা, বলল, তাই। তা আমি একটু বসতে পারি?

–হায় খোদা, দেখেন তো আমার কি ভোলা মন। আপনারে বসতে বলি নাই। বসেন বসেন।

রোহানা এখন সহজ স্বচ্ছন্দ। হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে? ওমর যেখানে বাস করে সেটা আমার আপন ঘর।

–এমা, আপনি স্বামীর নাম ধরেন।

–ঠিক আছে, আর বলব না। ওর কি ফিরতে দেরি হবে?

–হইতে পারে। বাজার করতেই জানে না। মাছ চেনে না। কাগজে লেইখ্যা দিতে হয়। দরদাম করতেও জানেনা। বেশি দাম দিয়া ফেলে।

গম্ভীর হয়ে গেল রোহানা, বলল, ওকে কাঁচা বাজারে পাঠান কেন? আপনার তো কাজের ছেলে আছে।

বউটির স্বর রাগান্বিত, মাস্টার ঘরে বইসা থাইকা করবডা কি?

–ছেলে পড়াবে।

www.pathagar.com

–সে তো দুই এক ঘন্টার ব্যাপার। উনি তিন বেলা খান, থাকেন, সেটা উসুল করতে হবে তো?

–তা বেতন দেন কত?

–বেতন উনি নেন না।

–ওমর সাহেব বেশ ভাল মানুষ, তাই না?

–হু। কোন ঝামেলা করে না। কিন্তু আপনি বড় ঝামেলার মানুষ।

রোহানা ম্লান হাসল, এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

ওমরকে দেখে চমকে উঠল রোহানা। শুধু নীল চোখ দু'টোই ভেসে আছে মুখের উপর। সোনা রং কালচে হয়ে গেছে। মুখে দাগ। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে কাঁটাবনের রূপ নিয়েছে। মাথার চুল ঝরে পাতলা হয়ে গেছে। শুধু এক গোছা চুল কপালের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুরন্ত শিশুর মত।

হাতের বাজারের ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে ওমর বাট অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রোহানার দিকে। রোহানার চোখেও পলক পড়ে না। কোন আবেগ নয়, উচ্ছ্বাস নয়, ভালবাসার নিবিড় চাপ নয়, অকথিত এক বেদনার ঢেউ যেন সমুদ্রের বেলাতটে আছড়ে পড়ছে দুঃখের এক গভীর অনুভূতি নিয়ে। গড়িয়ে গড়িয়ে সমস্ত বুকটাকে থেতলে দিচ্ছে যন্ত্রণার রোলার দিয়ে। কথা বলবে, মুখে আসছে না, ঠোঁট শুকনো, চোখে অসম্ভব জ্বালা।

–কেমন আছ? অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করল রোহানা।

–ভাল।

তুমি কেমন আছ, এ কথাও জিজ্ঞেস করল না ওমর। নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

–রাগ করেছ?

–না।

–এখানে কতদিন আছ?

–ঢাকায় ফিরে আসার পর থেকে।

–শরীরের এই অবস্থা কেন?

অবজ্ঞা ভরে উত্তর দিল ওমর, ভালই তো আছি।

–তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আর দু'একটা দিন এখানেই থাক ওমর। আমি বাসা ঠিক করে তোমাকে নিয়ে যাব।

–আমি কোথায়ও যাব না, এখানেই থাকব।

–তাড়াতাড়ি গোরস্তানে যাবে বলে?

–তাইতো ভাল, আমাকে নিয়ে কাউকে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।

রোহানার শুকনো চোখ আর্দ্র, ওমর, তুমি আমার উপর অভিমান করেছ, আমি অভিমান করব কার উপর? বল, জবাব দাও।

–তোমার সব আছে রোহানা, দেশ, জাতি, আত্মীয়–স্বজন।

www.pathagar.com

–হয়তো সাদা চোখে সবাই তাই দেখবে, কিন্তু আমার জীবনের শূন্যতা কেউ কোন দিন দেখবে না। আমি একজন নারী, সবকিছু ছাপিয়ে একজন পুরুষকে উদগ্র আগ্রহে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সবটুকু পেতে ইচ্ছে করে, সবটুকু দিতে ইচ্ছে করে, অথচ আমি তাকে পাই না। ওমর, তোমাকে নিয়ে আমি জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। বাঁচতে চেয়েছিলাম। সেই তুমি আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে যেতে চাও?

–আমি দূরে-যাইনি, কাছেই আছি, অথচ হাত বাড়িয়ে কেউ কাউকে ধরতে পারছি না।

–ওমর, হাত বাড়াও, আমার হাত ধর।

–রোহানা, মাঝখানে যে এক সীমাহীন সমুদ্র, আমি দেখেতে পাই, শুধু তুমি দেখতে পাওনা।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রোহানা। এই সমুদ্র ওমর কবে পার হবে, কবে তার ইচ্ছে হবে?

সস্তায় একটা ঘর ভাড়া নিল রোহানা। ওমরকে আনতে গেল। ওমর এলা না। বলল, সামনে ছেলেটার বার্ষিক পরীক্ষা। আমি নেমকহারামি করতে পারব না।

–বাসা থেকে এসেও পড়াতে পারবে।

–রোহানা, দিন দিন তুমি অবুঝ হচ্ছো। তোমার বাসা থেকে এখানে আসতে খরচ অনেক। যাতায়াতের এত ঝামেলা আমি পোয়াব কেন?

ওমরের কথার তীক্ষ্ণ বান রোহানার বুকে বিঁধছে। তবু তার কণ্ঠস্বর শান্ত, না খেয়ে তুমি এখানে কয়দিন টিকতে পারবে? চাকর ছেলেটার কাছে শুনেছি ওরা তোমাকে যা খাবার দেয়, তুমি মুখে তুলতে পার না। মাছের গন্ধ তুমি সহ্য করতে পার না, খাওয়া তো দূরের কথা। অথচ এ কথা বাড়িওয়ালা অথবা তার বৌকে বলছ না।

–এরা গরীব মানুষ, রাজখানা যোগাবে কি করে?

–একটা ডিমও তো রোজ ভেজে দিতে পারে।

–পারে না। এ সব আবদার করলে আমাকে রাখবেও না।

–না রাখাই ভাল। রোজ উপোস করে মানুষ কয়দিন বাঁচে।

–মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই তো মিলেছে। নইলে কমলাপুর স্টেশনে জায়গা নিতে হতো। তাও মিলতো কিনা সন্দেহ।

–আঃ ওমর, সব সময় এমন ভাব কেন?

–তোমার আবেগ আর আদর্শ দিয়ে বাস্তবতাকে কি কোনদিন ঠেকাতে পেরেছ?

–পারিনি। ওটা আমার অক্ষমতা, সদিচ্ছার অভাব নয়।

–সদিচ্ছা, ভালবাসা, শুভেচ্ছা ইত্যাদি কথাগুলো যুদ্ধের সময়ে বানের জলে ভেসে গেছে।

–যায়নি। আউট ওয়ার্ড ফ্যাক্টরগুলো দিয়ে মানুষের অন্তরকে বিচার করোনা ওমর।

–এগুলোই এখন মানুষের মনের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

–তুমি কি আমাকে এই দলেই ফেললে?

www.pathagar.com

–আঃ চুপ কর রোহানা, ভাল লাগছে না।

–বেশ, চলে যাচ্ছি।

রোহানা দরজার বাইরে পা রাখতেই ওমর ডাক দিল, এই শোনো।

রোহানা ফিরে এল।

–বাসায় রুম কয়টা?

–একটাই।

বিস্ফারিত হলো ওমরের চোখ, এক রুমে দু'জনে থাকব?

রাগ সামলে হেসে ফেলল রোহানা। দিন দিন তুমি শুধু মেজাজী হচ্ছো না, দুষ্টুও হচ্ছো। আমি একটা কাঠের পার্টিশান অলরেডি বানাতে দিয়েছি।

–চমৎকার। তুমি ওপাশে কাপড় বদলাবে, আমি শাড়ির খস খস আওয়াজ শুনব। তুমি তোমার বিছানায় পাস ফিরলে আমি কান খাড়া করব। তোমার বুকের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলে আমি পাতলা কাঠের আড়াল মাড়িয়ে তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব। বাঃ সতীত্ব রক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা করে আমাকে নিতে এসেছ।

রোহানা হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না। শুধু বলল, ইডিয়ট। তারপর চোখের পানি মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ওমর এল না। রোহানা ঘর ছেড়ে দিল। স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারী আজমত সাহেব রোহানাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিয়ে এলেন নিজের বাসায়, বললেন, মা দেশ স্বাধীন হলো বলে, তুমি আবার সব ফিরে পাবে, স্কুলের চাকরি, নিজের বাড়ি, অধিকার সব কিছু। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

–কি করে পারবেন? আপনি নিজেই তো এখন বিপদের মধ্যে।

–কেন মা? আমি কোন অন্যায় করিনি।

–ন্যায়–অন্যায় কেউ দেখবে না। আপনি শান্তি কমিটির মেম্বার। আমার মামার মত ভাল মানুষ পৃথিবীতে কমই আছে। শান্ত, ভদ্র, উদার, পরোপকারী। কিন্তু শান্তি কমিটির মেম্বার ছিলেন বলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

আঁৎকে উঠলেন আজমত সাহেব, তাহলে কি হবে?

–ওসব ভেবে লাভ নেই, যা হবার হবে। পাক সেনাদের তাড়া খেয়ে মানুষ একদিন প্রতিবেশী দেশে পালিয়েছিল, নিজের দেশের মানুষদের তাড়া খেয়ে আমরা কোথায় পালাব?

গম্ভীর হয়ে রইলেন আজমত সাহেব।

–আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।

–এই ভর সন্ধ্যায় কেন বের হচ্ছ মা?

–আমার জীবনের উপর মায়া নেই। এক জনের জন্য বাঁচতে চেয়েছিলাম। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়। অস্ফুট স্বরে বলল রোহানা।

–কিছু বলছ মা?

–না, আমার ফিরতে দেরি হবে। সদর দরজা বন্ধ করে দিন। অপরিচিত লোকের ডাকে দরজা খুলবেন না।

www.pathagar.com

ক্যাপটেন আদনান অপরিচিত এক মহিলাকে দেখে অবাক হলো। মুখে সামান্য বিরক্তি ভাব।

–আমি রোহানা চৌধুরী, কমান্ডার শাহ নেওয়াজকে চিনতাম।

উঠে দাঁড়াল কাপটেন আদনান, আরে আপনি! বসুন বসুন, আপনার কথা কত শুনেছি।

–কার কাছে শুনলেন?

ভাবীর কাছে। গম্ভীর ক্যাপটেন আদদানের মুখ, আপনার জন্য আমার ভাইয়ের লাশটা ফেরৎ পেয়েছি। কবর দিতে পেরেছি মর্যাদার সঙ্গে। চিহ্নও রয়ে গেল। আমরা আপনার কাছে চিরঋণী।

–কি যে বলেন, আমি আমার কর্তব্য করেছি।

–কর্তব্যটুকু বড় কঠিন ছিল মিস চৌধুরী।

প্রসঙ্গ বদলে দিল রোহানা, আপনার ভাবীর খবর পান?

–হ্যাঁ মাঝে মাঝে চিঠি দেন। বড় ভাল মেয়ে।

–ছোট্ট রোহানার খবর কি?

–বড় স্যাড ব্যাপার। এখনো আব্বু আব্বু বলে কাঁদে। যুদ্ধ শেষ হলে ওকে আমরা নিয়ে আসব। শত হলেও আমাদের মেয়ে।

–ওর মা রাজি হবে?

–সে রাজি হলেই আনব। শুনেছি ভাবীজির বাপ-মা দ্বিতীয় বিয়ের জন্য ওকে চাপ দিচ্ছে।

রোহানা চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ নীরব রইল ক্যাপটেন আদনান।

–কেন এলেন বললেন না তো বোন? হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

–আপনার মুখে বোন ডাক শুনে কথাটা বলতে ভরসা পাচ্ছি। তবু লজ্জা হচ্ছে।

–আপনি নির্ভয়ে বলুন।

–আমার একটা ছোটখাট বাড়ি আছে শেরেবাংলা নগরে। বাড়িটা বেদখল হয়ে আছে। বলতে গেলে আমি এর ওর বাড়ি থেকে বেড়াচ্ছি। মাকে রেখেছি ফরিদপুরে মামার বাসায়। মামা বেঁচে নেই। মামীর নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

–বাড়িটা কি আপনাদের দখলে ছিল না? আপনারা ওখানে বাস করতেন না?

–করতাম। কারা যেন একদিন বোমা মেরে বাড়ির একাংশ ধ্বংস করে দিল। ওখানে থাকার আর সাহস হলো না। চলে গেলাম। একদল উড়ো লোক এসে বাড়ি দখল করে নিল।

–এতদিন এ কথা বলেননি কেন?

–আপনি বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধ করছিলেন।

–আপনি আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন? আমি শাহনেওয়াজের ছোট ভাই। আপনার চেয়ে বয়সেও ছোট।

www.pathagar.com

–বেশ তুমি বলব। তুমি নিজেই আমার লজ্জা সংকোচ দূরে সরিয়ে দিয়েছ। সব কিছু আমি এখন খুলে বলতে পারি। বিশ্বাস কর, এত অসুবিধেয় আছি যে এখন আমার এই ভাঙ্গা বাড়িটাই প্রয়োজন।

–যদি এ্যাকসিডেন্ট হয়?

–এতদিন যখন হয়নি, তখন আর হবে না। বাসায় বসতে পারলে ভাঙ্গা অংশ একটু একটু করে সারিয়ে নেব।

–বেশ, তিনদিনের মধ্যে বাসা ফিরে পাবেন। ঠিকানা দিয়ে যান।

–তোমাকে কি বলে যে দোয়া করব।

–বাসায় আগে ফিরে যান, তারপর দোয়া করবেন।

ক্যাপটেন আদনান কথা রাখল। তিন দিনের মাথাতেই বাড়ির দখল পেয়ে গেল রোহানা। ওমরকে এখানে আনার আগেই বাড়ির জঞ্জাল সাফ করতে হবে। দরজা জানালা মেরামত করা দরকার। যে রুমগুলো ধ্বসে পড়েছে ওগুলো এখন থাক। টাকা পয়সা হাতে এলে মেরামত করা যাবে। আপাতত দুটো রুম হলেই চলে যাবে। বাড়িটা মোটামুটি ছিমছাম না হলে মন খারাপ করবে ওমর। জীবনবোধে পরিচ্ছন্ন ওমর বাট। অবস্থা বিপর্যয়ে আজ কী হয়েছে। নিজের ভাঙ্গা বাড়িতে এসেও কি যে ভাল লাগছে রোহানার। দরজা জানালা এবং নোনা ধরা দেয়ালের গায়ে হাত বুলাতে লাগল। আপনজনের স্নেহময় স্পর্শ যেমন ভাল লাগে, তেমনি আদুরে মায়া জেগে উঠল মনে।

কাজের বুয়ার সঙ্গে নিজেও হাত লাগাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে। ক্লান্ত হয়ে আম গাছের তলায় এসে বসল। শীত এসেছে। বাতাসে টান ধরেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া সবে বইতে আরম্ভ করেছে। জানুয়ারির আগে এ দেশে শীতের তীব্রতা বোঝা যায় না। তবু বিদেশের মত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতেও শীতের কনকনে ভাব নেই। হাড় কাঁপিয়ে দেয় না। বাংলাদেশের শীতকালেরও একটা আদুরে ভাব আছে। গালে কপালে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। কানে কানে কথা বলে। সোনালী রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে জমাট ভালবাসা নিয়ে।

আম গাছের পাতা টুপটাপ ঝরে পড়ছে রোহানার মাথার উপর। পাতায় হলদে ভাব। রোহানা মাথা থেকে পাতা সরায় না। এক সময় ওর মাথা থেকে গাল গড়িয়ে নিচে পড়ে। দুরন্ত শিশু যেমন মাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে থেকে নিচে নামতে ছটফট করে। পায়ের নিচে ভিজে ঘাস। শেষ রাতে শিশির পড়েছে। এত বেলায় ঘাসের মাথায় শিশির বিন্দু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সিক্ততা রেখে গেছে পাতায় পাতায়, ঘাসের গোড়ায়, শেফালী ফুলের হলুদ ডগায়, আর মাটির মায়াময় বুকে।

এখন শীতকাল, কিন্তু আমেজ হেমন্তের। এমন সুন্দর আবহাওয়ায় রোহানার মনে শূন্য ভাব। যুদ্ধের ক্লান্তির শেষে উদাসীন বৈরাগ্য বাসা বেঁধেছে দেহ এবং মনে। এ সময় কারো বুকে মাথা রেখে যদি কিছু সময় কাটিয়ে দিতে পারতো, তাহলে নতুন

www.pathagar.com

উদ্যম এসে ধরা দিত অস্তিত্বে। ওমর কি সত্যি আসবে? না এলে কার জন্য এ আয়োজন?

ক্যাপটেন আদনানের বাসায় এসে রোহানা বিস্মিত। বাইরে জীপ, পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে লাইন আপ হয়ে। সে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিল। কিন্তু ইউনিফরম পরে ক্যাপটেন আদনান বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি। ব্যস্ততা সত্ত্বেও ক্যাপটেন আদনান বলল, বসুন।

–বসে কি হবে। তুমি ব্যস্ত, আবার কি যুদ্ধফ্রন্টে যাচ্ছ?

–সে কি, আপনি জানেন না পাক আর্মি সারেন্ডার করেছে?

–না তো! ভালই হলো। রক্তপাত বন্ধ হলো।

–কি সে যে ভাল, কি সে মন্দ, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। ওরা আমাদের কাছে সারেন্ডার করছে না, করছে ভারতীয় হাইকমান্ডের কাছে।

–বল কি তুমি?

–সত্যি, রক্তক্ষয় বন্ধ হলো, বিজয়ের ভাগীদার কে হবে?

রোহানা চৌধুরী স্তব্ধ এবং বিমূঢ়।

–আপনাকে আরো একটা মর্মান্তিক খবর দিচ্ছি।

চোখ তুলল রোহানা।

–আমি লেঃ জেনারেল হাশেম খানের লাশ আনতে যাচ্ছি।

–কোন যুদ্ধফ্রন্টে উনি মারা গেলেন?

–যুদ্ধে মারা যাননি, আত্মহত্যা করেছেন।

পিনপতন স্তব্ধতা নেমে এল। রোহানার জিজ্ঞেস করতেও ভয় হলো, যুদ্ধের শেষ মুহর্তে কেন তিনি এমন করলেন?

নীরবতা ভাঙ্গল ক্যাপটেন আদনান, নিশ্চয়ই কারণ জানতে ইচ্ছে করছে আপনার?

মাথা নাড়ল রোহানা।

–আমাদের যুদ্ধবিশারদ এবং জেনারেলরা এভাবে ঢাকা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল; কুমিল্লা এবং ফেনী থেকে দুটো আর্মি ডিভিশন প্রথমে এসে ঢাকা প্রবেশ করবে। ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল থেকে অন্য দুই ডিভিশন। খুলনা যশোহর থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর সজ্জিত ইউনিটগুলো আরিচা ঘাট হয়ে সাভারে এসে অপেক্ষা করবে। নর্থ বেঙ্গল এ্যাটাকটিং গ্রুপ এসে টাঙ্গাইল–ময়মনসিংহ গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপর একযোগে আক্রমণ। পাক সেনাদের পালাবার কোন পথ থাকবে না। বিমানপথ, স্থলপথ, জলপথ সবই বন্ধ। এটা হবে বড়জোর এক দিনের যুদ্ধ। মিসমার হবে শত্রু ইউনিটগুলো। ওরা যদি সারেন্ডার করেই আমাদের হাইকমান্ডের কাছেই করবে। কিন্তু প্ল্যান পরিকল্পনা সব ভেস্তে গেল। বোন রোহানা, আমার মা গাঁয়ের মেয়ে ছিলেন। গেঁয়ো ভাষাতেই শ্লোক আওড়াতেন। তিনি বলতেন,

ঘোড়াওয়ালার ঘোড়া নয়,

www.pathagar.com

চাবুক সোওয়ারির ঘোড়া।
লজ্জা, দুঃখ, অপমানে লেঃ জেনারেল হাশেম খান আত্মহত্যা করলেন।

রোহানার চোখ ভিজে উঠল। ক্যাপটেন আদনান রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নিল। যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। ক্যাপটেন আদনান ইতস্তত করল, তারপর বলল, আপা একটা কথা।

-বল।

-সাবধানে থাকবেন।

রোহানা চুপ।

-আপনার নামে কিছু অভিযোগ আছে।

-অভিযোগগুলো কি আজো জানিনা।

-আমিও জানিনা। কিন্তু আমাদের আর্মি হেড কোয়ার্টার্স জানে। তবে সাংবাদিক হিসাবে আপনি খুব সত্যনিষ্ঠ, এ কথা জানি।

-এটা কি অপরাধ?

-জানিনা। জয়ের মুখে এটা আবেগ এবং উল্লাসের সময়। এ সময় কেউ যুক্তি এবং সাক্ষ্য খুঁজে না।

-তোমার কথা বুঝি, কিছু করার নেই।

-কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকেন।

-অসম্ভব। এতে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমি কোন অপরাধ করিনি।

-আপনি একজন পাঞ্জাবী যুবককে আশ্রয় দিয়ে চলেছেন।

-পৃথিবীতে সে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন।

-বুঝেছি। আপনি খুব বলিষ্ঠ মনের অধিকারী। আপনাকে স্যালুট দিতে ইচ্ছে করছে।

-ছেলেমানুষি করো না, ওটা মিলিটারি নিয়ম।

-অসাধারণকে সম্মান জানানোও সব নিয়মের নিয়ম। চলি তাহলে।

-এসো।

দুবার হোঁচট খেল রোহানা। পথ আগের মতই মসৃণ, লম্বা, কালো। অথচ উঁচু নিচু মনে হচ্ছে, সাপের মত কিলবিল করে যেন সামনে এগিয়ে গেছে। ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথায়। ক্যাপটেন আদনানের কথাগুলো মনে হচ্ছে। এ কথাগুলো সে না জানে এমন নয়, কিন্তু এর অবয়ব ছিল অস্পষ্ট। একজন সৈনিকের অভিজ্ঞতা এই ধোঁয়াটে অবয়বের উপর টর্চের আলো ফেলে স্পষ্ট করে তুলেছে।

সে নিজে ইতিহাসের ছাত্রী। বিপ্লবোত্তর ম্যাসাকারের ইতিবৃত্ত তার অজানা নয়। ওমর বাটকে সে কোথায় লুকোবে? ওমর বাট একটা নাম শুধু নয়, একটা সামগ্রিক অস্তিত্ব। তার ভালবাসা, আবেগ, আশা এবং প্রেরণার অস্তিত্ব। ওমর বাট ছাড়া নিজেকে সে নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না। এই ভদ্রলোকের আত্মত্যাগের কাছে তার নিজের আত্মত্যাগ কিছুই নয়। ওমর বাট দেশ ছেড়েছে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়েছে, বন্ধু-বান্ধব

www.pathagar.com

ছেড়েছে, সম্পদ সম্মান সব বিসর্জন দিয়েছে, এই ব্যক্তিটিকে সে আজ কোথায় লুকিয়ে রাখবে? কোন্ নিরাপদ স্থানে? অন্তরের গভীরে যদি কোন মানুষকে লুকিয়ে রাখা যেত, আজ তাই করতো রোহানা চৌধুরী।

পুরোনো ঢাকার যে জায়গায় ওমর বাট আছে, তা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান। কিন্তু ওখানে ও না খেয়েই মারা যাবে। ওর আজ যত্ন, পরিচর্যা, সান্ত্বনা এবং ভালবাসা প্রয়োজন। তাই দেবে রোহানা। নিজের বাড়িতে ওকে নিয়ে আসবে, কপালে যা থাকুক।

ওমরকে রোহানা আনতে গেলে সে প্রশ্ন করল, খালি বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে, লোকে বলবে কি?

জীবনে এই প্রথম ধৈর্য হারাল রোহানা, চিৎকার করে বলল, তুমি আমাকে ভেবেছ কি? তোমার হাতের পুতুল? খেলার সামগ্রী, খামখেয়ালির নজরবন্দী মানুষ? তোমার যদি চরিত্রের জোর না থাকে, আমার তো আছে।

বিষাদময় হাসি হাসল ওমর বাট, বলল, রোহানা, পুরুষ মানুষকে তুমি এত কম চেন? যে জীবনের সব অবলম্বন হারায়, সে মানুষ থাকে না।

সে পশু হয়ে যায়। সে তখন পারে না, পৃথিবীতে এমন জঘন্য কাজ নেই।

রোহানার চোখে পানি, তোমাকে চিনি না কে বলল?

–তুমি যে ওমর বাটকে চিনতে, সে তেমন নেই রোহানা। ঘৃণা, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ আমাকে কত বদলে দিয়েছে তা যদি তুমি জানতে?

–কে তোমাকে ঘৃণা করল ওমর?

–তোমার দেশের লোক। আমি শুধু তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চাইনি, তোমার সমাজকে নিয়েও বাঁচতে চেয়েছিলাম।

–একদিন তুমি সেই ভাবেই বাঁচতে পারবে ওমর।

ওমর হাসল। বিষন্ন ক্লিষ্ট হাসি, বলল, রোহানা, মেঘের ডাকে ভয় নেই, শুধু অশনি সংকেত। কিন্তু বাজ যখন মাথায় পড়ে ভাববার তখন সময় থাকে না।

–ওমর তুমি সব কিছুর অন্ধকার দিক দেখ কেন? যুদ্ধ শেষ। মানুষ এখন শান্তিতে বাস করতে পারবে।

ওমর বাটের মুখ আরো মলিন দেখাল, কোন কথা বলল না।

রোহানা বলল, আমি জানি, তুমি কি কথা ওঠাবে। তাই মাকে নিয়ে আসার জন্য আগেভাগে চিঠি লিখেছি। মামীর ছেলে স্বপন মাকে নিয়ে আসবে। দু'এক দিনের মধ্যে এসে পড়বে। সেই সময়টুকুতে আমি তুমি মিলে ঘরবাড়ি গুছিয়ে নিই।

–বিয়ের আয়োজন করবে না?

–ঠাট্টা করছো?

–তুমি এইমাত্র বললে না, মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারবে?

–যুদ্ধ শেষ হয়েছে, শুনেছ?

–শুনেছি।

www.pathagar.com

পরের প্রশ্নটি করতে গিয়ে থমকে গেল রোহানা, যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থার কথাই কি ভাবছে ওমর বাট? সে ভাবছে, ক্যাপটেন আদনান ভাবছে, সমস্ত দেশের মানুষ ভয় কন্টকিত হয়ে ভাবছে, ওমর বাট বাদ যাবে কেন?

ভারি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল রোহানা, এসো ওমর।

–চল।

সেদিন ভোর বেলাটা ছিল সামান্য কুয়াশাচ্ছন্ন। কুয়াশার পাতলা আবরণ ভেদ করে অস্পষ্টভাবে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। সারা রাত শিশির ঝরেছে। সকাল বেলায় সবকিছু ভিজে এবং স্যাঁতস্যাতে। একটু পরেই রোদ উঠবে। দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়বে। প্রকৃতির শ্যামলিমা ঝকঝক করে উঠবে। উজ্জ্বল দেখাবে। উৎফুল্লতায় রং গাঢ় হবে। আলসেমি ঝেড়ে ফেলে সবকিছু হয়ে উঠবে সতেজ এবং সক্রিয়।

গত রাতে রেডিওর খবর শুনেছে রোহানা এবং ওমর বাট। পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের লেঃ জেনারেল নিয়াজী তাঁর সব ফোর্স নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন ভারতীয় লেঃ জেনারেলের কাছে।

সবাই বলছে, যুদ্ধ শেষ কিন্তু এই যুদ্ধের গতি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি এসব কি শেষ হয়েছে? হয়নি। এ দেশের কোন জেনারেলের হাত দিয়ে ওদের আত্মসমর্পণ-চুক্তি, দলিল সই এবং তা গ্রহণ করা হলো না কেন, এই রহস্যের জট খোলার সময় কবে হবে কে জানে? এত রক্ত, এত ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এলো অথচ এ দেশের কেউ স্বাধীনতার সেই দলিলপত্রে স্বাক্ষর করতে পারলো না এ দুঃখ এ জাতি ভুলবে কেমন করে? লেঃ জেনারেল হাশেম খানের আত্মাহুতির মূল্যায়নই বা কবে হবে? সব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে। রোহানা চিন্তিত। ওমর বাটের মুখ ভাবলেশহীন। চোখ নিস্প্রভ। শুধু এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, রাত জেগে এত কি লিখছো রোহানা?

–আমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, 'যুদ্ধ ও ভালবাসা'।

–শেষ হলো?

–হ্যাঁ, আজ পার্ক আর্মিদের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে বইয়ের সমাপ্তি।

–আমি বলছি, শেষ হবে না।

–এমন কথা বলছ কেন? এ দেশের মানুষ যা চেয়েছে তা পেয়ে গেছে। আমিও আমার ভালবাসার মানুষটিকে কাছে পেয়েছি।

ওমরের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ভেসে উঠল। বলল, তুমি যদি শেষ মনে কর তাহলে কর। আমি বলছি, তোমাকে আরো এক খন্ড লিখতে হবে। এটা শুধু যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগের পর্ব।

কথা শেষ না হতেই রীনা খালার ছেলে রিপনের ঝড়ের বেড়ে প্রবেশ, রোহনা আপা।

–কিরে, ওমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

–খারাপ খবর। মুক্তো ভাই গুলী খেয়েছে।

www.pathagar.com

–সে কি রে, যুদ্ধ শেষ, দেশের অবস্থা আজ শান্ত, গুলী করল কে?

–পাক আর্মি।

–বলিস কি?

–হ্যাঁ ওরা কাতারে কাতারে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রেসকোর্সের ময়দানের দিকে যাচ্ছিল সারেন্ডারের জন্য। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে যখন যায়, মুক্তো ভাই তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তামাশা করে বলল, সেই তো মল খসালি তবে কেন লোক হাসালি।

সঙ্গে সঙ্গে গুলী। ওরা বাংলা কি করে বুঝল কে জানে?

–ভাষা বোঝেনি, ইংগিত বুঝেছে।

–ভাইয়া এখন হাসপাতালে। হাতে গুলী লেগেছে। ডাক্তার বলছে, হাত বাঁচানো যাবে না।

–ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সময় মত আমি যাব।

–মা খুব কান্নাকাটি করছে।

–করুক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

–তুমি খুব ঠান্ডা মাথায় কথা বলছ তো। ডান হাতটা কেটে ফেললে সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাবে।

–আচ্ছা রিপন, তুই তো কলেজের একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, আমার একটা কথার জবাব দিবি? সব কিছুর একটা এথিক্স আছে, মরাল ভ্যালুজ আছে, তাই না?

রিপন চুপ।

–যুদ্ধে থাকবে না এমন কোন কথা নেই। আহত বাঘকে যেমন খোঁচাতে নেই, তেমনি পরাজিত শত্রুকে অপমান করতে নেই। এমনিতেই তাদের মনে অনেক দুঃখ, গ্লানি এবং বেদনা।

লাফিয়ে উঠল রিপন, তুমি কি ওদের হয়ে কথা বলছো?

–তুমি যদি মনে কর, তাহলে তাই। অন্ধ আবেগ আর যুক্তি এক কথা নয় রিপন। আমি বিশ্লেষণ মানি।

–তোমার যুক্তি এবং বিশ্লেষণ দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা আসেনি। আমরা রক্ত দিয়েছি। আমরা যা ভাল মনে করব তাই করব।

–পরীক্ষায় নকল করতে পারবি?

–দরকার হলে তাও করব। পড়াশোনা করার সময় ছিল কোথায়?

–তুই কি ইয়ং জেনারেশনের মুখপাত্র হয়ে কথা বলছিস?

–নয় কেন? আমি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলাম।

কঠোর হলো রোহানার মুখ। বলল, রিপন, যুদ্ধ করেছি অধিকার আদায়ের জন্য, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য না। তুই এখন যা, তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

–তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। তুমি একটা আস্ত দালাল।

–তুই যাবি?

www.pathagar.com

–যাচ্ছি। তবে বিপদে পড়লে এই রিপনেরই সাহায্যের দরকার হবে।

–যারা বিপদ বাধিয়ে দেয় লোকে তাদের সাহায্য চেয়ে আহাম্মকির পরিচয় দেয় না।

ওমর বাট দু'জনের কথা শুনছিল। রোহানার হাত ধরে টেনে এনে বলল, ছেলে মানুষদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে নেই।

রোহানা বলল, হাত ছাড়, আমি ভেবে মরে যাচ্ছি এদের মত ছেলেরাই এখন দেশ শাসনে মোড়লী করবে!

রিপনের চোখ মুখ লাল, বলল, মোড়লী না, দেশ শাসন এখন আমরাই করব।

রিপন বেরিয়ে গেল। রোহানা রাগে কাঁপছে। কোনদিন সে এত রেগে যায়নি। ওমর বাটের সামনে এ যেন তার মস্তবড় পরাজয়। বাংলাদেশের জয় হয়েছে, কিন্তু এর আদর্শ, নীতিবোধ, দর্শন এবং চেতনার কি জয় হয়েছে? বোধহয় ওমর বাট এ জন্যই বলেছিল, যুদ্ধের শেষ নয়, যুদ্ধের শুরু। রোহানা বইয়ের সমাপ্তি টানার এখনো সময় হয়নি, তোমাকে আরেকটি পর্ব লিখতে হবে।

রোহানা ওমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে। ওমর বাট এগিয়ে এল। রোহানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পরম আদরে। রোহানার চোখের পানিতে ওমরের বুক ভিজতে লাগল।

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল রোহানার। বাইরে গুলীর শব্দ। কান পেতে রইল। বিভিন্ন দিক থেকে গুলীর শব্দ বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে আসছে। ষোলই ডিসেম্বর পাক আর্মিদের আত্মসমর্পণের কাজ শেষ হয়েছে। পরের দিন আনন্দ, উৎসব এবং শ্লোগানের দিন ছিল। কেউ বলছে জয় বাংলা, কেউ জয় হিন্দ। জনতার ঢল নেমে এসেছিল রাস্তায়, অজস্র অসংখ্য মানুষ। এত মানুষ কোথায় ছিল? সাড়ে চার কোটি মানুষ দ্বিগুণ হলো কি করে? যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সে এবং ওমর বাট ঘুরে বেড়িয়েছে রমনা পার্ক, রেসকোর্স, হাইকোর্টের মাজারের এদিকে। লোকজন কম। ফাঁকা ফাঁকা। কি ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। রেইনট্রিগুলো বিরাট ডালপালা এবং পাতা মেলে শীতলতা ছড়াচ্ছে রাস্তার উপর। মৃদু শীত শীত ভাব, শরীর–মন জুড়িয়ে যায়। রমনা পার্কের লেকের ধারে বসে চীনাবাদাম খাওয়া। লেকের কালো কালো পানিতে নিজেদের ছায়া আবিষ্কারের প্রচেষ্টা। মৃদু হাসি, মৃদু কথা, হাতে হাত রেখে হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করা, মুখের দিকে অনর্থক তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসা। কখনো রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। বেলা গড়িয়েছে। লেকের বুকে পড়ন্ত বিকেলের ছায়া ঘন এবং গাঢ় হয়ে উঠেছে। তখন দু'চারজন বয়স্ক দম্পতির আনাগোনা সবে আরম্ভ হয়েছে, দু'জনে উঠে দাঁড়িয়েছে যে যার আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য। যানজটের ভিড় নেই রাস্তায়। ভাসমান শিশু, বালক-বালিকাদের চিহ্নও নেই। অফিস ফেরৎ মানুষদের চলাফেরা শুধু লক্ষ্য করা

www.pathagar.com

যায়। তবু কি নির্জন, নীরব, কোলাহলশূন্য জনপথ। বুক জুড়িয়ে যেত জীবনের গভীর তাৎপর্যময় সুখে। শান্তির আঁচল দুলিয়ে দিয়ে যেত আনন্দের মায়া স্পর্শ বুলিয়ে। কানে কানে কথার শিহরণ জাগতো। অকারণে পুলক পুলক ভাব।

যুদ্ধ আরম্ভ হতে সব কিছু বদলে গেল। ভয়, আশংকা অনিশ্চয়তা, বিপদের গভীর কালো ছায়াপাত চারদিকে। মানুষ চলছে, মুখে কথা নেই। গাড়ি চলছে, তাড়াহুড়ো ভাব। ব্যবসা বাণিজ্য চলছে, মন্দা ভাব। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, মুখে হাসি নেই, বেনীর দুলুনিতে ছন্দ নেই। শিশুরা রাস্তায় খেলা করে না। বয়স্ক দম্পতি হাত ধরাধরি করে বাইরে হাঁটে না। যুবক-যুবতীরা টি,এস,সি-তে আড্ডা দেয় না। রেসকোর্সে বসে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রেমালাপ করে না। সবকিছু বদলে দিল কারা? দায়ী কে? তারা কোন্ দৈত্যের দল? এখন আবার রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। কিলবিল করছে। গা ঘেঁষাঘেষি না করে রাস্তায় চলার উপায় নেই। বাজার-হাট থকথক করছে ভনভনে মাছির মত। কোথায় ছিল এত লোক? কোন অজানা আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে সুখলব্ধ স্বার্থ উদ্ধারের আশায়?

রোহানা চৌধুরীর চিন্তার মোড় ঘুরল। ঘন ঘন রাইফেলের গুলীর শব্দ। সারারাত গোলাগুলী চলল। প্রথমে সে ভেবেছিল, আনন্দ উল্লাসের ফাঁকা গুলী। কিন্তু বুলেটের গম্ভীর আওয়াজকে ফাঁকা গুলীর শব্দ মনে করার কারণ নেই।

পূর্বের ঘরটা খোলামেলা, বড় সড়। সেই ঘরে ওমরের থাকার ব্যবস্থা। ধীরে এবং আস্তে রোহানা ওমরের ঘরের কাছে এল। আশ্চর্য এত করে বলা সত্ত্বেও ওমর ঘরের সিটকিনি লাগায়নি। ওমরের এক কথা, সদর দরজা ভেঙ্গে এতগুলো ঘর পেরিয়ে কেউ যদি ঘরে ঢোকে, তার পক্ষে সিটকিনি খোলা অসম্ভব না।

দরজা সামান্য ফাঁক করে রোহানা দেখল, ওমর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এলোমেলো চুল ওর কপালের উপর। মুখের কালচে ভাব অনেকটা সরে গেছে। রোহানা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাইরের ল্যাম্পপোস্টের আলো কিছুটা এসে পড়েছে ওর বিছানায়। আলো-আঁধারে ওকে রহস্যময় দেখাচ্ছে। ও যে কি সুন্দর! ও শুধু সুন্দর না, বাঙ্গালী শ্যামবর্ণের একটি মেয়েকে ভালবেসে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ও তার চোখে হয়ে উঠেছে উদারতা এবং মহত্ত্বের প্রতীক।

কপাট আবার ভেজিয়ে দিয়ে রোহানা নিজের ঘরে ফিরল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। ঘুমের মধ্যে অনুভব করছে ওমরের ভালবাসার স্পর্শময় আদর, সমর্পণের নির্ভরতা আর নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার গভীর মগ্নতা।

ঘুম যখন ভাঙ্গল, অনেক বেলা। মা খাবার টেবিল সাজিয়ে ডাকাডাকি করছেন। মুখে কোনমতে পানির ঝাপটা দিয়ে রোহানা চলে এল খাবার টেবিলে। ওমর কাপড়-চোপর বদলে পরিচ্ছন্ন হয়ে এল খাবার টেবিলে। চোখ আগের মত গভীর নীল, ঠোঁট সিগারেট খাওয়ায় সামান্য কালচে। সোনালী চুলে আবার রোদের উজ্জ্বলতার ছোঁয়া।

www.pathagar.com

–ওমর তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

–রোহানা, মহাকাব্যে নারীর রূপের বর্ণনা আছে, পুরুষের নেই।

–কিন্তু আমার যে রূপ নেই।

–কে বলল নেই? আমার চোখে আছে। যদি কোন দিন আমার চোখের আলো নিভে যায়, তখন মনের আলো জ্বলে উঠবে।

–ওমর, শরৎ বাবুর মতে আঁধারের রূপ আছে। সত্যি আছে কিনা জানা নেই। কিন্তু কবি সাহিত্যিক শিল্পীর চোখে আঁধারের রূপ ধরা পড়ে। আর ধরা পড়ে প্রেমিকের চোখে।

ওমর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা ঘরে ঢুকলেন, কি রে তোরা শুধু গল্পই করবি? খাবি না।

–মা, আপনিও বসুন, ওমর অনুরোধ জানাল।

রুটির টুকরো মুখে তুলতেই বাইরে শব্দ হলো, ধর ধর ধর। একসঙ্গে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর। তারপর গুলীর শব্দ। তিনজনের খাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল। ওমরের মুখ থেকে উজ্জ্বল আলো সরে গেল। রোহানা নীরবতা ভাঙ্গল, কাল সারারাত গোলাগুলী হয়েছে।

–জানি।

–আমি দেখলাম, তুমি ঘুমোচ্ছ।

–চোখ বন্ধ করেছিলাম। তুমি যখন গেলে তখন অনেক রাত। ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সাবিহা চৌধুরী উঠলেন, আমি দরজা জানালা বন্ধ করে আসি। তোরা হাত গুটিয়ে বসে থাকিস না, খেয়ে নে।

ওমর বলল, আমি যে হুলিগানিজমের আশংকা করেছিলাম তাই আরম্ভ হয়েছে। যুদ্ধের চেয়েও এটা ভয়ংকর। যুক্তি নেই, বিচারবোধ নেই, সময় ক্ষেপনও নেই। শুধু একটা ধ্বনি তোলা, দালাল। তারপর ধর, মার, কাট।

–কি হবে ওমর?

–যা হবার তাই হবে।

–আমরা কি এখানে নিরাপদ?

–কোথায় নিরাপত্তা জানিনা। আমি এখন বেরুব।

–না, ওমর না।

–ঘরটা বেশি নিরাপদ ভেবো না। আমার বাইরে কাজ আছে। আমার কিছু পাকিস্তানী বন্ধুবান্ধব আছে তারাও আটকা পড়ে গেছে। ওদের খোঁজ পেলে একত্রে ভাবা যায়, কি করা যাবে।

–রোহানা বলল, তাহলে যাও, একটা নিরাপদ আশ্রয় তোমার জন্য সত্যি দরকার।

–তুমি?

–আমি কোথায়ও যাব না। এখানেই অপেক্ষা করব তোমার জন্য। বেঁচে থাকাটাই

www.pathagar.com

এই মুহূর্তে বড় কথা। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রোহানার দুই চোখ পানিতে ভরে উঠল।

–এত হতাশ হয়ো না। সুখ কপালে থাকলে হবে, না থাকলে হা হুতাশ করে লাভ নেই।

রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে ওমর বাট। অনেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ বলছে সাহেব, কেউ বলছে পাকিস্তানী, শালাকে ধর।

–না রে ও যদি বৃটিশ অথবা ইউরোপীয়ান হয়, মেরে ফেললে এক বিদঘুটে কান্ড হবে। বিবিসি আমাদের পক্ষ হয়ে অনেক কথা বলেছে। মার্ক টালির ভাষ্য শুনিসনি? ওসব ছিল মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা। তাছাড়া বিদেশী মিশনগুলোর সঙ্গে আমাদের এখন কূটনৈতিক সম্পর্ক দরকার।

এমন সব ইতস্তত কথা শুনতে শুনতে ওমর বাট এগিয়ে গেল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। থমকে দাঁড়াল। বাসে ওঠা ঠিক হবে না। ওগুলো এখন গণপিটুনির জায়গা। দেখে শুনে একটা বেবী ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভার বুড়ো। দাড়িগোঁফ সাদা।

–ইস্কাটন যাবে?

–যাবো বাবু।

–বাবু বলছ কেন? আমি মুসলমান।

–বাবু লোকে দেশটা যে ভরে গেছে। কাকে কি বলে ফ্যাকড়ায় পড়ব। তাই সবাইকে বাবু ডাকি।

–তোমার কথায় উর্দু টান। তুমি কি বিহারী?

–বেবীতে উঠুন, বলছি। হ্যাঁ, আমি বিহারী।

–তোমার সাহস কম নয়, এই অবস্থায় বেবী নিয়ে রাস্তায় নেমেছ?

–আপনার সাহসও কম না, মেরে লাল, আপনি পাকিস্তানী।

–বুঝে ফেলেছো?

–হ্যাঁ।

–প্রাণ ভয়ে তাহলে আমরা সবাই ভীত?

–হ্যাঁ জনাব। চারদিকে খুব খুন খারাবি হচ্ছে। রাজাকার, আল বদর, আল সাম্‌স্ সবাই জবাই হয়ে যাচ্ছে। এই সঙ্গে পীস কমিটির মেম্বাররা।

–তুমি দেখছি অনেক কিছু জান। সময় থাকতে পালাওনি কেন?

–কোথায় পালাব মেরে বাচ্চা। এই দেশে চব্বিশ বছর থেকে আছি। বাল বাচ্চা এখানে জন্মেছে। বুড়ো বাবা মা আত্মীয় স্বজন মিলে এক গুষ্ঠি। পাক সেনারাই পালাতে পারল না, আর আমরা! ভাইবেরাদর অনেক মারা গেছে। মরতে হয়, এখানেই মরব। দুঃখ এই যে আমরা তিনবার মার খেলাম। একবার জন্মভুমি ইন্ডিয়ায় মার খেয়ে এখানে এসেছি। বহুত তকলিফ করে ডেরা বানিয়েছি এখানে। ভাবলাম, স্থায়ী ডেরা হলো। হা আফসোস! শুধু মাত্র উর্দু জবানের জন্য কত বিহারী জবাই হয়ে গেল পাক আর্মির অপারেশনের আগে। আবার তারা সারেন্ডার করায় আরেক দফা জবাই।

ওমর হাসল বিষন্ন ক্লিষ্ট হাসি, চাচা পাক ফৌজ এলে তোমরাও কিন্তু বাঙ্গালীদের

www.pathagar.com

জবাই করেছ।

–কথা মিথ্যে নয় মেরে লাল, কেউ বারবার আঘাত করলে আমি তো একবার আঘাত করবই। এটা প্রকৃতির নিয়ম, মানুষের স্বভাবজাত নিয়ম, এমন কি জন্তু জানোয়ারেরও নিয়ম।

–তবু কাজটা ভাল করনি।

–আপনি কি কাউকে আঘাত করেছেন?

ওমর জবাব দিল না।

–তাহলে কেন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, বুক উচিয়ে রাস্তায় চলতে পারেন না কেন?

–ভ্যাগের পরিহাস।

–হ্যাঁ বেটা, ভাগ্যের পরিহাস, বদনসিব। এছাড়া আর কি সান্ত্বনা আছে আমাদের?

ইস্কাটন কোয়ার্টাসের গেটে বেবী থামাতে বলল ওমর।

–আাপনি কোয়াটার্সের সামনে নামুন।

–নম্বর খুঁজতে হবে। তোমার যে দেরি হবে চাচা।

–তা হোক, এ পথটুকু নিরাপদ নয়। আপনি নম্বর খুঁজুন, আমার আপত্তি নেই।

–শুকরিয়া।

নম্বর খুঁজে বের করল ওমর। কিন্তু নাদিম ফাহমী নেই। পরিবার পরিজন সহ কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না। আফতাব খটককেও খুঁজল, সেও নেই। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল, এরা চাটগাঁও হয়ে পালিয়েছিল বার্মার দিকে। পালাবার পথে অনেক মারা পড়েছে বাঙ্গালী ফৌজের হাতে।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে এল ওমরের বুক থেকে। ফিরে এল। দেখল, ফজল খান অপেক্ষা করছে স্কুটার নিয়ে।

–সে কি তোমাকে দাম মিটিয়ে দিয়েছি, যাওনি?

–বেটা, আমি জানতাম তুমি ওদের পাবে না। যে যার মত জান নিয়ে পালিয়েছে।

–তুমি দেখছি, অনেক কিছু বোঝ।

–বয়স তো কম হলো না, তিন কুড়ি পেরিয়েছে। তবে পালিয়ে কতজন বাঁচতে পেরেছে সেই হলো কথা।

–ফজল খান চাচা, তুমি কতটুকু জান বলবে?

–বেটা, আমার ক'জন রিস্তাদার ঐ দলে ভিড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু মুক্তি ফৌজরা যখন চাটগাঁও জয় করে ফেলে তখন পথে ওদের সঙ্গে দেখা। নিরস্ত্র মানুষ সব, তবু রেহাই পেল না। মেশিন গানের গুলী করে সবাইকে মেরে ফেলল, ছেলেবুড়ো, শিশু কন্যা কেউ বাদ পড়ল না।

–তুমি এতসব জানলে কি করে?

–আমার এক রিস্তাদার বেঁচে গেল ভাগ্য গুণে। দৌড়ে ঘন রাবার বনে পালিয়েছিল। সে–ই ফিরে এসে আমাদের সবাইকে বলেছে।

www.pathagar.com

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকে চেপে রাখল ওমর। বুকটা ভারি হয়ে উঠল।

–উঠুন, দেরি করবেন না, ফজল খান তাড়া দিল।

ওমর বাট সীটে উঠে বলল, চাচা, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেউ কারো উপকার করতে পারছি না। কারণ সবাই আমরা বিপদের বেড়াজালে আটকা।

–বেটা, আল্লাহর নাম মুখে নিয়ে সাহসে বুক বাঁধুন।

ফার্মগেটের সামনে আসতেই এক অদ্ভূত দৃশ্য চোখে পড়ল ওমরের। জনতা ধর ধর মার মার কাট কাট করে বেদম পেটাচ্ছে একটা লোককে। লোকটা পড়ে যাচ্ছে, চুলের মুঠি ধরে আবার তাকে উঠিয়ে আছড়ে ফেলছে পীচ ঢালা রাস্তায়, যে পর্যন্ত না সে নিঃসাড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রাস্তায়। শালা রাজাকার খতম বলে নিথর দেহে লাথি মারল একটা লোক।

ফজল খান তার যানবাহনে স্পীড তুলল। জনতার দৃষ্টি পড়ল এদিকে। আরেক দালাল শালা পালাচ্ছে, ধর ধর রব উঠল সেই মুহূর্তে।

চলন্ত বেবী ট্যাক্সীর সঙ্গে লোক ছুটল। ইট, পাথর ছুঁড়তে লাগল। লাঠির বাড়িও এসে পড়ল ওমরের মাথার উপর। চোখে অন্ধকার দেখল ওমর। শরীর রক্তাক্ত হচ্ছে। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। খেজুর বাগান পার হয়ে যখন মীরপুরের রাস্তা ধরল ফজল খান, জিজ্ঞেস করল কেমন আছেন বেটা?

কোন উত্তর এল না।

ওমর চোখ মেলে দেখল এক অপরিচিত ঘরে বিছানায় সে শুয়ে আছে। ফজল খান ঝুঁকে আছে তার মুখের উপর, বেটা ডরো মাত, কুচ নেহি হুয়া। তুম আচ্ছা হো যায়েগা।

ফজল খানের মাথাতেও ব্যান্ডেজ বাঁধা। ধীরে ধীরে ঘটনাগুলো মনে পড়ল ওমরের। জনতার রোষ, জনতার আক্রোশ, জনতার আক্রমণ, তারপর আর মনে নেই।

–ফজল খান চাচা, ডাকল ওমর।

–আমি এখানে কতদিন?

–গতকাল দুপুর থেকে।

–তুমি আমার বাসায় একটা খবর দিতে পার চাচা?

–জরুর।

–বাসায় ফোন নেই। বাসার কাছেই একটা দোকান। ওখানে ফোন করলে রোহানা চৌধুরী নামে এক ভদ্র মহিলাকে ডেকে দেবে।

ওমর থামল। দম নিয়ে বলল, তাঁকে বলবে, আমি ভাল আছি। কাজে ব্যস্ত। তিনি যেন চিন্তা না করেন। দু'একদিনের মধ্যেই ফিরব।

ফোন নম্বর টুকে নিল ফজল খান। ঘন্টা খানেক পরে ফিরে এসে ফজল খান খবর দিল, ফোনে রিং হয়েছে, কেউ ধরেনি। বোধহয় দোকান বন্ধ।

ওমর কথা বলল না। চোখ বন্ধ করল।

দু'দিন ফজল খানের ডেরায় কাটাল ওমর বাট। ফজল খানের বহু এবং মেয়ে যত্নের ত্রুটি করল না। এই বিপদের মধ্যেও ফজল খান বেবী ট্যাক্সি নিয়ে দু'বেলা বের

www.pathagar.com

হয়। ফেরে রাত দশটায়। টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসে। বহু বলে, না বের হলে হয় না? ঘরে বেমারী আদমী, বেগানা পুরুষ।

–এইস্যা মাত বলো বিবি, ও মেরা বেটা।

–আচ্ছা আচ্ছা ঠিক হ্যায়।

–ফজল খানের গলা গম্ভীর। না বেরুলে রুজি রোজগার হবে কি করে? বেমারীর দাওয়াই এবং ভাল পথ্য দরকার। নিজেদের পেটেও তো কিছু দিতে হবে।

–ঠিক হ্যায়। হুশিয়ারসে চলিয়ে।

–আল্লাহ ভরসা।

ফজল খান ঘরে ফিরেই ওমরের বিছানায় বসে। খবরাখবর নেয়। সান্ত্বনা দেয়, দোয়া করে। গরীবের খানা খেতে পারছে কিনা মমতা ভরে জিজ্ঞেস করে। ওমর গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দেয়, ফজল খান চাচা।

–বাতাও বেটা।

–এত ঋণ বাড়িয়ো না। আমি শোধ করতে পারব না।

–ছি বেটা, এ্যায়সা মাত বলো। শরম দিয়ো না বেটা। গরীবের সংসার ঠিক মত সব যোগাতে পারি না। যত্ন-আত্তির করতে পারি না। তবু বলি বেটা, যতদিন খুশি থাক, মাথায় করে রাখব।

–না ফজল খান চাচা, এবার বিদায় দাও। আর এক ভদ্র মহিলার কাছেও আমার ঋণ আছে। শোধ করতে না পারলে তোমাদের উভয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

ফজল খানের চোখে পানি, বেটা গরীবের সংসারে তোমাকে ধরে রাখার যোগ্যতা আমার নেই।

–ওমন করে বলো না চাচা, আল্লাহর ইচ্ছেয় তুমি আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। গণরোষে আমাদের বেঁচে থাকার কথা ছিল না।

–সবই আল্লাহ পাকের মরজি। বেটা, আমি আমার জীবনের দিকে তাকাইনি। তখন আমার শুধু এক চিন্তা, কেমন করে তোমাকে বাঁচাব। তোমার ঘরের ঠিকানা জানিনা। তাই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ডেরায় তোমাকে আনব। তরপর যা হয় করব। এক মুহূর্তের জন্য বেবী ট্যাক্সির স্পীড কমাইনি। অথচ বৃষ্টির মত ইট পাথর এসে পড়ছে আমার মাথায়। জীবন–মরনের মালিক আল্লাহ। শেষ পর্যন্ত তাই বেঁচে গেলাম।

–চাচা, যতদিন বাঁচব, মনে করব, আমার একজন আপনজন আছে এ দেশে।

ফজল খান ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

রোহানা চোখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এতদিন কোথায় ছিলে? এমন চোহারা হয়েছে কেন?

–কোন প্রশ্নের উত্তর আগে দেব? ওমর মৃদু হাসল।

–যা খুশি দাও। তবু চুপ করে এড়িয়ে যেয়ো না। দোহাই তোমার।

–ইস্কাটনে বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। যাওয়ার পথে ছোটখাট একটা এ্যাকসিডেন্ট।

www.pathagar.com

–এ্যাকসিডেন্ট, বিস্ময় কণ্ঠ ফুঁড়ে বের হলো রোহানার।

–রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা, সামান্য ব্যাপার, একটু আধটু ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে।

–সময় মত খবর দিলে না কেন? আমি দু'রাত ঘুমুইনি?

এমন সময় সাবিহা ঘরে প্রবেশ করলেন, বললেন, শুধু রাত জেগে থাকা নয়, দু'দিন ও মুখে কিছু দেয়নি। ওমর, গোসল করে দু'জনে একত্রে খেতে বস। আমি খাবার নিয়ে আসি।

কেউ কোন কথা বলল না। শুধু একজন অন্য জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বেদনা কত গভীর, তা কেউ প্রকাশ করতে পারছে না। এক জনের সত্য ঘটনা খুলে না বলতে পারার অক্ষমতা, অন্য জনের সবটুকু না বোঝার হতাশা।

এ দু'দিনে ওমরের মুখের আগের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে। গভীর চোখ দুটো বিষন্নতায় ভরা। সারা দেহে অবসাদের ক্লান্তিময় পীড়া। কি হয়েছে ওর? কেন হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেবে না ওমর।

খেতে বসে বমি করে ফেলল ওমর। রোহানার মনে হলো, অনেক আগে এমন হয়েছিল ওমরের। কেন হয়েছিল, ওমর সেদিনও বলেনি, আজো বলছে না। বিকেলের দিকে ওমরের কেঁপে জ্বর এল। রোহানা ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়, মৃদু শাসনও করল, আমাকে না বলে আর বাইরে বেরুতে পারবে না। কমপ্লিট রেস্ট।

হাসল ওমর। রোহানার হাত ধরে রইল নিবিড় করে। সারাদিন কিছুই খেল না ওমর। রাতে পাতলা করে হরলিক্স্ গুলিয়ে ওমরকে নিজ হাতে খাইয়ে দিল রোহানা। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল যত্ন করে। বলল, ঘুমোতে চেষ্টা কর ওমর।

রাত সাড়ে দশটা। সাবিহা শুয়ে পড়েছেন। ঝি রাতের ঘষামাজা শেষ করে দরজা লাগিয়েছে। রোহানা নিজের ঘরে যাওয়ার আগে ওমরকে আর একবার দেখতে এল। ওমরের চোখ বন্ধ। রোহানা ফিরে যাচ্ছে। ওমর হঠাৎ ডাক দিল, রোহানা।

–ঘুমুওনি?

–না।

–কিছু বলবে?

–হ্যাঁ।

–বাইরের খবর কিছু জান?

–ইচ্ছে করেনা জানতে।

–তবু জেনে রাখা ভাল।

–রাজাকার, আল বদর, আল শামস আর পীস কমিটির মেম্বারদের মেরে ফেলা হচ্ছে এই তো?

–এই সব নয়, বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীদের গায়েব করে ফেলা হয়েছে। তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

–কারা গায়েব করেছে?

–পাক বাহিনী পক্ষ।

–খারাপ কথা, কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি তো কোন অপরাধ করনি।

www.pathagar.com

–ওরাও কোন অপরাধ করেনি।

–তুমি চুপ করে ঘুমোও। আমি বলছি তোমার কোন ভয় নেই।

ওমর হাসল, বিষাদময় হাসি।

ওমরের মনে হলো ফজল খানের বাসা থেকে ফিরতি পথে একটা লোক তাকে বরাবর ফলো করছিল। ওমর যথাসাধ্য চেষ্টা করল তাকে এড়িয়ে যেতে, পারেনি। বাসার কাছে এসে দেখতে পেল লোকটি তার পেছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রোহানাকে একথা বলা যাবে না। ও ভয় পাবে, যন্ত্রণায় অস্থির হবে। ওমর গভীর মমতার স্বরে ডাক দিল, রোহানা।

–এইতো আমি, তোমার কাছে।

–একটা কথা বলব?

রোহানা অপেক্ষা করল।

–আজ রাতে তুমি আমার কাছে শোবে?

গম্ভীর হয়ে গেল রোহানা, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, ওমর, যা তুমি রাজৈশ্বর্যের মত পেতে পার তা তুমি ভিখারীর মত দীনহীনভাবে হাত পেতে নিতে চাও কেন?

ওমর রাগ করল না। কাতর কণ্ঠে বলল, রোহানা তোমাকে সারা জীবনেও আর আমার পাওয়া হবে না।

স্তব্ধ হয়ে গেল রোহানা। পরে বলল, আমি তোমার কোন কথাই আর শুনছি না। আগামীকাল সকালেই তোমাকে নিয়ে যাব কাজীর অফিসে।

উত্তর দিল না ওমর। ক্লান্ত চোখ মেলে রোহানার দিকে তাকিয়ে রইল। বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে রোহানাও তাকিয়ে রইল ওমরের দিকে। চোখের কোল ছাপিয়ে পানি এল। ওমরের এত অসহায় চেহারা কোনদিন দেখেনি রোহানা, মলিন, ক্লান্ত এবং বিষন্ন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল রোহানা, আমি কি ভুল করলাম?

পরমুহূর্তে ভাবল, শুধু এই রাতটুকুর ব্যবধান। ওমর পাশ ফিরে শুয়ে রইল। রোহানা কয়েকবার ডাকল। উত্তর এল না।

ভোর রাতের দিকে অনেকগুলো পায়ের ধুপধাপ শব্দ শুনল রোহানা, খুব কাছে। মর্জিনা তার ঘরের মেঝেয় শোয়। মা পাশের ঘরে। দু'জনকেই ডাকল, কেউ নেই। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পরে মা মর্জিনাকে নিয়ে সবজি বাগানে পানি দিতে যান। কিন্তু এমন তো হয় না সব ঘরের দরজা হাট করে খোলা। পায়ের আওয়াজ দ্রুত সরে আসছে কাছে। রোহানা বিছানা থেকে উঠল, হাতে টর্চ নিল।

শেষ রাতের অন্ধকার এখনো পুরোপুরি কাটেনি, হাল্কা মেঘের স্তরের মত পৃথিবীর বুকে ঝুলে আছে। লাইট জ্বালাতেই অবাক, অনেক লোকের অস্পষ্ট অবয়ব, শব্দ ওমরের ঘরের দিকে। রোহানা দৌড়ে চলে এল ওমরের ঘরের দরজায়। অনেক বলা সত্ত্বেও ওমর

www.pathagar.com

দরজার সিটকিনি আটকায় না। গতকাল থেকে ওর অসুখ। দরজা খোলাই ছিল, মাঝ রাতে একবার এসে ওমরকে দেখে গেছে ও ঘুমোচ্ছে।

এখন ওমরের ঘরে দশ বারো জন সশস্ত্র লোক। হাতে চাকু, কারো হাতে ড্যাগার। একজনের হাতে রাম দা।

পাগলের মত চিৎকার করে উঠল রোহানা। তার আগেই একটা লোক লাফিয়ে উঠল। তার হাতের ধারালো চাকু চক চক করে উঠল।

চারজন লোক রোহানাকে শক্ত করে ধরে আছে। রোহানার চোখ বিস্ফারিত হলো। দেখল, ঘুমন্ত ওমরের বুক থেকে লাল ফোয়ারা উঠছে। লাল রক্ত কতগুলো রেখায় বিভক্ত হয়ে উপরের দিকে ছিটকে উঠছে। একটা বৃত্ত রচনা করেছে। রক্তের সহস্র কণায় আলতার মত ঢল। এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়ছে ওমরের বুক থেকে। মাঝখানের জখমটা যেন দলিত জবা ফুল। লোকটা অনবরত ঘা দিয়েই চলেছে, মুখে গালি, শালা পাঞ্জাবী, পালিয়ে বেড়াচ্ছিলি, কতদিন চোখকে ফাঁকি দিবি।

চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে রোহানার। একবার মনে হচ্ছে ওগুলো রক্ত নয়, লোহিত সাগরের ঢেউ। আবার মনে হচ্ছে আকাশের সব লালিমা নেমে এসেছে ওমরের বুকে। পর মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কেউ যেন ফুল তোলা লাল গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। আবার মনে হচ্ছে ওটা একটা লাল বেনারসী শাড়ি। আজ পড়ে কাজীর অফিসে তার যাওয়ার কথা ছিল ওমরকে সঙ্গে নিয়ে। ওমরের রক্তাক্ত বিছানাকে মনে হচ্ছে ফুলশয্যার রাত। রক্ত গোলাপ ভালবাসে ওমর। কত লাল গোলাপের পাপড়ি ওমর ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়।

তিনদিন পর রোহানা চৌধুরীর জ্ঞান ফিরে এল। অনেকেই তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছ? রোহানার মুখে কোন উত্তর নেই। অনেক রাতে নিজেই বিছানায় উঠে বসল রোহানা। সাবিহা চৌধুরী জেগেই ছিলেন। আনন্দে চোখ মুছলেন। বললেন, আমাদের কিছু করার ছিল না মা। মর্জিনা আর আমাকে পাশের ঘরে আটকে রেখেছিল ওরা।

রোহানা কর্ণপাত করল না এ কথায়। বলল, মা, টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমার উপন্যাসটা বের করে দাও। কলম দিয়ো।

–এই শরীরে তুই লিখবি?

–আঃ মা, কথা বাড়িয়ো না দাও। ওটা শেষ করা দরকার।

–এক গ্লাস হরলিকস্ দিই?

–দাও।

ঘন্টা দুই লিখল রোহানা চৌধুরী। শেষ পৃষ্ঠায় একটা কবিতা লিখল। এটিই এ উপন্যাসের শেষ পাতা। রোহানা লিখেছেঃ

আমি আমার জীবনের ঋণ শোধ করতে পারলাম না,

www.pathagar.com

না স্বদেশের, না প্রিয়তমের।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঁচের টুকরোর মত
সবই ভেঙ্গে গেল এক বেদনার্ত ঝড়ে।
মনে করিয়ে দিল স্বপ্নের ভঙ্গুরতা, যেমন
মাটির ফাটল ইঙ্গিত দেয় ভুমিকম্প আর দুর্যোগের কথা।
স্বপ্নের কুঁড়িতে ছিল সুনীল আশার ছোট ছোট ঢেউ
বুকের নিবিড়ে ছিল ভালবাসার সুখের নীড়।
সুখের আশায় ছিল নীল অঞ্জনের আলোছায়া খেলা।
নির্জন নিশীথে সহসা ভেসে এল কামানের গর্জন
ঝরা পাতার মত উড়ে গেল জীবনের সংলগ্ন পাতা।
কি যে হয়ে গেল, বুঝলাম না আমি।
তুমি আর তুমি নেই, আমি আর আমি নেই,
যোজন যোজন দূর।
যদি আমার প্রিয়তমের মৃত্যু হতো গোলার আঘাতে,
করতাম না বিলাপের আফসোস।
যদি তার মৃত্যু হতো ফাঁসির মঞ্চে
জীবনের গান গেয়ে তাকে শোনাতাম।
যদি তার মৃত্যু হতো সম্মুখ সমরে
তার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতাম।
জীবনের অবসানে সে পেল শূন্যতার বিষন্ন আঁধার
আমি পেলাম চির দুঃখের সন্ধ্যা প্রদীপ,
হাজার মায়েরা পেল অশ্রুর নদী
হাজার বধুরা পেল সাহারার গনগনে দুপুর
হাজার বোনের কণ্ঠে বেদনার করুণ বেহাগ-
হে প্রিয় স্বাধীনতা!
অনেক ত্যাগের ফলে তোমাকে পেলাম
এইটুকু সত্য হোক, হোক ইতিহাস
সকলি অনিত্য, নিত্য শুধু প্রেম আর প্রদীপ্ত বিশ্বাস।

উপন্যাসে ইতি টেনে রোহানা চৌধুরী শয্যা নিল। সে আর কোনদিন সুস্থ হয়ে ওঠেনি। আসুন, আমারা তার জীবনের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ‘যুদ্ধ ও ভালবাসা’

যুদ্ধ জনপদ, সম্পদ আর জীবন ধ্বংস করতে পারে কিন্তু মানুষের ভালবাসাকে ধ্বংস করতে পারেনা। ভালবাসা শাশ্বত ও চিরন্তন। ভালবাসা মানেনা দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ। নইলে বাংলার মিষ্টি মেয়ে রোহানা চৌধুরী কেন মন দিতে যাবে পাঞ্জাবী যুবক ওমর বাটকে? আর ওমর বাটই বা কেন এখানে পড়ে মার খাবে?

একাত্তুরের সেই দুঃসহ দিনগুলোতে রোহানা আর ওমর বাট– একে অপরের জন্য পাড়ি দিয়েছিল কত দুস্তর মরু, কতটা বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার পাহাড় ডিঙ্গিয়েছিল– মানবতার জয়গানে মুখরিত লেখিকা রাজিয়া মজিদ তারই ‘বেদনাবিধূর করুণ কাহিনী নিয়ে লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য উপন্যাস ‘যুদ্ধ ও ভালবাসা’।

রাজিয়া মজিদ

রাজিয়া মজিদ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেই খ্যাতিমান লেখিকা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ যিনি তাঁর নিরলস শ্রম ও মেধা দিয়ে আমাদের কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছেন। লিখেছেন অসংখ্য ছোটগল্প, জীবনী, উপন্যাস, নাটক। ছায়াছবির কাহিনী থেকে শুরু করে রেডিও, টিভির নাটক কিছুই বাদ দেননি। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার। পেয়েছেন বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক, বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদক।
তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এই অসাধারণ রোমান্টিক উপন্যাস– ‘যুদ্ধ ও ভালবাসা’ আমাদের কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হবে আশা করি।

–প্রকাশক।